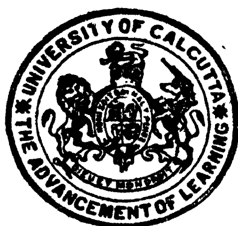
INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

INTERMEDIATE
BENGALI SELECTIONS



FOURTH EDITION

(*Thoroughly Revised and Enlarged*)

PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1933

1st Edition, 1924—E
2nd Edition, 1925—L
3rd Edition, 1930—J
4th Edition, 1933—I

PRINTED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 731B—Aug., 1933—I.

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার অনুমোদনক্রমে এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে, যাঁহার আগ্রহে, যত্নে ও উৎসাহে এই সংগ্রহ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।

রচনা-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার ভিতর দিয়া ছাত্রগণের প্রখ্যাত-নামা লেখকগণের বিশেষ বিশেষ লেখার সহিত সহজেই পরিচয় ঘটে এবং তাঁহাদের অন্যান্য রচনা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বতঃই স্ফুরিত হয়। তদ্ভিন্ন, একই পুস্তকে নানা বিষয়িণী রচনার সমাবেশ থাকায় ভাব-সম্পদ্-বৃদ্ধিরও বিশেষ সুবিধা ঘটে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদিত হইল। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনা যথাসম্ভব মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটী রচনার এমন অংশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, উক্ত রচনাগুলি পাঠকালে যেন মূল পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জাগরিত হয়।

পরিশেষে এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে রচনাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



গদ্যাংশ

INTERMEDIATE BENGALI SELECTIONS

কাদম্বরী-বৈশম্পায়ন

শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য মহাবল পরাক্রান্ত অশেষ-গুণশালী এক নরপতি ছিলেন। বিদিশা নাম্নী তাঁহার রাজধানী উন্মত্তকলহংস-কোলাহল-মুখরিত বেগবতী বেত্রবতী নদীর কূলে অবস্থিত ছিল। রাজা নিজ বাহুবলে ও পরাক্রমে অশেষ দেশ জয় করিয়া সসাগরা ধরায় আধিপত্য স্থাপন-পূর্ব্বক সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে কাব্য-ইতিহাস, সঙ্গীত-আলেখ্য ইত্যাদির আলোচনা ও সাম্রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। একদা রাজা প্রাতঃকালে অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বিষধরজড়িত চন্দনলতার ন্যায় ভীষণ-রমণীয়া, অঙ্গনাজনবিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্রধারিণী, শরৎ-লক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসশুভ্রবসনা, এবং বিন্ধ্যবনভূমির ন্যায় বেত্রলতাবতী প্রতীহারী আসিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী। সে বলিতেছে, 'মহারাজ সকল রত্নের আকর, অতএব এই পক্ষিরত্ন

তাঁহার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি।' সেই চণ্ডালকন্যা দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে, অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।"

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী সভাসদ্‌গণের মুখাবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "হানি কি, লইয়া আইস।" প্রতীহারী "যে আজ্ঞা," বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। চণ্ডালকন্যা অমলমণিকুট্টিমস্থ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিল উপরে অনতিবৃহৎ মনোহর চন্দ্রাতপ, তাহার অমলশুভ্র দুকূলবিতান কনকশৃঙ্খলনিয়মিত চারি মণিদণ্ডে বিধৃত রহিয়াছে, চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিকে স্থূল মুক্তাকলাপ মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; নিম্নে রাজা বিবিধ স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন; তাঁহার বামপদ জ্যোৎস্নাশুভ্র স্ফাটিক পাদপীঠে বিন্যস্ত রহিয়াছে; অমৃতফেনের ন্যায় লঘু শুভ্র পরিধেয় দুকূলবসনের প্রান্তে গোরোচনা-অঙ্কিত হংস-মিথুন কনকদণ্ডযুক্ত চামরের বাতাসে প্রনর্ত্তিত হইতেছে; মস্তকে আমোদিত মালতীমালা, যেন উষাকালে অস্তাচলশিখর তারকাপুঞ্জ-বিক্ষিপ্ত; সমাগত রাজগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যগত হইলে কনকশিখর সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন। চণ্ডালকন্যা সভার শোভা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল এবং নৃপতিকে অনন্যমনা করিবার ইচ্ছায় রক্তকুবলয়দল-কোমল করস্থিত বেণুযষ্টি-দ্বারা মণিময় সভাকুট্টিমে এক বার আঘাত করিল। তাহাতে চণ্ডালকন্যার হস্তস্থিত রত্নবলয় বাজিয়া উঠিল। তালফল পতিত হইলে অরণ্যচারী হস্তিযূথ যেমন সেইদিকে

দৃষ্টিপাত করে, বেণুযষ্টির শব্দ শুনিবামাত্র সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার মুখমণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়া সেইদিকে প্রসৃত হইল।

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগ্রে একজন পলিতকেশ ব্যায়ামপুষ্টশরীর বৃদ্ধ, পশ্চাতে স্বর্ণশলাকানির্ম্মিত-পিঞ্জরহস্তে কাকপক্ষধারী একটি বালক এবং মধ্যে এক পরমা সুন্দরী অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী আসিতেছে। সেই কুমারী সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায়, তাহার সর্ব্বশরীর আগুল্‌ফলম্বিত নীল কঞ্চুক-দ্বারা আবৃত, তাহার উপর রক্তাংশুক-রচিত অবগুণ্ঠন—যেন নীলোৎপলের উপর সন্ধ্যার লোহিত-লাবণ্য। সে নিদ্রার মত লোচনগ্রাহিণী, অশরীরিণীর মত স্পর্শবর্জ্জিতা, চিত্র-লিখিতার মত শুধু দর্শনীয়া, মূর্চ্ছার ন্যায় মনোহরা। কন্যার এরূপ রূপলাবণ্য যে, কোন ক্রমেই তাহাকে চণ্ডালকন্যা বলিয়া বোধ হয় না। রাজা তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য সৌকুমার্য্য অনিমিষলোচনে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বলিয়া ইহাকে স্পর্শ করেন নাই,—মনে মনে কল্পনা করিয়াই ইহার রূপলাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহা না হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ও এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, চণ্ডালের গৃহে এরূপ সুন্দরী কুমারীর সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব ও আশ্চর্য্যের বিষয়। এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কন্যা সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পিঞ্জর লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-বচনে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! পিঞ্জরস্থিত এই শুক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, রাজনীতি-প্রয়োগ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ, সদ্বক্তা, চতুর, নৃত্যগীতচিত্র প্রভৃতি সকলকলাভিজ্ঞ, কাব্য-

নাটক-ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ ও গুণগ্রাহী। যেসকল বিদ্যা মনুষ্যেরাও অবগত নহেন, তৎসমুদায় ইহার কণ্ঠস্থ। ইহার নাম বৈশম্পায়ন। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরপতি অপেক্ষা আপনি বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদিগের স্বামি-দুহিতা আপনার নিকট এই শুকপক্ষী আনয়ন করিয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ইনি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন।" এই বলিয়া সম্মুখে পিঞ্জর রাখিয়া সে কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইল।

পিঞ্জরমধ্যবর্ত্তী শুক দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া অতি স্পষ্টবাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা শুকের মুখ হইতে অর্থযুক্ত সুস্পষ্ট সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অমাত্য! পক্ষিজাতিও সুস্পষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরস্বরে কথা কহিতে পারে। আমি জানিতাম পক্ষী ও পশুজাতি কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিরই পরতন্ত্র, উহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাক্‌শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ, ইহাই আশ্চর্য্য যে, পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার বুদ্ধি এবং মনোবৃত্তিও মনুষ্যের মত দেখিতেছি।"

রাজার কথা শুনিয়া কুমারপালিত কহিলেন, "মহারাজ! পক্ষিজাতি যে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোকেরা শুক শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে

প্রযত্নাতিশয়-সহকারে শিক্ষা দেয় এবং উহারাও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ অনায়াসে শিখিতে পারে।” এই কথা কহিতে কহিতে সভাভঙ্গসূচক মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি হইলে সমগ্র সভা চঞ্চল ও মুখর হইয়া উঠিল। স্নানসময় উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাজাদিগকে সম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, চণ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন এবং তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীকে কহিলেন, “তুমি বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও ও স্নান-ভোজন করাইয়া দাও।”

তৎপরে আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন; ইহাতে তাঁহার কণ্ঠদাম দুলিয়া উঠিল, উত্তরীয় বস্ত্র হইতে পিঙ্গলবর্ণ কুঙ্কুমচূর্ণরেণু স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, কর্ণোৎপল দুলিয়া দুলিয়া গণ্ডস্থল স্পর্শ করিতে লাগিল। চামরগ্রাহিণী বারবিলাসিনীগণ স্কন্ধদেশে চামর ফেলিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতে তাহাদের মণিনূপুর কমল-মধুপানমত্ত-কলহংসনাদের মত বাজিয়া উঠিল, চারি দিকে সকলে প্রণত হইল।

রাজা কতিপয় সুহৃৎ-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ভূষণ ও পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া চন্দ্রতারকাশূন্য গগনের মত শোভমান হইলেন। ব্যায়ামের উপকরণসমূহ সমাহৃত হইলে সমবয়স্ক রাজকুমারগণের সহিত কিয়ৎকাল ব্যায়াম করিলেন। তখন পরিজনসকল স্নানোপকরণ সমাহরণের জন্য সত্বর হইয়া উঠিল এবং অল্প লোকের সত্বর ইতস্ততঃ গমনাগমনে রাজভবন জনাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

স্নানাগারে সিতবিতান প্রলম্বিত রহিয়াছে; পরিচারিকাসকল মণ্ডলাকারে অপেক্ষা করিতেছে; স্ফাটিক স্নানপীঠ পাতা আছে;

তাহার পার্শ্বে অতিসুরভি-গন্ধ-সলিলপূর্ণ স্নানকলস সকল সজ্জিত; পরিমলাকৃষ্ট ভ্রমরকুল কলসমুখ অন্ধকার করিয়া উড়িতেছে, যেন আতপভয়ে কলসমুখ নীলবস্ত্রে আবৃত রাখা হইয়াছে; মধ্যস্থলে গন্ধোদকপূর্ণ কনকময় জলদ্রোণী রহিয়াছে।

রাজা স্নানগৃহে প্রবেশ করিয়া স্ফাটিক পীঠে উপবেশন করিলেন। বারবিলাসিনীগণ তাঁহার মস্তকে সুগন্ধি আমলক লেপন করিয়া দিল। তখন রাজা জলদ্রোণীতে অবতরণ করিলেন এবং বারযোষাগণ বক্ষের অঞ্চল আকর্ষণপূর্ব্বক কটিদেশে নিবিড়-নিবদ্ধ করিয়া হস্ত ও চরণবলয় উর্দ্ধে সমুৎসারিত করিয়া, অলকদাম কর্ণপার্শ্বে সরাইয়া, স্নানকলস লইয়া চারি দিক্ হইতে রাজাকে অভিষেক করিতে উপস্থিত হইল।

রাজা দ্রোণীসলিল হইতে উঠিয়া রাজহংসশুভ্র স্ফাটিক পীঠে দাঁড়াইলেন। তখন কেহ বা মরকতকলস হইতে, কেহ বা স্ফাটিক কলস হইতে চন্দনরসমিশ্র জল রাজার মস্তকে ঢালিয়া দিল; কেহ রজতকলসের পার্শ্বদেশে হস্তপল্লব-বিন্যাস-দ্বারা কলস উত্তোলিত করিয়া তীর্থসলিলধারা বর্ষণ করিল, যেন রজনী পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল হইতে জ্যোৎস্নাধারা ঢালিয়া দিল; কেহ কনককলস হইতে কুঙ্কুমজল ঢালিয়া দিল, বোধ হইল যেন দিবসশ্রী বালাতপ বর্ষণ করিল।

এইরূপে স্নান সমাপন করিয়া সর্পনির্ম্মোকের ন্যায় ধবল লঘু ধৌতবাস পরিধানান্তে রাজা শরদম্বরের মত শোভমান হইলেন; অতিধবল-জলধরচ্ছেদ-শুচি দুকূলপটপল্লব-দ্বারা শিরোবেষ্টন করাতে তুহিনগিরির মত শোভিত হইলেন।

তৎপরে পূজা, আহার প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সমাপন করিয়া

শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধগন্ধামোদিত সুশুভ্র কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নকে আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে আদেশ দিলেন। প্রতীহারী আজ্ঞামাত্র বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈশম্পায়ন! তুমি কোন্ দেশে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার জনক-জননী কে? কিরূপে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিলে? তুমি কি জাতিস্মর, অথবা কোন মহাপুরুষ—যোগবলে বিহগবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিংবা অভীষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে? কি রূপেই বা চণ্ডালহস্তগত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে? এই সকল শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব তোমার আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।"

রাজার এই কথা শুনিয়া বৈশম্পায়ন বিনয়-বাক্যে কহিল, "যদি আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন,—

"ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে মহর্ষি অগস্ত্যের পবিত্র সুন্দর আশ্রম ছিল। সে স্থানে রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে উৎফুল্ল-কুমুদ-কুবলয়-শোভিত, জলচর-পক্ষিসঙ্কুল পম্পা নামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর-দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন,

তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন আলবাল-দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। উহার শাখা-প্রশাখাসকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত যে, বোধ হয় যেন উহা হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন একেবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক অবলোকন করিবার উদ্দেশ্যে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর পল্লবান্তরে, কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধসন্ধিতে ও বল্কলবিবরে সহস্র কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে ও নির্ভয়ে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও, পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশ অবস্থিতিপ্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন পক্ষি-শাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র বা অসংখ্য ইন্দ্রধনু আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহারা দিগ্‌দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণ-পূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত বিবিধ ফলরস ও কলমমঞ্জরী বহন করিয়া আনে এবং রক্তানুলিপ্ত ব্যাঘ্রনখের ন্যায় চঞ্চুপুট-দ্বারা শাবকদিগকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।

"সেই বৃক্ষের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা আমাকে প্রসব করিয়া

সূতিকা-পীড়ায় অভিভূতা হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগ-শোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন। তথাপি স্নেহ-বশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া শোকসংবরণপূর্ব্বক আমার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার পিচ্ছজাল স্বল্প জর্জ্জর ও শিথিল হইয়া গিয়াছিল; তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না; তথাপি ধীরে ধীরে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া, অন্য পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট শালিবল্লরী হইতে যে যৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইতেন আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিতেন।

"একদা নিশাবসানে গগনতল যখন প্রভাত-সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধ হংসের ন্যায় মন্দাকিনী-পুলিন হইতে পশ্চিমসমুদ্রতটে অবতরণ করিতে-ছেন; দিক্চক্রবালে বৃদ্ধ রঙ্কুমৃগের রোমের মত একটি পাণ্ডুতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে; গজ-রুধিররক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত, ঈষৎতপ্ত লাক্ষাতন্তুর ন্যায় পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্য্যরশ্মি-গুলি যেন পদ্মরাগমণি-শলাকার সম্মার্জ্জনী-দ্বারা গগনকুট্টিম হইতে তারাপুষ্পগুলিকে সমুৎসারিত করিয়া দিতেছে; সপ্তর্ষিমণ্ডল উত্তরদিকে অম্বরতল হইতে সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য যেন মানস-সরোবরের তীরে অবতরণ করিতেছেন; অরুণকরনিক্ষিপ্ত তারা-গণের ন্যায় বিকশিত-শুক্তিসম্পুট-স্খলিত মুক্তাফলনিকর বিক্ষিপ্ত হইয়া পশ্চিমসমুদ্রতট ধবলিত করিয়াছে; তপোবনবাসী

অগ্নিহোত্রদিগের গৃহ হইতে রাসভ-রোম-ধূসর ধূমলেখা উত্থিত হইয়া তরুশিখরে পারাবতমালার ন্যায় কুণ্ডলিত হইয়া ঘুরিতেছে; নিশাবসানহেতু জড়িমপ্রাপ্ত সমীরণ হিমশীকর বহন করিয়া, পল্লবলতা নাচাইয়া, কমলবনের সুগন্ধ হরণ করিয়া মন্দমন্দ বহিতে লাগিল; প্রভাতস্নিগ্ধ-সমীরণাহত হইয়া নিদ্রালসচক্ষুর উত্তপ্ত জতুরসাশ্লিষ্ট পক্ষ্মমালা ঈষৎ বিকশিত করিয়া উষরশয্যাধূসর বনমৃগসকল জাগরিত হইয়া উঠিল; পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী মুখরিত হইল। ক্রমে সূর্য্য স্পষ্ট হইতে লাগিল। কিঞ্চিদুন্মুক্ত নব-নলিনদল-সম্পুটের মত পাটলবর্ণ নবোদিত রবির মঞ্জিষ্ঠারাগ-লোহিত কিরণজালে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ একে একে আহারের অন্বেষণে অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ-সকল গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুসকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুসকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতি বেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও যেন ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া নিরাপদ্ হইবার আশায় পিতার

জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের নানাপ্রকার চীৎকার ও কোলাহল শুনিতে লাগিলাম।

"যখন মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইয়াছে, তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে ত্রাসচঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের স্থায়, পাপের সারথির স্থায়, নরকের দ্বারপালের স্থায় বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতির সমভিব্যাহারে ঘনীভূত অন্ধকার অথবা অঞ্জনশিলার স্তম্ভসম্ভার-সদৃশ কৃষ্ণকায় কুরূপ ও কদাকার কতকগুলি শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূত-বেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তককে স্মরণ হয়। পরে অবগত হইলাম যে, সেই সেনাপতির নাম মাতঙ্গক। তাহার স্কন্ধাবলম্বী আকুটিলাগ্র কুন্তলভার কৃষ্ণক্রূর মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া আছে; সুরাপানে তাহার দুই চক্ষু জবাবর্ণ; সর্ব্ব শরীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগিয়াছে; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে করিলাম, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত! জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য, মাংস আহার, ধনু ধন, কুক্কুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এই চিন্তা

করিতেছিলাম, এমন সময়ে মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে কমলপত্রসম্পুটে করিয়া দ্রবমুক্তাফল-সদৃশ স্বচ্ছ জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা শান্ত করিল। তাহারা যখন অমল ধবল মৃণাল ভক্ষণ করিতেছিল, মনে হইতেছিল যেন রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। কিছুক্ষণ বসিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া তাহারা চলিয়া গেল।

"শবরসৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সেদিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই ; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রুধিরবিন্দুপাটল দুই চক্ষুর দ্বারা সেই তরুর মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একবার এমনভাবে নিরীক্ষণ করিল যেন পক্ষিগণের আয়ুঃই পান করিতেছে। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে! সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্ব্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, সেইরূপ অবলীলাক্রমে সেই নৃশংস সেই কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ প্রকাণ্ড মহীরুহে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিতে লাগিল। কোন কোন শাবক অল্পদিবসজাত, তাহাদের নবপ্রসূত কমনীয় পাটলকান্তি যেন শাল্মলীকুসুমের মত, কাহারও পদ্মের নূতন দলগুলির মত অল্প উদ্গত পক্ষদ্বয়, কাহারও বা পদ্মরাগের প্রায় বর্ণ, কাহারও বা লোহিতায়মান চঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষদুন্মুক্তমুখ কমলের মত, কাহারও বা মস্তক অনবরত কম্পিত হইতেছে, যেন ব্যাধকে নিবারণ করিতেছে ;

এই সমস্ত অসমর্থ শুকশিশুগুলিকে বনস্পতির শাখাসন্ধি ও কোটরাভ্যন্তর হইতে এক একটি ফলের মত গ্রহণ করিয়া প্রাণ-সংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার বৃদ্ধ বয়স, অকস্মাৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। পিতা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া ত্রাসে আমাকে শিথিলসন্ধি পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন, তখন দেখিলাম তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ব্যাধ ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইল এবং কালসর্পাকার বামকর কোটরে প্রবিষ্ট করিয়া পিতাকে ধরিল। তিনি চঞ্চুপুট-দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িল না ;—কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ-দ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া সে আমাকে দেখিতে পায় নাই। ঐ তরু-তলে শুষ্ক পর্ণরাশি পুঞ্জিত ছিল, আমি তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

"অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশবপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহ-সঞ্চার না হওয়াতে আমার কেবল ভয়ই হইল। প্রাণ-পরিত্যাগের উপযুক্ত কাল পাইয়াও আমি নিতান্ত নৃশংস ও নির্দ্দয়ের ন্যায় মৃত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা

করিতে লাগিলাম। অস্থির চরণ ও অসমগ্রোদ্গত পক্ষপুটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গমন করিবার উদ্যোগ করাতেও বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল না। পরিশেষে মন্দমন্দ গমন করিয়া নিকটস্থিত এক ঘনকৃষ্ণপল্লবিত তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম, তখন মনে হইল যেন পিতৃ-ক্রোড়েই আশ্রয় পাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্র করিয়া লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে শবরসৈন্যেরা গিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।......”

তারাশঙ্কর তর্করত্ন।



রাজা রামমোহন রায়

ধন্য রামমোহন রায়! যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয়, সেই সময়ে তোমার সতেজ বুদ্ধিজ্যোতি যে ঘোরতর অজ্ঞানরূপ নিবিড় জলদ-রাশি বিদীর্ণ করিয়া এতদূর বিকীর্ণ হইয়াছিল এবং তৎসহকারে তোমার সুবিমল স্বচ্ছ চিত্ত যে নিজ দেশে ও নিজ সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার কুসংস্কার নির্ব্বাচন করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইহা সামান্য আশ্চর্য্য ও সামান্য সাধুবাদের বিষয় নয়। তখন তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎসাহে উৎসাহিত হৃদয় জঙ্গলময় পঙ্কিলভূমি-পরিবেষ্টিত একটী অগ্নিময় আগ্নেয়গিরি ছিল; তাহা হইতে পুণ্য পবিত্র প্রচুর জ্ঞানাগ্নি সতেজে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিত। তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল-পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ, তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে। সেই অত্যুন্নত গম্ভীর তূর্য্যধ্বনি অদ্যাপি বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া এই অযোগ্য দেশে জয় লাভ করিয়া আসিতেছে। তুমি স্বদেশ ও বিদেশ-ব্যাপী ভ্রম ও কুসংস্কার সংহার-উদ্দেশ্যে আততায়ি-স্বরূপে রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ, এবং বিচারযুদ্ধে সকল বিপক্ষ পরাস্ত করিয়া নিঃসংশয়ে সম্যক্-রূপে জয়ী হইয়াছ। তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটী সুবিস্তর মনোরাজ্য অধিকার করিয়া রাখিয়াছ। তোমার সমকালীন ও বিশেষতঃ উত্তরকালীন

সুমার্জ্জিত-বুদ্ধি শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া তোমার জয়ধ্বনি করিয়া আসিতেছে। যাঁহারা আবহমান কাল হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে * পরাজয় করিয়াছ। অতএব তুমি রাজার রাজা। তোমার জয়-পতাকা তাঁহাদেরই স্বাধিকার মধ্যে সেই যে উত্তোলিত হইয়াছে, আর পতিত হইল না, হইবেও না, নিয়তই একভাবেই উড্ডীয়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষীয়েরা তোমাকে পরম শত্রু বলিয়া জানিতেন, তদীয় সন্তানেরা অনেকেই এখন তোমাকে পরম বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কেবল ভারতবর্ষীয়দের বন্ধু কেন, তুমি জগতের বন্ধু। †

এক দিকে জ্ঞান- ও ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত করিয়া জন্মভূমিকে উজ্জ্বল করিবার যত্ন করিয়াছ, অপর দিকে সঙ্কটময় সুগভীর সমুদ্রসমূহ উত্তরণপূর্ব্বক বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া নানা বিষয়ে রাজশাসনপ্রণালীর সংশোধন ও শুভ-সাধনার্থ প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছ। ‡ সে সময়ের পক্ষে এ কি কাণ্ড! কি

* প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-ব্যবস্থাপকদিগকে।

† "The promotion of human welfare and specially the improvement of his own countrymen, was the habit of his life." – Rev. Carpenter.

"An ardent well-wisher to the cause of freedom and improvement everywhere."—Miss Lucy Aikin's letter to Dr. Channing.

‡ স্বদেশের কল্যাণসাধন ও বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর সংশোধনই রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা সহমরণ-নিবারণ-বিষয়ক রাজনিয়মের প্রতিকূল-পক্ষে ইংলণ্ডে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ের সুবিচার-সম্পাদন-উদ্দেশ্যে,

ব্যাপার! স্বাভাবিক শক্তির এতই মাহিমা! তুমি ইংলণ্ডে গিয়া অধিষ্ঠান করিলে, তথাকার সুপণ্ডিত সাধু লোকে তোমার অসাধারণ গুণগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া যায়। তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, একবার তথাকার কোন সজ্জন-সমাজে চমৎকার-সম্বলিত এইরূপ একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়,

ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার্ পরিবর্ত্তন-সময়ে তৎসংক্রান্ত বিচারে লিপ্ত হইয়া যদি ভারতবর্ষীয়দের হিতসাধন করিতে সমর্থ হন—এই অভিপ্রায়ে, এবং বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয় বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি বিষয়ের অনুসন্ধানার্থ তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন। দিল্লীর বাদশাহ একটী মোকদ্দমার ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া দেন; ইহাতেই তাঁহার মনোরথ-পূরণের সুবিধা ও সদুপায় ঘটিয়া উঠে। তিনি যত দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তত দিনই ঐ সকল মহৎ ব্যাপার সাধনার্থই ব্যস্ত ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাজস্ব ও বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল নামক রাজকীয় কার্য্যালয়ে অর্পণ করেন এবং সেই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষেরা হৌস অব্ কমন্স নামক সভায় সেই সমস্ত পাঠাইয়া দেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজপুরুষদের অনুরোধক্রমে পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে নিজে বারংবার উপস্থিত হইয়া শাসন-প্রণালী-সংক্রান্ত আপন অভিপ্রায় প্রকাশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন এবং ভারতবর্ষীয় রাজকীয় ব্যাপারের গুণাগুণ বিচার ও উত্তরকালীন শাসন-পদ্ধতি-বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব, যুক্তি ও পরামর্শ লিখিয়া বিভাগাদির নক্সা-সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রস্তুত করেন। ঐ সমুদয় ব্যতিরেকে, হিন্দুদের দায়াধিকার ও ভারতবর্ষীয় বিচার-প্রণালী-সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকও রচনা করেন।

তিনি উল্লিখিত সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির মধ্যে ভারতবর্ষীয় লোকের পদবৃদ্ধির জন্ম অনুরোধ ও ব্যাকুল চিত্তে কৃষিজীবীদের দুঃখ-হরণার্থ প্রার্থনা করেন।

সেই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের শাসন-সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলী প্রস্তাবিত হয়; তিনি তদর্থে এত চিন্তিত থাকিতেন যে, অনেকে স্বার্থ-সাধন-বিষয়েও তত চিন্তিত থাকে কি না সন্দেহ।

যেন সাক্ষাৎ প্লেটো, সক্রেটিস্ বা নিউটন্ ধরণী-মণ্ডলে পুনরায় উপস্থিত হইলেন। * তুমি আপন সময়ের অতীত বস্তু। কেবল সময়েরই কেন? আপন দেশেরও অতীত। ভারতবর্ষ তোমার যোগ্য নিবাস নয়। এক ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ দেশে এরূপ লোকের জন্ম-গ্রহণ অবনী-মণ্ডলে আর কখনও ঘটিয়াছিল বোধ হয় না। †

তাঁহার ঐ পুস্তক ও প্রবন্ধগুলি অল্প উপকারী হয় নাই। বৃটিশ রাজ-পুরুষেরা তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ক্রমে ক্রমে অনেক কার্য্য করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা বিশেষ উপকারও দর্শিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

"They" (Ram Mohun Roy's Communications to British Legislature) "show him to be at once the philosopher and the patriot. They are full of practical wisdom and there is reason to believe that they were highly valued by our Government, and that they aided in the formation of the new system."—Dr. Carpenter.

* Monthly Repository of June, 1831.

† যে সময় গুরুপাঠশালার শুভঙ্করী অঙ্ক ও কচিৎ পার্সী কায়দা (১) শিক্ষাবধি সর্ব্বসাধারণ বিষয়ী লোকে বিদ্যাশিক্ষার চরম সীমা ছিল, সেই সময়ে যিনি পৃথিবীর প্রাচীন ও অপ্রাচীন বহুতর প্রধান প্রধান ভাষা প্রভৃতি দশ ভাষায় ও বিবিধ বিজ্ঞানে স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন (২); যিনি ভিন্ন ভিন্ন নানা ভাষায় স্বদেশের কল্যাণকর বিবিধ পুস্তক প্রস্তুত করেন, আপনার দেশ-ভাষায় রীতিমত গদ্য-গ্রন্থ-রচনার পথপ্রদর্শন করেন, সেই ভাষায় ব্যাকরণ-রচনাদি-দ্বারা

(১) পার্সী ব্যাকরণ।

(২) "The wide field over which his acquirements spread comprising sciences and languages which individual knowledge rarely associates together."—W. J. Fox.

সহমরণ-নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপন, দেশীয় লোকের পদোন্নতি-সাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান

তাহার শিক্ষা-প্রচলনের উপায়ানুষ্ঠান করেন (১) এবং যেরূপ শিক্ষায় লোকের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বিনষ্ট হইয়া বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে প্রবৃত্তি জন্মে, ইংরাজি বিদ্যালয়-সংস্থাপনাদি-দ্বারা স্বদেশে সেইরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা পান, যে সময়ে তাহারা ঘোরতর অজ্ঞান ও অশেষ প্রকার কুসংস্কারে অন্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে যিনি আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তেজস্বিতা-প্রভাবে সমুদয় কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্মাদি-সংশোধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, ও সে বিষয়ে সুনিপুণ ও কৃতকার্য্য হইবার উদ্দেশে স্থল-পথে ও সমুদ্র-পথে কত কত অতিদূর-স্থিত দুর্গম দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা জাতির ধর্ম্ম, কর্ম্ম, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করেন (২); যিনি স্বদেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যথায় ব্যথিত ও কারুণ্য-রসে অভিষিক্ত হইয়া তদীয় শিক্ষা-বিষয়ে সমুচিত যুক্তি প্রদর্শন ও নিতান্ত সানুকূল ভাব প্রকাশ করেন, বহুবিবাহ-রীতি ও বর্ত্তমান দায়াধিকার-বিষয়ক ব্যবস্থা তাহাদের অশেষ ক্লেশের মূল ও অনেক অনর্থের কারণ বলিয়া প্রচার করেন, অসঙ্গত নিগ্রহ সহ্য করিয়াও প্রাণপণে সহমরণরূপ বিষময় প্রথা নিবারণ করেন এবং দেশময় এই জন-প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বিধবা-বিবাহ প্রচলনের উদ্যোগ পাইবেন এইরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন; যে সময়ে স্বদেশীয় লোকে সাধারণ হিতানুষ্ঠান-ধর্ম্মের মর্ম্ম-গ্রহণ করিতেই পারিত

(১) রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় গৌড়ীয় ব্যাকরণ ব্যতিরেকে খগোল ও জাগ্রাহী নামে জ্যোতিষ ও ভূগোল বিদ্যা-বিষয়ক অপর দুইখানি শিক্ষা-পুস্তক প্রস্তুত করেন।

(২) ভোট দেশে তিন বৎসর ও ইয়ুরোপে সার্দ্ধ দুই বৎসর অবস্থিতি করেন। সে সময়ে নানাবিধ দুর্গম দেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক ভোট দেশ পর্য্যন্ত গমন করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

রহিয়াছে। না জানি কি কল্যাণময়ী মহীয়সী কীর্ত্তি-সংস্থাপন-উদ্দেশে অর্দ্ধ-ভূমণ্ডল অতিক্রম করিতে * কৃতসঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলে। তাদৃশ সুদূরস্থিত ভূখণ্ডবাসী সুপ্রতিষ্ঠিত সাধু লোকেও তোমার অসামান্য মহিমা জানিতে পারিয়া প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক তোমাকে সমাদর করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র ছিল। মনে মনে কতই শুভ সঙ্কল্প সঞ্চারিত ও কতই দয়াস্রোত প্রবাহিত

না, সেই সময়ে যিনি ঐ ধর্ম্মটী আপনার চিরজীবনের একমাত্র নিত্যব্রত-স্বরূপ অবলম্বন করেন ও তাহাদের বিষম বিদ্বেষ ও ঘোরতর প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া তাহাদেরই দুঃখ-হরণ, সুখ-বর্দ্ধন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতি-সাধন করিতে নিরন্তর প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকেন ; কেবল স্বজাতির শুভান্বেষণ নয়, যিনি ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সংশোধন ও অন্য দেশীয় লোকের হিতানুষ্ঠান-বিষয়েও উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করেন ; কেবল ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন নয়, যিনি স্বয়ং স্বাধীন দেশের অধিবাসী ও রাজপুরুষের মধ্যে না হইলেও নিজের বুদ্ধিবিদ্যা ও ক্ষমতা-প্রভাবে রাজ্যশাসন-প্রণালীর সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া স্বদেশীয় লোকের দুঃখ-হরণ ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদনার্থ অতিশয় সাহসিকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পান, অসাধারণ বুদ্ধি-গৌরব, রাজ-নীতিজ্ঞতা, অধ্যবসায় ও উপচিকীর্ষা-প্রকাশপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অসামান্য বিষয়ে চিরজীবন অনুরক্ত থাকিয়া সে সময়েও আপনার জীবিত-কাল-মধ্যে যতদূর সম্ভব কৃতকার্য্য হন, এবং যিনি উল্লিখিত রূপ মহৎ ক্রিয়ানুষ্ঠান, সর্ব্বহিতৈষিতা, সদাশয়তা, শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপগুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য জাতীয় বিশিষ্ট লোকের প্রীতি-পাত্র ও ভক্তি-ভাজন হইয়া যান, তাঁহার সদৃশ উক্তরূপ অসাধারণ বহুতর গুণালঙ্কারে অলঙ্কৃত ব্যক্তি ভূমণ্ডলে এবং বিশেষতঃ এইরূপ অযোগ্য দেশে আর কখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় না। একাধারে এরূপ অশেষ প্রকার অসামান্য-বিবরিণী অলোক-সামান্য বুদ্ধি, ক্ষমতা ও হিতৈষিতার একত্র সংযোগ আর কখনও ঘটে নাই বোধ হয়।

* আমেরিকা গমন করিতে।

করিয়াছিলে। কিন্তু ভারতের কপাল মন্দ! সে সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইল না। বৃস্টল!—বৃস্টল! * তুমি কি সর্ব্বনাশই করিয়াছ! আমাদিগকে একেবারেই অনাথ ও অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছ। যাহাতে অশেষরূপ অমৃত-স্বাদ ফল-রাশি উৎপৎস্যমান হইয়াছিল, সেই অলোকসামান্য বৃক্ষমূলে সাঙ্ঘাতিক কুঠার প্রহার করিয়াছ! সেই বিপদের দিন কি ভয়ঙ্কর দিনই গিয়াছে! আমাদের সেই দিনের মৃতাশৌচ অদ্যাপি চলিতেছে ও চিরকালই চলিবে! সেই দিন ভারত-রাজ্যের কল্যাণ-শিরে বজ্রাঘাত হইয়াছে! এ দেশীয় নব্য সম্প্রদায়! সেই দিন তোমরা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় হইয়া রণজিৎ-শূন্য শিখ্ সৈন্যের অবস্থায় পতিত হইয়াছ! দুঃখজীবী কৃষিজীবিগণ! যে সময়ে তোমরা স্বদেশ ও বিদেশের জন্য অপর্য্যাপ্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াও নিজে স্বচ্ছন্দমনে ও নিরশ্রুনয়নে অত্যপকৃষ্ট তণ্ডুল-গ্রাসও গ্রহণ করিতে পাও নাই, সেই সময়ে যিনি এই দুঃসহ দুঃখ-রাশি পরিহার করিয়া তোমাদের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, এবং তজ্জন্য বৃটিশ রাজ্যের রাজধানীতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তোমাদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক রাজপুরুষের নিকট স্বহস্তে লিখিয়া বিশেষরূপ কাতরতা প্রকাশ

" Strange is it that such a man should have been given by India to the world. * * * Strange it is—but he was not of India, so much as for India." —Rev. W. J. Fox's Sermon.

"Such an instance is probably unparalleled in the history of the world."—Mary Carpenter.

* ইংলণ্ডের অন্তর্গত বৃস্টল নামক স্থানে রামমোহন রায়ের মৃত্যু ও সমাধি হয়।

করেন, * সেই দিনে তোমরা সেই করুণাময় আশ্রয়ভূমির আশ্রয়-লাভে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইয়াছ! ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহ-ভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখবিমোচন ও বিশেষ-রূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার অন্তঃকরণের একটী প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়-বিদীর্ণ-কারী ব্যাপার স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত-ব্যবস্থা ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোক-সন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবর্ষণ সমস্তই নিবারণপূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান, সেই দিনে তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারা হইয়াছ। বিবিধ পীড়ায় প্রপীড়িত জননী ভারত-ভূমি! যে আশা নরলোকের জীবন-স্বরূপ সেই দিন তোমার সেই আশাবল্লী বুঝি নির্মূল হইয়াছে!

পূর্ব্বতন শোক-সংবাদ নবীভূত হইয়া উঠিল! অশ্রুধারা-নিবারণে একেবারেই অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি। এ সময়ে বিষয়ান্তর স্মরণ করিয়া উহা বিস্মৃত হওয়া আবশ্যক। একটী প্রবোধের বিষয়ও আছে। আমাদের রাজা একেবারে নির্ব্বাণ হইবার বস্তু নন। তিনি ভূ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন তথাচ চিরাবলম্বিত হিত-ব্রত উদ্যাপন করিয়া যান নাই। তদীয় সমাধি-ক্ষেত্র হইতে কত বার কত পরম শ্রদ্ধেয় সুপবিত্র মহানাদ বিনির্গত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া কতই হিতোৎসাহ-উদ্দীপন ও কতই শুভ সঙ্কল্প-সম্পাদন

* Appendix to the Report from the Select Committee of the House of Commons on the affairs of the East India Company, published in 1831.

করিয়া আসিয়াছে! অতএব তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াও আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই; জীবৎকালের সদভিপ্রায়-বলে ও নিজ চরিতের দৃষ্টান্ত-প্রভাবে মৃত্যুর পরেও উপকার-সাধন ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আমাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়া রহিয়াছেন। কেবল আমাদের নয়, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাও ভক্তিশ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। *

অক্ষয়কুমার দত্ত।

* "'Being dead, he yet speaketh' with a voice to which not only India but Europe and America will listen for generations."—Fox's Sermon.

"'Though dead, he yet speaketh;' and the voice will be heard impressively from the tomb, which in his life, may have excited only the passing emotions of admiration or respect."—Dr. Carpenter's Sermon.

মিত্রতা

সঙ্গলাভের বাসনা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ এবং সমস্ত সদ্‌গুণ আমাদের আদরণীয়। কাহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে তাহার প্রতি অনুরাগ-সঞ্চার হয়, এবং অনুরাগ-সঞ্চার হইলেই তাহার সঙ্গলাভ করিবার বাসনা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক জনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে; কিন্তু উভয়ের সমান ভাব না হইলে প্রকৃতরূপ বন্ধুত্ব-ভাবের উৎপত্তি হয় না। সমান ভাব ও সমান অবস্থা সদ্ভাব-সঞ্চারের মূলীভূত। এই হেতু বালকের সহিত বালকের, যুবার সহিত যুবার এবং প্রাচীনের সহিত প্রাচীন ব্যক্তির সৌহৃদ্য-ভাব সহজে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই হেতু পণ্ডিতের সহিত পণ্ডিত লোকের, অজ্ঞের সহিত অজ্ঞ লোকের, সাধুর সহিত সাধু লোকের এবং অসাধুর সহিত অসাধু লোকের মিত্রতা-ভাব অক্লেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই হেতু ধনীর সহিত ধনী লোকের, দুঃখীর সহিত দুঃখী লোকের এবং মধ্য-বিত্তের সহিত মধ্য-বিত্ত লোকের অপেক্ষাকৃত অধিক সৌহৃদ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মানসিক প্রকৃতির সাম্যভাবই বন্ধুত্ব-গুণোৎপত্তির প্রধান কারণ। যে সমস্ত সুচরিত্র ব্যক্তির মনোবৃত্তি একরূপ হয়, সুতরাং এক বিষয়ে প্রবৃত্তি ও এক কার্য্যে অনুরক্তি জন্মে, তাঁহাদেরই পরস্পর প্রকৃতরূপ মিত্রতা লাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু মেদিনী-মণ্ডলে দুই ব্যক্তির সর্ব্ববিষয়ে সমান হওয়া সম্ভব

নয়। যাহাদের জ্ঞান সমান, তাহাদের অবস্থা সমান নয়। যাহাদের অবস্থা সমান, তাহাদের ধর্ম্ম সমান নয়। যাহাদের ধর্ম্ম সমান, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নয়। যাহাদের প্রবৃত্তি সমান, তাহাদের সম্পত্তি সমান নহে। অনৈক্য ঘটনার এইরূপ অশেষবিধ হেতু বিদ্যমান থাকাতে এক ব্যক্তির সহিত অন্য ব্যক্তির সমস্ত বিষয়ে মিলন হয় না ; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে সৌহৃদ্য-ভাবও উৎপন্ন হয় না। যে বিষয়ে যাহাদের অন্তঃকরণের ঐক্য হয়, তাহাদের সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া সদ্ভাব হইতে পারে, এবং যে পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে বৈষম্যভাব উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই সদ্ভাব স্থায়ী হইতে পারে। যাঁহার সহিত কিয়ৎ বিষয়ে ঐক্য হয়, আমরা এ সংসারে তাঁহাকেই বন্ধুত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করি। এরূপ বন্ধুও অতি দুর্লভ।

আমরা যাদৃশ বন্ধু-লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই, যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণী-মণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, তথাচ বন্ধু-ব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত-শিরোমণি বেকন্ উল্লেখ করিয়াছেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে সংসার একটি অরণ্যমাত্র। অপর এক মহাত্মা (সিসিরো) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বন্ধু-হীন জীবন আর সূর্য্য-হীন জগৎ উভয়েই তুল্য। তৃতীয় এক ব্যক্তি (হিতোপদেশ-কর্ত্তা) লিখিয়া গিয়াছেন, সংসার রূপ বিষ-বৃক্ষে দুইটি সুরস ফল বিদ্যমান আছে, কাব্যরূপ অমৃত-রসের আস্বাদন ও সজ্জনের সহিত সমাগম। যিনি দুঃখের হস্তে পতিত হইয়াও বন্ধুজনের দর্শন পান, দুঃখ কি কঠোর পদার্থ—তিনি তাহা অবগত নহেন। যিনি বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্পৎ-সুখ সম্ভোগ করেন, বন্ধু-ব্যতিরেকে বিষয়-সম্পত্তি কেমন অকিঞ্চিৎকর, তাহাও তাহার প্রতীত হয়

না। বন্ধু শব্দ যেমন সুমধুর, বন্ধুর রূপ তেমনি মনোহর। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাপিত চিত্ত শীতল হয়, এবং বিষণ্ণ বদন প্রসন্ন হয়। প্রণয়-পবিত্র সচ্চরিত্র মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া যেমন পরিতোষ জন্মে, তেমন আর কিছুতেই জন্মে না। তাঁহার সহিত সহসা সাক্ষাৎকার হইলে, কি জানি কি নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত সুদুঃখিত ব্যক্তিরও অধরযুগলে মধুর হাস্যের উদয় হয়। দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেরূপ তৃপ্তি জন্মে, পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া সুশীতল জল পান করিলে যেরূপ সুখানুভব হয়, এবং তপন-তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে, অঙ্গ-সন্তাপ দূরীকৃত হইয়া যেরূপ প্রমোদলাভ হয়, সেইরূপ প্রিয় বন্ধুর সুমধুর সান্ত্বনা-বাক্য-দ্বারা দুঃখিত জনের মনের সন্তাপ অন্তরিত হইয়া সন্তোষসহ প্রবোধ-সুধার সঞ্চার হয়।

বন্ধুত্ব-গুণের প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। উহা এমন মনোহর বিষয় যে, শত শত গ্রন্থকার উহার মাধুর্য্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ এ স্থলে আমাদের মিত্রতা-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবরণ করা যত আবশ্যক মিত্রতার গুণ বর্ণনা করা তত আবশ্যক নয়। কাহারও সহিত মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ হইবার সময়ে কিরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত; তৎপরে যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে ততকাল কিরূপ আচরণ করা বিধেয়; পরিশেষে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই বা কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য,—এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য নয়। সাধু-সঙ্গ যেমন গুণকারী, অসাধু-সঙ্গ

তেমনি অপ্তণকারী—ইহা প্রসিদ্ধই আছে। বন্ধুর দোষে আমাদের চরিত্র দূষিত হয়। আমরা যে ব্যক্তিকে একান্ত ভালবাসি ও যাঁহার সহিত সর্ব্বদা সহবাস করি, তাঁহার দোষ-সমুদায়কে দোষ বলিয়া বিবেচনা করি না; প্রত্যুত, তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুরূপ অসদাচরণ করিতেই প্রবৃত্ত হই। তাঁহার দোষ-সমুদায় আমাদিগের এমন অক্লেশে অভ্যাস পায় যে, জানিতেও পারি না—কিরূপে অভ্যাস হইল। অতএব যখন আমাদের গুণাগুণ ও সুখদুঃখ মিত্রের গুণাগুণের এত সাপেক্ষ, তখন যে ব্যক্তিকে সচ্চরিত্র ও সদ্বিবেচক বলিয়া নিশ্চয় না জানা যায়, তাঁহার সহিত মিত্রতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। যাঁহার বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উভয়ই বলবতী, তাঁহারই সহিত মিত্রতা করা কর্ত্তব্য।

মিত্রের দোষে চিরজীবন দুঃখ পাইবার সম্ভাবনা এবং মিত্রের গুণে চিরজীবন সুখী হইবার সম্ভাবনা। যে দুষ্কর্ম্মশালী দুঃশীল ব্যক্তির সহিত কিছুদিন মিত্রতা থাকিয়া বিচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহারও সেই অল্প কালের সংসর্গ-দোষে আমাদের চরিত্র এমন দূষিত হইতে পারে যে, জন্মের মত দোষী থাকিয়া, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া কালহরণ করিতে হয়। যদি কিয়ৎক্ষণ হাস্য-কৌতুক ও প্রমোদ-সম্ভোগমাত্র বন্ধুত্ব-করণের উদ্দেশ্য হইত, তবে, কেবল পরিহাস-পটু সুরসিক ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি কাহারও নিকট কিছু সাংসারিক উপকার-প্রাপ্তির উদ্দেশে শিষ্টতা ও সৌজন্য-প্রকাশমাত্র বন্ধুত্ব-করণের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে কেবল উদার-স্বভাব ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ক্ষমতাপন্ন পদস্থ ব্যক্তি দেখিয়া তাঁহারই সহিত বন্ধুত্ব করিতাম। যদি লোক-সমাজে মান্য লোকের মিত্র বলিয়া গণ্য

হওয়া বন্ধুত্ব-করণের অভিসন্ধি হইত, তাহা হইলে কোন লোক-মান্য বিখ্যাত ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য, অথবা লোকের নিকট তাঁহার বন্ধু বলিয়া কথঞ্চিৎ পরিচিত হইবার নিমিত্ত অশেষমত চেষ্টা পাইতাম। কিন্তু যদি মিত্রের সহিত মিত্রের মনোমিলনের নাম মিত্রতা হয়, যদি মিত্রের ক্লেশে ও মিত্রের বিপদে বিপন্ন হওয়া বিধেয় হয়, যদি মিত্রের দোষ গোপন করিয়া সুস্পষ্ট পক্ষপাতদোষে দূষিত হওয়া আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, যদি পাপিষ্ঠ মিত্রের সংসর্গবশতঃ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হওয়া সম্ভাবিত হয়, যদি বন্ধুজনের কদাচার-জনিত কলঙ্ক শুনিয়া লজ্জিত ও সন্তপ্ত হওয়া অপকট-হৃদয় সুহৃদ্‌বর্গের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে কাহারও সহিত মিত্রতা-গুণে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার গুণ ও চরিত্র যত্নপূর্ব্বক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য, তাহার সন্দেহ নাই। যিনি তোমার সহিত আত্মীয়তা করিবার বাসনা করেন, তিনি আপনি আপনার আত্মীয় কি না, বিচার করিয়া দেখ।

ধরণী-মণ্ডলে ধর্ম্ম-ব্যতিরেকে আর কিছুই স্থায়ী নহে। ধর্ম্ম যে মিত্রতার মূলীভূত নয়, তাহা কদাচ স্থায়ী হয় না। বন্ধু যেমন বিশ্বাসস্থল, এমন আর কেহই নয়। কিন্তু অপাত্রে বিশ্বাস করিলে অবিলম্বেই প্রতিফল পাইতে হয়। যে ব্যক্তি স্বার্থ-লাভ-প্রত্যাশায় কাহারও সহিত মিলন করে, যদি বন্ধুজন-সম্পর্কীয় কোন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিলে স্বার্থ-লাভ হয়, তবে সে কথা কেন না প্রকাশ করিবে? যে ব্যক্তি অধর্ম্মাচরণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে বন্ধুজন-সমীপেই-বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে কেন কুণ্ঠিত হইবে? যে ব্যক্তি আমাদের আকস্মিক দারিদ্র্য-দশা উপস্থিত দেখিয়া, আমাদের নিকট উপকার-প্রত্যাশা রহিত হইল

বলিয়া, চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হয়, সে ব্যক্তি আমাদের দুঃখানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচন করিতে কেন ব্যগ্র হইবে? এমন ব্যক্তি যদি আমাদের অপযশ ঘোষণা করিয়া স্বার্থলাভ করিতে পারে, তবে আমাদিগের চরিত্রে অসত্য-কলঙ্ক আরোপণ-পূর্ব্বক সুখ্যাতি লোপ করিতেই বা কেন পরাঙ্মুখ হইবে? অনেক ব্যক্তি বিশ্বাস-ঘাতক বন্ধুর বিষম অত্যাচার-জনিত দুঃসহ ক্লেশে কাতর হইয়া থাকেন, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ঐ ক্লেশ কেবল সেই বন্ধুর দোষে নয়, নিজ দোষেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপাত্রে বিশ্বাস-স্থাপন করাতেই তাঁহাকে ঐ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। বন্ধুত্ব-ঘটনার প্রারম্ভ-সময়ে যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত, তাহা না করাতেই উক্তরূপ ক্লেশ-পরম্পরা ভোগ করিতে হয়। অতএব, অসাধু লোকের সহিত বন্ধুতা করা কোনরূপেই শ্রেয়স্কর নয়। সদ্বিদ্যাশালী সচ্চরিত্র দেখিয়া বন্ধু করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, যে সময়ে কোন ব্যক্তিকে মিত্র বলিয়া অবধারণ করা যায়, সেই সময় অবধি তৎসংক্রান্ত কতকগুলি অতি মনোহর অভিনব ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়। সেই সমুদায় পবিত্র ব্রতই বা কি, এবং কিরূপেই বা পালন করিতে হয়, পশ্চাৎ তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইতেছে। যতকাল তাঁহার সহিত মিত্রতা থাকে, তাবৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার সম্পাদন করিতে হয়, তাহা অগ্রে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। তাঁহার বিচ্ছেদ বা প্রাণত্যাগ-জনিত সুদারুণ শোক-সন্তাপ যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তাহা হইলে, তৎপরে যাবৎকাল জীবিত থাকিতে হয়, তাবৎ-কাল তদীয় সদ্ভাব-সংক্রান্ত যে যে নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে।

আমরা যাঁহার সহিত যথানিয়মে বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হই, তাঁহাকে অসঙ্কুচিত-চিত্তে অব্যাহতভাবে বিশ্বাস করা প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যখন আমরা তাঁহাকে নিতান্ত বিশ্বাস-ভাজন বিবেচনা করিয়া, তাহার সহিত সৌহৃদ্য-রূপ বিশুদ্ধ ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, তখন তাহার নিকট অকপটহৃদয়ে হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটন করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। রোমক-দেশীয় কোন নীতি-প্রদর্শক (সেনেকা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"তুমি যাঁহাকে আত্মবৎ বিশ্বাস না কর, তাঁহাকে যদি বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, তবে তুমি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত প্রভাব প্রতীতি করিতে সমর্থ হও নাই; তুমি যাঁহার প্রতি অনুরক্ত হও, তিনি তোমার হৃদয়-নিলয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত কি না, দীর্ঘকাল বিবেচনা করিবে। কিন্তু যখন বিচার করিয়া তাঁহাকে যথার্থরূপ উপযুক্ত বলিয়া স্থির করিবে, তখন তাঁহাকে অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে স্থান প্রদান করিবে।" বাস্তবিক মিত্র-সদৃশ প্রত্যয়-স্থল আর কেহই নাই। প্রকৃত মিত্রের অকপট হৃদয় বিশ্বাস-রূপ পরম পদার্থের জন্ম-ভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে। তাঁহার হস্তে ধন-প্রাণাদি সমুদায়ই বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করা যায়। কোন বিষয়ই তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার বিষয় নয়। যে বিষয় পিতার নিকট ব্যক্ত করিতে শঙ্কা উপস্থিত হয়, ভ্রাতার নিকট প্রকাশ করিতে সংশয় জন্মে, এবং ভার্য্যা-সমীপেও সময়-বিশেষে গোপন রাখিতে হয়, মিত্র-সন্নিধানে তাহা অসঙ্কুচিত-চিত্তে অক্লেশে ব্যক্ত করা যায়।

যে ব্যক্তি একান্ত প্রীতি-ভাজন ও নিতান্ত বিশ্বাস-পাত্র, তাঁহার কল্যাণ-সাধন-বিষয়ে সহজেই অনুরাগ হইয়া থাকে, এবং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তদর্থে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া

অবধারিত হয়; তাঁহার যদি কোন বিষয়ের অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে অপ্রতুল-পরিহারার্থ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যদি তিনি শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হন, তাহা হইলে প্রীতি-বচন ও স্নেহ-বিতরণ-দ্বারা সেই সন্তাপের শান্তি করিতে সযত্ন হওয়া উচিত। যদিও আমরা তাঁহার শোক-দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি করিতে সমর্থ না হই, তথাচ কিছু-না-কিছু শমতা করিতে পারি, তাহার সন্দেহ নাই। কখন কখন প্রণয়-পবিত্র প্রবোধ-বচন-দ্বারা তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করিয়া শোকের বিষয় কিয়ৎক্ষণ বিস্মৃত রাখিতে পারি। যদি তিনি নিরপরাধে লোকের নিকট নিন্দিত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ জানিয়া প্রবোধ দিতে ও তাঁহার মিথ্যাপবাদ-জনিত মানসিক গ্লানির শমতা করিতে সমর্থ হই, এবং জন-সন্নিধানে তদীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইতে পারি। তাঁহার উল্লিখিত-রূপ অশেষ প্রকার উপকার সম্পাদন করা, আমাদের উচিত কর্ম্ম। তাঁহার উপকার-সাধনে সযত্ন ও সমর্থ হওয়া, আমাদের সুখের কার্য্য ও সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বন্ধুর পাপাঙ্কুর উৎপাটন করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমরা তাঁহার যত প্রকার উপকার-সাধন করিতে পারি, তন্মধ্যে কোন প্রকারই উহার তুল্য কল্যাণকর নয়। মনুষ্যের পক্ষে কোন পদার্থ ধর্ম্ম অপেক্ষা হিতকারী নহে; অতএব হৃদয়াধিক প্রিয়তম সুহৃজ্জনের হৃতপ্রায় ধর্ম্মরত্ন উদ্ধার করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অন্য কোন প্রকারে তাঁহার অধিকতর উপকার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। যে সময় যাঁহাকে বন্ধুত্ব-পদে বরণ করা যায়, সেই সময়ে

তিনি যথার্থ সচ্চরিত্র থাকিলেও পরে অসচ্চরিত্র হওয়া অসম্ভব নহে। মনুষ্যের মন নিরন্তর একরূপ থাকা সহজ নয়; পুণ্য-পদবীতে ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবাৎ পদ-স্খলন হইয়া বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুজনের এতাদৃশ অকল্যাণকর বিড়ম্বনা ঘটিলে, তাঁহাকে পুণ্যপথে পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা কর্ত্তব্য। পাপাসক্ত ব্যক্তিকে হিত-বাক্য কহিলে, কি জানি সে বিপরীত ভাবিয়া রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়, এই বিবেচনায় অনেকে মিত্রগণের দোষসংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হন না*; কিন্তু তাঁহাদের এরূপ ব্যবহার উচিত নয়। পীড়িত ব্যক্তি কটু ও তিক্ত ঔষধ ভক্ষণ করিতে সম্মত না হইলেও তাহাকে ঐ সমুদায় রোগনাশক সামগ্রী সেবন করান যেমন অবশ্যই কর্ত্তব্য, অধর্ম্ম-স্বরূপ মানসিক রোগে রুগ্ন ব্যক্তিকেও উপদেশ-ঔষধ সেবন করান, সেইরূপ অবশ্যই কর্ত্তব্য ও পুণ্য কর্ম্ম। সে বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলে বন্ধুত্ব-ব্রত লঙ্ঘন করা হয়। তাঁহার সন্তোষ-সাধন ও রোগোৎপত্তি-নিবারণ উদ্দেশ্যে মৃদুবচনে সুমধুরভাবে উপদেশ দেওয়া বিধেয়। যদি তিনি বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে ও আমাদের উপদেশ-বাক্যের অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি আপনার অবলম্বিত অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন ও আমাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া সমধিক সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা তাঁহার ধর্ম্ম-রূপ অমূল্য রত্ন উদ্ধারার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া তিনি আমাদের প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, এবং প্রণয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা-রস মিলিত করিয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-ভাব প্রদর্শন করিবেন।

যাঁহারা সরলান্তঃকরণে প্রিয়-বচনে মিত্রগণের দোষোল্লেখ

করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হন, তাঁহারা প্রকৃত মিত্র-পদের বাচ্য নহেন। যাঁহারা কোন মিত্রের কু-প্রবৃত্তি-সমুদায় বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া তাঁহার রোষোৎপত্তির আশঙ্কায় বাক্যমাত্র ব্যয় করেন না, স্পষ্টবাদী শত্রুসকল তাঁহাদের অপেক্ষা হিতকারী সুহৃদ্ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। রোমক-রাজ্যের এক পণ্ডিত কহিয়া গিয়াছেন,—"অনেক ব্যক্তি প্রিয়ংবদ মিত্র অপেক্ষা বদ্ধবৈর শত্রু-সমীপে অধিক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।" কারণ, তাঁহারা উক্তরূপ শত্রুর নিকট সরল যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়াছেন, কিন্তু উক্তরূপ মিত্রগণের নিকট কস্মিন্‌কালে শুনেন নাই। তাঁহাদের বিরাগ ও অনুরাগ উভয়ই বিপরীত; কেন না, তাঁহারা অধর্ম্মে অনুরক্তি ও সদুপদেশ-গ্রহণে বিরক্তি প্রকাশ করেন। ধনাঢ্যদিগের মধ্যে অনেকেই, অথবা প্রায় সকলেই, উক্তরূপ মিত্র-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকেন। তাঁহারা আপনার তুষ্টিকর ভিন্ন অন্য বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং তাঁহারা যে সমস্ত পদানত বন্ধুকে বন্ধু-সম্বোধন করেন, তাহারাও তাঁহাদের সন্তোষ-জনক ব্যতীত অন্য বাক্য উল্লেখ করিতে সাহসী হয় না। ধনী মহাশয়েরা চতুর্দ্দিক্ হইতে আপন ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনিতেই ভালবাসেন এবং তদীয় আজ্ঞাবহ মিত্র মহাশয়েরা প্রতি বাক্যতেই তাঁহাদের সে বাসনা সুসিদ্ধ করিতে থাকেন। পূজ্য ও পূজক উভয় বন্ধুর মধ্যে এক জন পরিচারণা ও অন্য জন অর্থলাভমাত্র অভিলাষ করেন। তাঁহারা যদি পরস্পর মিত্রশব্দের বাচ্য হইতে পারেন, তবে ক্রীত দাস ও ক্রেতা স্বামীই বা সেই শব্দের প্রতিপাদ্য কেন না হইবে? অকপট-হৃদয়ে অকুণ্ঠিত-ভাবে সদুপদেশ প্রদান করা এবং সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক সেই উপদেশ গ্রহণ করা,

বন্ধুত্ব-গুণের প্রকৃত লক্ষণ। সে স্থলে যদি চাটুকারিতা-দোষ উপস্থিত হয়, তবে স্নে চাটুকারিতা যেমন অনিষ্টকর হইয়া উঠে, বিদ্বেষীদিগের সুস্পষ্ট বিদ্বেষ-বচন কদাচ সেইরূপ অনিষ্টকর নয়।

তৃতীয়তঃ, কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে, সে সময়ে কিরূপ আচরণ করিতে হয় এবং বদ্ধ হইবার পরেই বা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, এই দুই বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। এক্ষণে বন্ধুত্ব ঘটিত চরম ক্রিয়ার বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সংপাত্রে প্রণয় সংস্থাপন করিলে, কস্মিন্‌কালে সে প্রণয়ের বিচ্ছেদ হওয়া সম্ভব নয়। যাঁহারা পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নিয়মানুসারে পরস্পর বন্ধুত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের অন্তিম দশা উপস্থিত না হইলে, তদীয় বন্ধুত্বেরও অন্তিম দশা উপস্থিত হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, মিত্র-পরিগ্রহ-সময়ে যিনি যত বিবেচনা করুন না কেন ও যত সাবধান হউন না কেন, লক্ষণাক্রান্ত সুজন মিত্র নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সুকঠিন কর্ম্ম। অবনী-মণ্ডলে জ্ঞান-পবিত্র সুচরিত্র মিত্র-সদৃশ সুদুর্লভ পদার্থ আর কিছুই নাই। আমরা এক সময়ে যাঁহাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্ক জানিয়া সুহৃদ্‌ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, অন্য সময়ে তাঁহার এমন কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার আর পথ থাকে না। যদিও তিনি কোন গুরুতর দৃষ্টদোষে দূষিত না হন, তথাচ এরূপ সন্দিগ্ধ, সারল্য-হীন ও কোপন-স্বভাব হইতে পারেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হওয়া একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব যাঁহারা পরস্পরের গুণাগুণ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া বন্ধুত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হন,

কোন-না-কোন কালে তাঁহাদের সেই বন্ধন একেবারে ছিন্ন হওয়া সম্ভব। যদিও ভাগ্য-দোষ-বশতঃ এতাদৃশ নিদারুণ ঘটনা নিতান্তই ঘটিয়া উঠে, তথাচ তাঁহাদিগের বন্ধুত্ব-ঘটিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধনের সমাপ্তি হয় না। আমরা জন্মাবধি কস্মিন্‌কালে যাহার মুখাবলোকন করি নাই, আর যাহার সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া পুলকিত-চিত্তে কিয়ৎকাল অতিপাত করিয়াছি, সেই উভয়ই আমাদের সমান যত্নের পাত্র বা সমান অবজ্ঞার বিষয় বলিয়া কখনই গণ্য হইতে পারে না। যদিও ঐ শেষোক্ত সুহৃদ্ মহাশয় আমাদের সহিত নিতান্ত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিয়া আমাদের অনুরাগ-লাভের একান্তই অযোগ্য হন, তথাচ তিনি সদ্ভাবের সময়ে বিশ্বাস করিয়া আমাদিগকে যে কোন গোপনীয় বিষয় অবগত করিয়াছিলেন, সেই সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও তাহা কদাচ ব্যক্ত করা উচিত নয়। যে সময়ে কাহারও সহিত সৌহৃদ্য থাকে, সে সময়ে তিনি আপনার মনের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া আমাদের নিকট এতাদৃশ গুহ্য বিষয় প্রকাশ করিতে পারেন যে, তাহা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি তাহার উক্তরূপ অনর্থের অথবা কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা নাও থাকে, তথাচ যখন আমরা তাঁহার নিকট স্বীকার করিয়াছি— অমুক বিষয় অপ্রকাশ রাখিব, তখন তাহা প্রাণসত্ত্বে প্রকাশ করা বিধেয় নয়। যদি তাঁহার সমীপে উক্তরূপ বাচনিক অঙ্গীকার নাই করিয়া থাকি, তথাচ যাঁহার সহিত প্রণয়-পাশে বদ্ধ থাকিতে হয়, তাঁহার নিকট উক্তরূপ অঙ্গীকার করা প্রথমাবধিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বন্ধুজনের গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করা বিহিত নয়, ইহা বন্ধুত্ব-বিষয়ক এক প্রধান নিয়ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব

তিনি সদ্ভাব-সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া সংগোপনে যে বিষয় আমাদিগকে অবগত করিয়াছেন, সদ্ভাবের অসদ্ভাব হইলেও তাহা চিরকালই হৃদয়-মধ্যে যত্নপূর্ব্বক নিহিত রাখা বিধেয়।

প্রায় সকল বিধিরই স্থল-বিশেষে সঙ্কোচ করিতে হয়। সৌহৃদ্যের বিভেদ হইলেও সুহৃজ্জনের গুহ্য বিষয় প্রকাশ করা নিতান্ত নিষিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি স্থলে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। যদি তিনি দ্বেষ-পরবশ হইয়া মিথ্যাপবাদ দিয়া আমাদের নির্দ্দোষ চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, আর তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত কোন গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত না করিলে, সে দোষে উদ্ধার পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে, সে বিষয় প্রকাশ করা কদাচ অবৈধ বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। তিনি যখন অনর্থক অপবাদ দিয়া আমাদের অকলঙ্কিত চরিত্রকে কলঙ্কিতবৎ প্রতীয়মান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বলিতে হইবে, আমরা যে তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিব, তিনি আর এরূপ প্রত্যাশা করেন না।

এতাদৃশ সুহৃদ্ভেদ সমধিক যন্ত্রণার বিষয়। কিন্তু অনেকের বন্ধুত্ব ইহা অপেক্ষাও স্থায়ী ও সুখকর হইয়া থাকে। জীবনান্ত-ব্যতিরেকে তাঁহাদের সৌহৃদ্য-ভাবের অন্ত হয় না। সুহৃদ্ভাগ্যশালী উভয় মিত্রের মধ্যে এক জন যদি দুর্ব্বিপাক-বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে, অন্য জন তখনও একেবারে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না; এবং নিষ্কৃতি পাইতে বাসনাও করেন না। তিনি মিত্রের শোকে বিমুগ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিলেও সে জলে তাঁহার হৃদয়-স্থিত প্রীতির চিহ্ন প্রক্ষালিত হয় না। তিনি বন্ধুর

দেহ দীপ্ত চিতায় দগ্ধ হইতে দেখিলেও সে বন্ধুর কথনোন্মুখ মনোহর মূর্ত্তি তাঁহার চিত্তপথ হইতে অপনীত হয় না। তিনি অতি দুঃসহ শোক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণের প্রেমের অঙ্কুর কদাচ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয় না। বন্ধুর মান, বন্ধুর যশ ও বন্ধুর পরিজন তখন তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ অধিকার করিয়া থাকে। তিনি মৃত বন্ধুর পরিবার ও দেশান্তরনিবাসী অজ্ঞাত-কুল-শীল ব্যক্তির পরিবার, এই উভয়ের প্রতি কদাচ সমান ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি অপরিচিত ব্যক্তির দুরবস্থার বিষয় শুনিয়া যেমন উদাসীন থাকেন, মৃত বন্ধুর সন্তানের বিপৎ-পতনের সমাচার শুনিয়া সেরূপ উদাসীন থাকিতে কদাচ সমর্থ হন না। মৃত বন্ধুকে স্মরণ রাখা, তাঁহার সদ্‌গুণ-সমূহ কীর্ত্তন করিয়া তদীয় যশঃ-শশধর বিমল রাখিতে চেষ্টা পাওয়া এবং তাঁহার পরিজনবর্গের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাহাদের প্রতি সৌজন্য ও করুণা-ভাব প্রকাশ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

সীতার বনবাস—অশ্বমেধ যজ্ঞ

রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি, অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া যে যে বিষয় অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধমাত্র অবশিষ্ট আছে, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলেই আপনার রাজ্যাধিকার আর কোন অংশে হীন থাকে না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব। যাহা হউক, মহারাজ যখন স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদযুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে; অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের অনুমতি প্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবামাত্র, রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎসগণ! ইনি যাহা কহিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন। তখন রাম কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ-

দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদিগের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনার কি অনুমতি হয়? বশিষ্ঠদেব তদ্বিষয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অনুজদিগকে কহিলেন, দেখ অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে; অতএব তোমরা সত্বর সমুদয় আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগকে নিমন্ত্রণ কর; সময়-নির্দ্ধারণ-পূর্ব্বক যাবতীয় নগরে ও জনপদে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাও; লঙ্কাসমর-সহায় সুহৃদ্‌বর্গকে পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্য অকাতরে কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। তদ্ব্যতিরিক্ত, যাবতীয় ঋষিদিগকেও নিমন্ত্রণ কর; তাঁহারা যজ্ঞদর্শনে আগমন করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গমন করিয়া যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করিয়া সত্বর তথায় প্রেরণ কর। দেখ, যজ্ঞদর্শনের নিমিত্ত নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক; অতএব যত্নপূর্ব্বক যাবতীয় বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোন বিষয়ের অসঙ্গতি-নিবন্ধন কাহারও কোন ক্লেশ বা অসুবিধা ঘটে না। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী, তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়েরই একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম কহিলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে অসঙ্গতি আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা কহেন সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি উপায় ভাবিয়া রাখিয়াছেন? শ্রবণমাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রু-জলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, নয়নে অশ্রু মার্জ্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধমাত্র হয় নাই; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব অনেকক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ভার্য্যান্তরপরিগ্রহ-ব্যতিরেকে উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই এক কালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ, লোকবিরাগ-সংগ্রহ-ভয়ে সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া জীবন্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সীতার মোহন মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যানুরোধে ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব দার-পরিগ্রহ-বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম

তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শন করিয়া মৌনভাবে অবনত-বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি-সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠান করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিষে প্রস্থান করিলেন, এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমি নিরূপণ করিয়া অনুরূপ অন্তরে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে এক এক শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, তাহাদের অবস্থোচিত বাসশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইলেন। লক্ষ্মণও অনতিবিলম্বে অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যাসনাদি সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া, যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্ব মোচন-পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ-সমভিব্যাহারে সসৈন্যে নৈমিষারণ্যে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। শত শত নৃপতি বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ-সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি যজ্ঞদর্শনমানসে, ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিলেন; বিভীষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; সুগ্রীব অপরাপর যাবতীয় নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এদিকে মহর্ষি বাল্মীকি সীতার অবস্থা অবলোকন করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে

সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না ; আর কুশ ও লব রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনক্রমে উচিত নহে ; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব যাহাতে সপুত্রা সীতা অবিলম্বে রামচন্দ্র-পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। অথবা, উপায়ান্তর-উদ্ভাবনে প্রয়োজন কি ? শিষ্য-দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাই, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহ প্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া মহর্ষি পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয় ; কেবল লোকবিরাগ-সংগ্রহ-ভয়ে পূর্ণগর্ভ অবস্থায়, নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এখন আমার কথায়, তাঁহারে সহজে গ্রহণ করিবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। যাহা হউক, কোন সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তরকালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক। এই সময়ে পিতৃসমীপে নীত হইয়া, নীতিশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিধিপূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে ইহারা রাজকার্য্য-নির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদা-রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র আমাকে কোশলরাজ্যের হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব এ বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ

প্রেরণ করা উচিত। অথবা, একেবারেই তাঁহার নিকট সংবাদ না পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

একদিন মহর্ষি সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধি সমাধান করিয়া আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত অশ্বমেধ-নিমন্ত্রণ-পত্র তদীয় হস্তে সমর্পণ করিল। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া, পরম-প্রীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত বিদায় দিলেন, এবং শিষ্যদিগকে তাহার আহারাদির সমবধানে আদেশ প্রদান করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তৎসিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। রামের ও ইহাদের আকারগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে ইহাদিগকে রামের তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, আর অবলোকনমাত্র রামেরও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক; এবং তাহা হইলেই আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যূষে প্রস্থান করিব, মানস করিয়াছি; অপরাপর শিষ্যের ন্যায় তোমার পুত্রদ্বয়কেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি আত্মকুটীরে প্রতিগমন করিয়া,

শিষ্যদিগকে আহ্বান-পূর্ব্বক প্রস্তুত হইয়া থাকিতে কহিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত তোমরা জনপদের কোন ব্যাপার অবলোকন কর নাই; রামায়ণ-নায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবে, এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া তোমরা অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে রামায়ণে রামের অলৌকিক কীর্ত্তি পাঠ করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া তাহাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞানুষ্ঠান-সংক্রান্ত সমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম অবলোকন করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকিমুখে রামের নাম শ্রবণ করিয়া সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। রাম সীতাগত-প্রাণ বলিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই রাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানবার্ত্তা-শ্রবণে-রাম অবশ্যই ভার্য্যান্তর পরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া তিনি একেবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ

সহ্য করিয়াছিলেন, রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই শোক সেই সীতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সেই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব সহসা তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, মা! মহর্ষি কহিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের অশ্বমেধদর্শনে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়াছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহার নিকটে গিয়া রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড! কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ়ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনানুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞানুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক? সে কহিল, যজ্ঞসমাধানার্থ বশিষ্ঠদেব রাজাকে পুনরায় দারপরিগ্রহের জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে কোন ক্রমেই সম্মত হন নাই। হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেক।

দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনকালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম্ম-প্রতিপালনে যেমন তৎপর, দাম্পত্যধর্ম্ম-প্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাস-গ্রন্থে অনেকানেক রাজার ও অনেকানেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি, কিন্তু কেহই কোন অংশে রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনানুরোধে প্রেয়সী-পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহে যাবজ্জীবন ভার্য্যান্তরপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পাঠ করিয়া অবধি আমাদের একান্ত বাসনা ছিল, একবার রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিব; এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ করিবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে; অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতি প্রদান করিলেন, তাহারাও দুই সহোদরে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া মহর্ষি-সমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিবার যে অতি বিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্বশরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল এবং নির্ব্বাসনক্ষোভ তিরোহিত হইয়া তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষে প্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণ সময়ে তথায় উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব পরম সমাদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন।

কুশ ও লব দূর হইতে রাম দর্শন করিয়া পুলকিত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে; দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের একাধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনই গম্ভীরাকৃতি। আমাদের গুরুদেব যেরূপ অলৌকিক কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনই অলৌকিক গুণসমুদয়-সম্পন্ন। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, ভগবৎপ্রণীত মহাকাব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতেই মহর্ষির অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমাদের নয়নের চরিতার্থতা লাভ হইল।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে নিরূপিত দিবসে মহাসমারোহে সংকল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল; অসংখ্য অসংখ্য দীন দরিদ্র অনাথগণ পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্নলাভ, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থলাভ, ভূমিকাঙ্ক্ষী অভিলষিত ভূমিলাভ করিতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমনমাত্র তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত বাদ্যক্রিয়া হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশভূষা ধারণ করিল। সকলেরই মুখে আমোদ ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল; কাহারও অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখ বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি বা অন্যাদৃশ

লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন এরূপ যজ্ঞ দর্শন করি নাই ; অতীতবেদী ব্যক্তিরাও কহিতে লাগিলেন, কোন কালে কোন রাজা ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ-সহকারে যজ্ঞ করিতে পারেন নাই, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এইরূপে প্রত্যহ মহাসমারোহে যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল, এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহ দর্শন করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

জাতীয় ভাব

কয়েক বৎসর হইল, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটী ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারানো জিনিসটীর অনুসন্ধান নয়?

তিনি। কথাটী বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে। ও-কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা খুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্যরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। অন্য কোন্ দ্রব্যের জন্য অথবা অন্য কোন্ প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন, তাহা বলুন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা খুঁজিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর, যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহা যে পূর্ব্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও-জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে মনে করিলেই উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।

তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়র্লণ্ড দ্বীপ—আমার পিতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডাব্লিন নগরে একটী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ১৮৪৮ অব্দে সমুদয় ইউরোপ-ব্যাপক যে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েকজন সমাধ্যায়ীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ঐ উপদ্রব শান্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটী, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিশ জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মুখ ভারতবর্ষীয় ভাব ব্রিটিশ জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয়।

আমি। আপনার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটী তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, আপনি আমাদিগের মনের ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একেবারে ইংরাজের জিনিস হইয়া

যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবেন না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না,—অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না। আপনাদের মনে যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি আপনারা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসেন। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজকর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম-সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীন থাকিয়া যদি চাকুরি করিতে হয়, তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম-সহকারে নির্ব্বাহ করি; আর সন্তান-সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান্ এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণ যত্ন করি।

তিনি। ঐগুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। স্বজাতিবৎসল না হইলে কেহ স্বদেশবৎসল হইতে পারেন না। ঐ সকল কাজে জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনীতিক বিষয়ে বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা—পুস্তিকা বিরচন করা, এই সকল কার্য্যের প্রতি তুমি কি আস্থাশূন্য ?

আমি। ও-সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে; তবে ও-গুলির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়া মনে করি, আমার আস্থা বোধ হয় তত অধিক নয়। ও-গুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন

অনুচিকীর্ষা-প্রসূত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটী দৃষ্টান্ত-দ্বারা দেখাইতেছি, বক্তৃতাদি-দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটী সফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কব্‌ডেন সাহেব সভা-সংস্থাপন, প্রকাশ্যে বক্তৃতা-প্রদান, এবং পুস্তিকার-চনাদি করাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাঁহার মতানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা, অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ—আবার তাহাতে একটী দুর্ভিক্ষের সমাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি কব্‌ডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনের কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী একটী বিফল আন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এই আন্দোলনের কর্ত্তা কব্‌ডেনের অপেক্ষাও শতগুণে শ্রেষ্ঠ—বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়র্লণ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন, চারি দিন, দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিত; তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই কাথলিক যাজকগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত ও লইয়া যাইত। তাঁহার অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের একাধিপতি-স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত

রাজনীতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম থামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন—তিনি জেলে গেলেন—কয়েক বর্ষ সেইখানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি, স্থৈর্য্য. গাম্ভীর্য্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পররাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি। ওকোনেল নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান যদি তেমনি কার্য্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়র্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত।

এই কথাগুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা-সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটা অপনীত হয় নাই। সেই যৌবনাবস্থার —সেই ৪৮ অব্দের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সেকাল আর একাল

অদ্যকার বক্তৃতার বিষয় "সেকাল আর একাল।" ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকালেজ এই মহানগরে সংস্থাপিত হয়। ১৮৩০ সালে ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম ফল ফলে। ঐ বৎসরে কতকগুলি যুবক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা সেই সময়ে ইউরোপীয় বিদ্যার আলোক লাভ করিয়া সমাজসংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই সময়ে একটি নূতন ভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয়। ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে সময়, তাহা "সেকাল" এবং তাহার পরের কাল "একাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।

সেকালের বিষয় বলিতে হইলে সেকালের সাহেবদের বিষয় অগ্রে বলিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বাঙ্গালীদের বিষয়ে বলিতে গিয়া সাহেবদের কথা প্রথমে বলা হয় কেন? তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। সাহেবেরা আমাদিগের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহেবদের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা জন্য, সেকালের সাহেবেরা কি প্রকৃতির লোক ছিলেন ও সেকালের বাঙ্গালীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা না জানিলে সেকালের বাঙ্গালীদের অবস্থা ভাল জানা যাইতে পারে না, অতএব সেকালের সাহেবদিগের বর্ণনা সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা আমাদিগের

রাজা। রাজার সম্মান অগ্রে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। সেকালে সাহেবেরা অর্দ্ধেক হিন্দু ছিলেন। পূর্ব্বে মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষকে আপনাদের গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের অনুরাগ এইখানেই বদ্ধ থাকিত। ইংরাজের আমলের প্রথম সাহেবেরা অনেক পরিমাণে ঐরূপ ছিলেন। তাহার এক কারণ এই, তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন; সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা অনেক পরিমাণে এ দেশীয়দের আচার-ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবেরা পান খেতেন, আল্‌বোলা ফুঁক্‌তেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেল্‌তেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন; হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবেরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। তিনি প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথমে কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা-দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও গবর্নর জেনেরল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের

যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া, কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করিতেন। এখন সে কাল গিয়াছে। এখনকার সাহেবদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইঁহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি ইঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই। অবশ্য অনেক সদাশয় ইংরাজ আছেন, যাঁহারা এই কথার ব্যভিচারস্থল-স্বরূপ। কিন্তু আমি যেরূপ বর্ণনা করিলাম, এরূপ সাহেবই অধিক। পূর্ব্বে যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষেরা এখানে আসিয়া এদেশের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের নাম এদেশীয়দের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কোন উদ্ভট-কবিতাকার হিন্দুদিগের প্রাতঃস্মরণীয় স্ত্রীলোকদিগের নাম যে শ্লোকে উল্লিখিত আছে, তাহার পরিবর্ত্তে সেকালের কতিপয় ইংরাজ মহাত্মার নাম উল্লেখ করিয়া একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আদর্শ ও নকল দুইটি শ্লোকই নিম্নে লিখিত হইল।

আদর্শ

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

নকল

হেয়ার্ কম্বিন্ পামরশ্চ কেরি মার্শমেনস্তথা।
পঞ্চ গোরাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥

এই সকল মহাপুরুষদিগের বিষয় মহাশয়েরা অনেকেই অবগত আছেন। ডেবিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ীর ব্যবসায়-দ্বারা লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্বদেশ স্কট্‌লণ্ডে ফিরিয়া না গিয়া সেই সমস্ত অর্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতসাধনে ব্যয় করিয়া পরিশেষে দরিদ্রদশায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার-স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু-কালেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আমি তাহার একজন ছাত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ঔষধ হস্তে লইয়া পীড়িত বালকের শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, অথবা যেখানে যাত্রা হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া অভিনেতা বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতেছেন। কম্বিন্ সাহেব এই কলিকাতা নগরের একজন প্রধান সওদাগর ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরোপকারী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্নর হইয়াছিলেন। তিনি সিপাইদের বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। তিনিও একজন অতি দয়াশীল ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। এতদ্দেশীয়দের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ স্নেহ ছিল। জন পামরকে লোকে "Prince of Merchants" অর্থাৎ সওদাগরদের রাজা

বলিয়া ডাকিত। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গোরের উপরে "Here lies John Palmer, Friend of the Poor."—"এখানে দরিদ্র-জন-বন্ধু জন পামর আছেন," কেবল এই বাক্যটি লিখিত হইয়াছিল। কেরি ও মার্শমেন সাহেব খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীরামপুরে বাস করিতেন। তাঁহারা বাঙ্গালা অভিধান, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও উন্নত প্রণালীর বাঙ্গালা পাঠ-শালার স্থষ্টিকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারা অনেক প্রকারে বঙ্গদেশের মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেকালের এই সকল মহান্তঃকরণ সাহেবেরা চিরকাল বাঙ্গালীদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

অতঃপর সেকালের বাঙ্গালীদের বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হই-তেছি। সেকালের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদিগের বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের দৃষ্টি গুরুমহাশয়ের উপর প্রথম পতিত হয়। গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত ছিল না এবং তাঁহাদের অবলম্বিত ছাত্রদিগের দণ্ডের বিধানটি বড় কঠোর ছিল। নাড়ুগোপাল অর্থাৎ হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া হাতে প্রকাণ্ড ইষ্টক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখানো, বিছুটি গায়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার নির্দ্দয় দণ্ড-প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তালপাতে; তার-পর পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কলার পাতে; তারপর কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কাগজে লেখা হইত। সামান্য অঙ্ক কষিতে, সামান্য পত্র লিখিতে আর গুরুদক্ষিণা ও দাতাকর্ণ নামক পুস্তক পড়িতে সমর্থ করা, গুরুমহাশয়দিগের শিক্ষার শেষ সীমা ছিল। গুরুমহাশয় অতি ভীষণ পদার্থ ছিলেন। আমার স্মরণ হয়,

আমি যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ করিতাম, তখন রামনারায়ণ নামে আমার একজন সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি কোন দোষ করিলে, গুরুমহাশয় যখন 'রামনারায়ণ' বলিয়া ডাকিতেন, তখন তাঁহার ভয়সূচক একটি শারীরিক ক্রিয়া হইত!

গুরুমহাশয়ের পর আখন্‌জীর বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আখন্‌জী অতি অদ্ভুত পদার্থ ছিলেন। মনে করুন হিন্দুর বাটীর একটি ঘরে মুসলমানের বাসা। তিনি তথায় বৃহদাকার বদ্‌না ও স্তূপাকার পেঁয়াজ লইয়া বসিয়া আছেন; সাগ্‌রেদ্‌রা নিয়ত-বশবর্ত্তী। চাকর-দ্বারা জল আনয়ন কার্য্য করিয়া লওয়া আখন্‌জীর মনঃপূত হইত না। তাঁহার সাগ্‌রেদ্‌দিগকে কলসী লইয়া জল আনিয়া দিতে হইত। তখন পারশী পড়ার বড় ধূম। তখন পারশী পড়াই এতদ্দেশীয়দিগের উচ্চতম শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই পারশী ভাষা সকল আদালতে চলিত ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার ব্যবহার আদালতে রহিত হয়। পন্দ্-নামা, গোলেস্তা, বোস্তা, জেলেখা, আল্লামী প্রভৃতি পুস্তক সাধারণ পাঠ্য পুস্তক ছিল। কেহ কেহ আরবী ব্যাকরণ একটু একটু পাঠ করিতেন। আখন্‌জীরা পারশীর উচ্চারণ অতি বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের ভট্টাচার্য্যগণ আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হইতেছেন। তখনকার ভট্টাচার্য্যগণ অতি সরলস্বভাব ছিলেন। এখনকার ভট্টাচার্য্যগণ যেমন বিষয়বুদ্ধিতে বিষয়ী লোকের ঘাড়ে যান, সেকালের ভট্টাচার্য্যেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রগাঢ়রূপে জানিতেন এবং অতি

সরল ও সদাশয় ছিলেন। সেকালের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী রামনাথ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপের নিকটস্থ একটি গ্রামে বাস করিতেন। তিনি রাজ-সভাবিচরণকারী চাটুকার ভট্টাচার্য্যদিগের ন্যায় সভ্যতার নিয়ম পরিজ্ঞাত ছিলেন না। এই জন্য লোকে তাঁহাকে বুনো রামনাথ বলিয়া ডাকিত। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অমাত্য-সমভি-ব্যাহারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু তাঁহার কি প্রয়োজন তাহা জানিতে হইবে, এ জন্য ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অনুপপত্তি আছে?" এখন, ন্যায়শাস্ত্রে অনুপপত্তির অর্থ, যাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় না। ভট্টাচার্য্য তাহাই বুঝিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "কৈ না, আমার কিছুই অনুপপত্তি নাই।" রাজা তাহা বুঝিতে পারিয়া অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কিছু অসঙ্গতি আছে?" এখন, অসঙ্গতি শব্দের ন্যায়শাস্ত্রোল্লিখিত অর্থ অসমন্বয়। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "না, কিছুই অসঙ্গতি নাই, সকলই সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" রাজা দেখিলেন, মহা মুস্কিল। তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাংসারিক বিষয়ে আপনার কোন অনটন আছে?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "না, কিছুই অনটন নাই; আমার কয়েক বিঘা ভূমি আছে, তাহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়, আর সম্মুখে এই তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, ইহার পত্র আমার গৃহিণী দিব্য পাক করেন, অতি সুন্দর লাগে, আমি স্বচ্ছন্দে তাহা দিয়া অন্ন আহার করি।"

আমি আশ্চর্য্য বোধ করি যে, এমন সরল সাধু সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিকে লোকে বুনো বলিত। ইনি যদি বুনো, তবে সভ্য কে? আর এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী ডাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন। এ দিকে ডাইল উথলিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, বিষম বিপদ্! ডাইল উথলিয়া পড়া কি প্রকারে নিবারণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হাতে পইতা জড়াইয়া পতনোন্মুখ ডাইলের অব্যবহিত উপরিস্থ শূন্যে তাহা স্থাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও তাহা নিবারিত হইল না। এমন সময় তাঁহার ব্রাহ্মণী পুষ্করিণী হইতে ফিরিয়া আইলেন। তিনি কহিলেন, "এ কি! ইহাতে একটু তেল ফেলিয়া দিতে পার নাই?" এই বলিয়া তিনি ডাইলে একটু তেল ফেলিয়া দিলেন। ডাইলের উথলিয়া পড়া নিবারিত হইল। এই ব্যাপার দেখিয়া ভট্টাচার্য্য গললগ্নবাস হইয়া করযোড়ে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা, বল; অবশ্য কোন দেবী হইবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রকারে সাধন করিতে পারিলে?" যদ্যপি এই গল্পে বাহুল্য-বর্ণনার সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উহা যে সেকালের ভট্টাচার্য্যদিগের অসামান্য সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

ভট্টাচার্য্যদিগের অবৈষয়িকতার আর একটি সুন্দর গল্প আছে। এক জন ভট্টাচার্য্য পুঁথি পড়িতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে অনেক রাত্রি হইলে তাঁহার তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একখানি টীকা লইয়া বাটীর

বাহির হইলেন। দেখিলেন দূরে একটা পাঁজা পুড়িতেছে। তিনি আস্তে আস্তে সেই স্থানে টাকা ধরাইতে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘরে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর সেকালের রাজকর্ম্মচারীদিগের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। ইংরাজের আমলের প্রথমে আমলাদিগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এক এক জন আমলার উপর অনেক কর্ম্মের ভার থাকিত। তাঁহারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এক এক জন দেওয়ান বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরের এক জন দেওয়ানের কথা এইরূপ শুনা যায়, তিনি আহারের সময় একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাইয়া দিতেন, নগরের সমুদায় বাসাড়ে লোক সেই ঘণ্টার রব শুনিয়া তাঁহার বাসায় আসিয়া আহার করিত। তখন ঐ সকল পদ এক প্রকার বংশপরম্পরাগত ছিল। এক জন দেওয়ানের মৃত্যু হইলে প্রায়ই তাঁহার সন্তান অথবা অন্য কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় লোক দেওয়ান হইত। শুনা আছে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামবাসী এক দেওয়ানের মৃত্যুর পর তাঁহার সপ্তদশ-বৎসর-বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাণের মাকড়ী ও হাতের বালা খুলিয়া দেওয়ানী করিতে গেলেন। সাহেবেরা তাঁহাদিগের দেওয়ানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সময়ে উৎকোচ লইবার বাড়াবাড়ি ছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালীরা যে উৎকোচ লইতেন এমন নহে, বড় বড় সাহেবেরাও উৎকোচ লইতেন। এখন সেরূপ নহে। এ বিষয়ে অবশ্যই উন্নতি দেখিতেছি।

পরিশেষে সেকালের ধনী লোকদিগের বর্ণনা করা হইতেছে। ইহারা অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। পুষ্করিণী-খননাদি পূর্ত্তকর্ম্মে তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসী ও দরিদ্রদিগকে বিলক্ষণ দান করিতেন। তাঁহারা অতিথিসেবায় তৎপর ছিলেন। তাঁহারা গুণী লোকদিগকে বিলক্ষণরূপে পালন করিতেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ গায়কদিগকে বিশিষ্ট অর্থানুকূল্য করিতেন। কোন কোন স্থলে উপযুক্ত পাত্রে তাঁহাদিগের দানশীলতা প্রযোজিত হইত না বটে, কিন্তু তাঁহারা যে অত্যন্ত বদান্য ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

রাজনারায়ণ বসু।

একা

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

"কে গায় ওই ?"

বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন ? এই সঙ্গীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ তাহার কণ্ঠ মধুর ;— মধুর কণ্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলী-স্পর্শের ন্যায় ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করে কেন ?

কেন কে বলিবে ? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী—নদী-সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীলবসনের ন্যায় শীর্ণশরীরা নীলসলিলা তরঙ্গিণী সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন ; রাজপথে কেবল আনন্দ—বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ—তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা—তাই এই সঙ্গীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরীমধ্যে, এই আনন্দময় অনন্ত

জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতো-মধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ-তাড়িত জলবুদ্‌বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্‌বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র, আমি বারিবিন্দু, এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না—কেবল ইহাই জানি যে আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণ-গ্রহণ-কর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্যও ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেকমাত্র শ্রুত ঐ সঙ্গীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সঙ্গীত শুনি নাই—অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রারোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্য-মুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্যচরিত্র এখনও তাই আছে, কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দ হইত, আজি এই সঙ্গীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে, সেই আনন্দ অনুভব করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত-জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া মনে মনে সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণ-সঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন

বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য-হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল—তাই এ সঙ্গীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সঙ্গীত ভাল লাগিত—এখন লাগে না—চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবন-সুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ-কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্ত-পবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসার-চক্রে আরোহণ করিয়া যেখানকার, আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে

হইবে ; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই, এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে, মনুষ্যহৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।

কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয়বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকণ্ঠজাত সঙ্গীত, তেমনি সংসারের এক সঙ্গীত আছে, সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত বড়ই আকুল। সে সঙ্গীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনি-সম্মিলিত, বহুকণ্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নাই—সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্তসহায় একমাত্র-গীতি-ধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে

সর্ব্বব্যাপিনী—প্রীতিই ঈশ্বর। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত-সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



আমার দুর্গোৎসব

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা? কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত-

রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না;—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণপ্রহারিণী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম,—ডাকিলাম, সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি-প্রীতি-বৃত্তি-শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি, নব-বলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্ক-শোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব,

মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম,—উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে! এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

উঠ উঠ মা! উঠ বঙ্গজননি! মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এসো ভাইসকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাপ দিই! এসো আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এসো, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্র মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধূম বাধিবে। দ্বেষক-ছাগকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া সৎকীর্ত্তি-খড়্গে

মায়ের কাছে বলি দিব—কত পুরাবৃত্তকার-ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে—কত ঢোল, কাঁসি, কাড়ানাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে, "কত নাচ গো!"—বড় পূজার ধূম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি-মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতৃড়া মারিবে—কত দেশ-বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে—কত দীন-দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে! কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্ত ডাকিবে, মা! মা! মা!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ললিতগিরি

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ-শোভিত ধান্য বা হারিৎক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মার কোলে উঠিলে মাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি (বর্ত্তমান আল্‌তিগিরি) বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি (বর্ত্তমান নাল্‌তিগিরি) বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধ মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুইচারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত! হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডষ্ট্রীয়ল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্‌ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র—মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটী! তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষ-শ্রেণী সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ,—সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে! তা যাক—চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি-সকল যে খোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিত-চেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপ-প্রেমগর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীরাম্বরা, তরলিত-রত্নাহারা—

> "তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ…"

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল।

তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল,

বেদান্ত, বৈশেষিক ; এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই! ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে ক্ষোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারি দিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে ক্ষোদিত নরমূর্ত্তিসকল শোভা করিত। তাহারই দুইচারিটি আজও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে, রং জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যুষে ধ্যানভঙ্গ হইলে গঙ্গাধর স্বামী গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন; শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখনও কোন কথা কহিলেন না। তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যাসিনী। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে; উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দীতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।"

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা-নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্ম-শক, দিন, বার,

তিথি, দণ্ড, পল, সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্ম-কুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্র-লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া দ্বাদশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন। পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র—তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ, এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন; বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথায় যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তম-দর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকটে আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গৌড়েশ্বর

অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরের বেদীর উপরে রত্নপ্রবাল-বিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবাল-মণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান রাজা বসিয়া আছেন। শির উপরি কনক-কিঙ্কিণী-সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শুভ্রচন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে পৃথগাসনে হোমাবশেষ-বিভূষিত অনিন্দ্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভা-পণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্য দিকে মহামাত্য ধর্ম্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাসামন্ত, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্ষত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডরিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্ত্রে সভার অসাবধানতা রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয়-পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্য্যসকল সমাপ্ত হইলে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। তখন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, "মহারাজ! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতিবিশারদ, এক্ষণে ভূমণ্ডলের যত রাজগণ আছেন, সর্ব্বাপেক্ষা বহুদর্শী; প্রজাপালক; আপনি আজন্ম রাজা। আপনার অবিদিত নাই যে, শত্রুদমন রাজার প্রধান কর্ম্ম। আপনি প্রবল শত্রুদমনের কি উপায় করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "কি আজ্ঞা করিয়াছেন?" সকল কথা বর্ষীয়ান্ রাজার শ্রুতিসুলভ হয় নাই।

মাধবাচার্য্যের পুনরুক্তির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্ম্মাধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন যে, রাজশত্রু দমনের কি উপায় হইয়াছে? বঙ্গেশ্বরের কোন্ শত্রু এ পর্য্যন্ত দমিত হয় নাই, তাহা এখনও আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি সবিশেষ বাচন করুন।"

মাধবাচার্য্য অল্প হাস্য করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! তুরকীয়েরা আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিতেছেন। এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন?"

রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব—আমি কি করিব? আমার এ প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না!

আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক।"

এবম্ভূত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্য্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি ক্ষুব্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে, অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভাল, সভাপণ্ডিত মহাশয়! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতদুক্তি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন?"

দামোদর কহিলেন, "বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—"

মাধবাচার্য্য। যথা থাকুক—বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অনুমতি করুন; দেখান, এরূপ উক্তি কোথায় আছে।

দামোদর। আমি কি এতই ভ্রান্ত হইলাম? ভাল, স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, মনুতে এ কথা আছে কি না?

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানব ধর্ম্মশাস্ত্রেও কি পারদর্শী নহেন?

দামো। কি জ্বালা! আপনি আমাকে বিহ্বল করিয়া তুলিলেন। আপনার সম্মুখে সরস্বতী বিমনা হয়েন, আমি কোন্ ছার! আপনার সম্মুখে গ্রন্থের নাম স্মরণ হইবে না, কিন্তু কবিতাটা শ্রবণ করুন।

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত যে অনুষ্টুভ্ ছন্দে একটি কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—তুরকজাতীয় কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "আপনি কি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আপনি যদি পারেন, তবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন।"

সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদ কহিলেন, "আমি করিব। আত্মশ্লাঘা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। যে আত্মশ্লাঘাপরবশ সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "মূর্খ তিন জন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।"

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করিলেন।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "সাধু! সাধু! আপনার যেরূপ যশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীশ্বর আপনাকে কুশলী করুন। আমার কেবল এই জিজ্ঞাস্য যে, যদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইয়াছে?"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশ্য নহে, কিন্তু যে অশ্ব, পদাতি এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্য্যটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।"

মাধ। কতক কতক জানিয়াছি।

পশু। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন?

মাধ। প্রস্তাবের তাৎপর্য্য এই যে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এখানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচন্দ্রের বীর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন।

পশু। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি যে, তিনি মহাশয়ের শিষ্য। আপনি বলিতে পারিবেন যে, ঈদৃশ বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শক্রহস্তগত হইল কি প্রকারে

মাধ। যবনবিপ্লবের কালে যুবরাজ প্রবাসে ছিলেন। এইমাত্র কারণ।

পশু। তিনি কি এক্ষণে নবদ্বীপে আগমন করিয়াছেন?

মাধ। আসিয়াছেন। রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে আগমন করিতেছে শুনিয়া, এই দেশে তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া দস্যুর দণ্ডবিধান করিবেন। গৌড়রাজ তাঁহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া উভয়ের শক্রবিনাশের চেষ্টা করিলে উভয়ের মঙ্গল।

পশু। রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।

পরে রাজাজ্ঞায় সভাভঙ্গ হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা

উপনগরপ্রান্তে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিকা হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামর্শ-অনুসারে সুরম্য অট্টালিকায় আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দ্দন নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বয়োবাহুল্য-প্রযুক্ত এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের হানি-প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে অসমর্থ, অথচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছু দিন হইল, ইঁহাদিগের পর্ণকুটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি ইঁহারা আশ্রয়াভাবে এই বৃহৎ পুরীর একপার্শ্বে রাজপুরুষদিগের অনুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাস করিবেন শুনিয়া, তাঁহারা পরাধিকার ত্যাগ করিয়া, বাসান্তরের অন্বেষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচন্দ্র উহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান হইতে পারে। ব্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন? হেমচন্দ্র দিগ্বিজয়কে আজ্ঞা করিলেন, "ব্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভৃত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভৃত্যের দ্বারা সম্ভবে না। ব্রাহ্মণ-ঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না;—কেন না, তিনি বধির। হেমচন্দ্র ভাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভিমানপ্রযুক্ত ভৃত্যের

আলাপ গ্রহণ করেন না; এজন্য স্বয়ং তৎসম্ভাষণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

জনার্দ্দন আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

হেমচন্দ্র। আমি আপনার ভৃত্য।

জনার্দ্দন। কি বলিলে, তোমার নাম রামকৃষ্ণ?

হেমচন্দ্র অনুমান করিলেন, ব্রাহ্মণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচন্দ্র। আমি ব্রাহ্মণের দাস।"

জ। ভাল ভাল। প্রথমে ভাল শুনিতে পাই নাই, তোমার নাম হনুমান্ দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন,—নামের কথা দূর হউক; কার্য্যসাধন হইলেই হইল; বলিলেন, "নবদ্বীপাধিপতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। শুনিলাম, আমার আসায় আপনি স্থানত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না এখনও গঙ্গাস্নানে যাই নাই; এই স্নানের উদ্যোগ করিতেছি।

হে। (অত্যুচ্চৈঃস্বরে) স্নান যথাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি যে, আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব না? তোমার বাটীতে কি? আদ্যশ্রাদ্ধ?

হে। ভাল, আহারাদির অভিলাষ করেন, তাহারও উদ্যোগ হইবে। এক্ষণে যেরূপ এ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপই করুন।

জ। ভাল ভাল ; ব্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই, তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা ?

হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন ; দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা সজীব ; তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্ম্মাণকৌশল-সীমারূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তরুণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিত স্বরে সুন্দরী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তাহা ত পাইলেন না, দেখিলাম। তুমি কে ?" বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

হে। ইনি তোমার পিতামহ ?

মনোরমা। তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে ?

হে। শুনিলাম, ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।

ম। কেন ?

এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?"

ম। তুমি কি আমার ভাই?

হে। আজ হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?

ম। বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?

হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা, না উন্মাদিনী? বলিলেন, "কেন তিরস্কার করিব?"

ম। যদি আমি দোষ করি?

হে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?

মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বলিলেন, "আমি কখন ভাই দেখি নাই, ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?"

হে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না,—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?

হেমচন্দ্র হাসিলেন; কহিলেন, "আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি?"

ম। আমি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন।

হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।

ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মনোরমা, ব্রাহ্মণীকে বল,—রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ স্বয়ং "ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী তখন স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণীর ঐ বড় দোষ। কাণে কম শোনে!"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গৃহস্থালি

(অশ্বিনী)

মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠির-যক্ষের প্রশ্নোত্তরে আমরা একটি কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কো মোদতে?"—সুখী কে? ইতিপূর্ব্বে যক্ষ তাঁহাকে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; তাহাতে ধর্ম্মের কথা, বৈরাগ্যের কথা বিস্তর আছে,—এবার ধর্ম্মের বা বৈরাগ্যের প্রশ্ন নহে—গৃহীর সুখ-দুঃখের কথা। যুধিষ্ঠির উত্তর দিতেছেন,—

"পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥"

—বনপর্ব্ব, ৩১২ অ°, ১১৫।

যে ঋণগ্রস্ত ও প্রবাসী না হইয়া আপনার গৃহে দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে শাক মাত্রও পাক করে, সেই ব্যক্তিই সুখী।

তিনটি কথায় ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যধর্ম্মের তিনটি মূল কথা বিবৃত হইয়াছে। ঋণ না করিয়া সংসার চালানো, বিদেশে না গিয়া নিজ গৃহে বাস করা, আর সামান্যে সন্তুষ্ট থাকা—এই তিনটি হইল ভারতবাসীর গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান কথা।

ঋণ-সম্বন্ধে বিদেশের মহাকবি সেক্সপিয়র কি বলিয়াছেন

ভাবিয়া দেখ। পুত্রকে পিতার উপদেশ-ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন,—

"Neither a borrower, nor a lender be :
For loan oft loses both itself and friend ;
And borrowing dulls the edge of husbandry."

ঋণ দাতা বা গ্রহীতা হ'বে না কখন ;
ঋণ দিলে হেন হয় অনেক সময়—
বান্ধব-বিচ্ছেদ আর নিজ অর্থক্ষয়।
না থাকে সংযম, ঋণ করিলে গ্রহণ—
কুবেরের ধনে আর না হয় কুলন।

বাস্তবিক ঋণ দুই দিকে কাটে ; ঋণ যে দেয় আর যে লয়—প্রায় কাহারও ভাল হয় না। বন্ধুর বা আর কাহারও উপকার করিতে হইলে যাহা পার সাহায্য কর, কিন্তু ঋণ দিলাম মনে করিয়া তাহাকেও বাঁধিও না, আপনিও বাঁধা পড়িও না।

ঋণগ্রস্ত হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে তাহার ফল পাওয়া যায় না। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যে ভিক্ষা করিবে, তবু ঋণ করিবে না ; আর যদি সঙ্গতিতে না কুলায় তাহা হইলে কাম্য কর্ম্ম একেবারে করিবেই না। ঋণ করিলে মানুষকে যত আত্মসম্মান হারাইতে হয়, এত আর কিছুতেই নয়। ঋণী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সশঙ্ক, সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত। উত্তমর্ণের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইলে মুখ শুকাইয়া যায়—বুঝিবা লোকটি পথের মাঝেই তাগাদা করেন। উত্তমর্ণের ভবনে উৎসব, তিনি উৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে আশঙ্কা হয়,—এ সময় তাঁহার খরচপত্র হইবে, হয়ত পাওনা টাকার তাগাদা

করিবেন। আবার নিজের বাড়ীর উৎসবে উত্তমর্ণকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতে ভয় হয়—যদি বলেন, ঋণ থাকিতে এত বাড়াবাড়ি না করিলেই ভাল হইত। আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়ীতে আসিলে বাজার হইতে একটা বড় ইলিসমাছ কিনিবার ইচ্ছা হইলেও কিনিবার উপায় নাই,—মহাজনের বাড়ীর কাছ দিয়া আসিতে হইবে যে। টানাটানি করিয়া সংসার চালাইয়াও স্বস্তি নাই। তিনি শুনিয়া যদি বলেন, "ওহে ভাই, এত কষাকষি করিয়া সংসার চালাইতেছ, ভালই; আমার টাকা কটা ফেলিয়া দাও না।"

এইরূপে দেখা যায় ঋণ করিলে খাইতে শুইতে, উৎসবে ব্যসনে, আহারে বিহারে—কিছুতেই স্বস্তি পাওয়া যায় না; কেবল কর্ম্ম-ভোগ ভুগিতে হয়, কর্ম্মের সুফল মিলে না। জমিদার মহাশয় ঋণগ্রস্ত; দেখিবে তিনি যখন হাসিতেছেন তখন তাঁহাকে বিকারের রোগী বলিয়া মনে হইতেছে—এমনই বিকৃত বদন-ব্যাদান, এমনই উচ্চধ্বনি, এমনই হস্তপদের আস্ফালন। তাঁহার নিজ প্রভুপরায়ণ ভৃত্য মুহুরি তাঁহাকে হিসাব দেখিতে বলিলে তিনি চটিয়া লাল হন। কখন মনে করেন, ঋণ আছে বলিয়া কর্ম্মচারী বিদ্রূপ করিতেছে; কখন মনে করেন, মহাজনের টাকা খাইয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার পরামর্শ দিবে। এইরূপে দেখিবে, ঋণের বাড়া বিড়ম্বনা আর নাই। সততই মনে হয়, মহাজন যেন বুকের উপর বসিয়া আছে; বুকের উপর যেন জগদ্দল পাথর চাপানো আছে। এমন যে সন্ধ্যা-আহ্নিক, দেবপূজা তাহাতেও শান্তি আসে না। মহাদেবের 'রত্নকল্পোজ্জ্বলাঙ্গম্' ভাবিতে গিয়া মহাজনের ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষ মনে পড়ে; ধ্যানপূজা সমস্ত

পঙ্গু হইয়া যায়। যদি সুখ, স্বস্তি, শান্তি চাও, তবে ঋণী হইও না, ঋণ না করিয়া যেরূপে পার সংসার চালাইবার চেষ্টা করিও।

এখনকার দিনে এই উপদেশের সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কোঠাবাড়ী দালান না হইলে এখন সহর অঞ্চলে ভদ্রলোক হওয়া যায় না; আর ঋণ না করিয়া নগদ দামে চূণ-সুর্‌কি-ইট কিনিতেই নাই। কাজেই সহর ও সহরতলীর ভদ্রলোক মাত্রই ইট-চূণ-সুর্‌কির মহাজনের কাছে ঋণী। তাহার পর নগদ দাম দিয়া যে কাপড়-চোপড় কেনে তাহাকেও ভদ্র বলা প্রথা নয়,—সুতরাং কাপড়ের দোকানে ঋণ থাকাই প্রশস্ত। কাজেই এখন লোকে অকুলনের দায়ে না হইলেও ভদ্রতার দায়ে ঋণী হইতেছে। তাহার পর এখন একটা 'ব্যবসা' বলিয়া কথা উঠিয়াছে। তা' নাকি ঋণ করিয়া করাই উচিত। ৮৲ টাকা হারে সুদ কবুল করিয়া, বাস্তুবাড়ী বন্ধক দিয়া কাটা-কাপড়ের কারবার করিলাম; তাহাতে ১২৲ টাকা করিয়া লাভ পোষাইবে, সুতরাং থামকা ৪৲ টাকা করিয়া লাভ থাকিবে,—জানিয়া-শুনিয়া এমন লাভ ত্যাগ করা নির্বুদ্ধিতা। কাজেই ঋণ করাই সুবুদ্ধির পরামর্শ।

আমরা সহর অঞ্চলের কথা বলিতেছি বলিয়া এমন মনে করিতে হইবে না যে, পল্লীগ্রামে ঋণ কম। অধিকাংশ পুরাতন সম্ভ্রান্ত পরিবার এখন ঋণদায়ে উদ্বাস্তু হইয়াছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে দুই এক জনের ভাল চাকরি জুটিল, তবেই কথঞ্চিৎ রক্ষা, নতুবা ঋণ বাড়িতে বাড়িতেই চলিল।

সেক্সপিয়র সুন্দর বলিয়াছেন, ঋণ করিতে শিখিলে আর মিতব্যয়িতা-প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণতা থাকে না, ভোতা হইয়া যায়।

মিতব্যয়িতা হইল গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রাণ। মিতব্যয়িতা নষ্ট হইলে সংসারে আর প্রাণ থাকে না, সমস্ত শিথিল হইয়া যায়। আমাদের মত মধ্যবর্ত্তী লোকের মিতব্যয়িতা থাকিলে সংযম থাকে, মিতাচার থাকে, বিলাসিতা কম থাকে, আড়ম্বর কম থাকে, পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষের পরিশ্রমে অভ্যাস থাকে ; আর ঋণ করিতে শিখিলে বিলাসিতা আসে, আলস্য আসে, সংযম থাকে না—লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়।

ধনবৃদ্ধির জন্য ঋণ, মানবৃদ্ধির জন্য ঋণ, বিলাসবৃদ্ধির জন্য ঋণ—নানারূপ ঋণে বাঙ্গালার গৃহস্থগণ নষ্ট হইয়া যাইতেছেন। অর্থাভাবে ঋণই কিন্তু বেশী। প্রয়োজনীয় পদার্থের সংগ্রহ হয় না, সেইজন্য সামান্য আয়ের ভদ্রসন্তান বাধ্য হইয়া ঋণ করেন। আয়ের দশাংশের এক অংশ সঞ্চয়ের জন্য রাখিয়া নয় অংশ ব্যয় করিলে তবে গৃহস্থালি হয়, এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথমতঃ দুইটি কারণে ঐ উপদেশ আমরা গ্রাহ্য করি না,—(১) পোষাক-পরিচ্ছদের সহিত মান-সম্ভ্রমের সম্বন্ধ আছে, এইরূপ মনে করিতে আমরা শিখিতেছি। (২) আর শিখিতেছি, থাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদের চালচলন ক্রমে ক্রমে বাড়ানো কর্ত্তব্য, তাহা হইলে অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন হয় ; প্রয়োজন হইলেই প্রয়োজন মিটাইবার উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় ; উপায় ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে, কাজেই আয় বাড়িয়া যায়।

আমরা যদি পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া সম্মান করিতে, সম্ভ্রম করিতে, মর্য্যাদা করিতে শিখি, তাহা হইলে সমাজে ঘোর অনর্থ-পাতের সূত্রপাত করি। ধনবান্ লোকেই আড়ম্বরে পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারেন ; কেবল পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া

সম্মান করিলে, কেবল ধনবানেরই সম্মান করা হয়। যে সমাজে কেবল ধনবানের সম্মান আছে, সে সমাজ অতি অপকৃষ্ট সমাজ। সমাজে গুণের ও কর্ম্মের সম্মান থাকা আবশ্যক। গুণকর্ম্ম-বিভেদেই জাতিভেদ হইয়াছিল।

প্রয়োজন বাড়াইলেই আয় বাড়ে—ঘোর মিথ্যা কথা। প্রয়োজন বাড়াইয়াছি বলিয়াই আমরা ঋণগ্রস্ত হইতেছি; ইহার দৃষ্টান্ত পাইবার জন্য আমাদিগকে অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। ঘরে ঘরেই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এখনকার দিনে এত যে হাহাকার, প্রয়োজনবৃদ্ধি তাহার মূল কারণ। ছোট ছেলে—নিজে ভালমন্দ কিছুই বুঝে না, তাহার জন্য 'নটুন কাপল' ও 'আঙ্গা জুতো' হইলেই সে মহা খুসী, আমরা কিন্তু বাঁকৃড়ি-লাগানো শাটীনের জামা ও চীনের জুতা তাহাকে দিবার জন্য বিব্রত। কাজেই আমরা ঋণদায়ে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

এই সকল বিলাস-দ্রব্যের মায়া কাটাইয়া আমাদিগকে আবার হিন্দু-সংসারী হইতে হইবে; তাহা হইলে স্বস্তি পাইব, শান্তি পাইব; সংসারে আবার শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে। আয়ে-ব্যয়ে যে সামঞ্জস্য-সাধন, তাহাই হইল সংসারের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্খলা। সেই শৃঙ্খলা হারাইয়া আমরা ভগ্নকর্ণ নৌকার মত এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। প্রত্যহ পসারীর কাছে ঋণ করিয়া নিত্য-ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র আনি বলিয়া আমরা ভাল জিনিষ পাই না, আর মাসকাবারের দিনে ডাহিনে আনিতে বামে কুলায় না; কোন জিনিষে কিছুতেই আয় দেয় না, সদাই অনটন; আমরা লক্ষ্মীর সন্তান হইয়াও দিন দিন নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া হইতেছি।

(অপ্রবাসী)

যুধিষ্ঠিরের কথা—অপ্রবাসী হইলে তবে সুখী হইতে পারা যায়। প্রবাসে কি সুখ পাওয়া যায় না? যুধিষ্ঠির কিরূপ সুখের কথা বলিতেছেন তাহা বুঝিলে, তবে ঐ কথার উত্তর দেওয়া যায়। অঋণী ব্যক্তিই সুখী হইতে পারে, এই কথা বলাতেই আমরা কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি স্বস্তির কথা, শান্তির কথা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। এখন বুঝিতে হইবে কোন্ বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া তিনি "প্রবাস" দুঃখের হেতুভূত মনে করিয়াছেন।

বংশপরম্পরাক্রমে একই দেশে থাকিয়া কি জীবজন্তুর, কি গাছপালার—সেই দেশের জলবায়ুর সহিত, তাপমৃত্তির সহিত এক প্রকার সখ্য বা সৌহার্দ্দ্য হয়। এ দেশের কলাগাছ পশ্চিম মুলুকে বসাইলে মুশড়াইয়া যাইতে থাকে, কিছু দিনে মরিয়া যায়। পশ্চিমের ময়ূয়া পাখী দুই বৎসর বাঁচাইয়া রাখা দায়। সকলেই জানেন, হাতী, উট, ঘোড়া সকল দেশে জন্মায় না, আনাইয়া রাখিলেও স্বদেশের মত উহাদের বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। মানুষের বেলায়ও ঠিক সেই ভাব। পুত্রের পীড়ার দায়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ইটাওয়া নগরে পাঁচ মাস প্রবাস করিয়াছিলাম; প্রবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। সেখানে এক-পুরুষে বা দুই-পুরুষে বাঙ্গালীর বাস অধিক, এক ঘর চারি-পাঁচ-পুরুষে ছিলেন। তাঁহাদের নিবাস ছিল হালিসহরে, বোধ করি তাঁহারা 'খনের চাটুতি;' সরকারের প্রথম অবস্থায় ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভাল চাকরি লইয়া আসেন, ঐ জেলায় প্রায়

বার্ষিক ছয় হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করেন। আমার সহিত যখন উঁহাদের আলাপ হয়, তাঁহার পৌত্র তখনও জীবিত ছিলেন, অন্ধ হইয়াছিলেন। পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, পৌত্রাদি অনেকগুলি—কিন্তু কি বলিয়া তাঁহাদের অধঃপতন বুঝাইব, তাহা বলিতে পারি না। পশ্চিমের আফিং খাওয়া আর বাঙ্গালীর মোকদ্দমা করা—এই দুইটা রোগ একত্র মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে কি যে গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাদিগকে বাস্তবিকই মানুষ বলিতে কুণ্ঠা হয়—পাছে বাকি মানুষে মান-হানির দাবি করে।

ইটাওয়া হইতে কানপুরে আসি। সেখানে একটি খাঁটি বাঙ্গালীপাড়াই আছে, অতি অপরিষ্কার পল্লী; অধিবাসীদের অবস্থা সর্ব্ববিষয়েই শোচনীয়। তাহার পর প্রয়াগে আসিলাম—সেখানে দুই জন গণ্যমান্য শিক্ষকের সহিত এই বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হইল। এক জন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "প্রবাসী"র সম্পাদক—আজকাল প্রবাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর এক জন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ, গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক, এখনও সেই পদেই আছেন। দুই জনেই একবাক্যে বলিলেন যে, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, স্বকৃত-প্রবাসীর পুত্র-পৌত্র পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী বালক-যুবকদের অপেক্ষা ভাল থাকে, কিন্তু কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রপৌত্র হিন্দুস্থানীদের সমকক্ষতাও রক্ষা করিতে পারে না। বুঝিলাম, প্রবাসে বংশের অবনতিই হইয়া থাকে।

আর এক কথা—দেশে আমরা ৫০ ঘর প্রতিবেশী আজি দুই শত বৎসর যাবৎ একস্থানে একত্র বাস করিতেছি; সকলের দোষগুণ সকলে জানি, দোষগুণ জানিয়া সেই মত ব্যবহার করিয়া

থাকি। প্রতিবাসিমণ্ডলী একরূপ একটি বৃহৎ পরিবার হইয়া পড়িয়াছে; পরস্পরের সুখদুঃখে পরস্পর জড়িত থাকে—বিপদে সাহায্য পাই, উৎসবে আনন্দ পাই। কোন্ ভাবে কে সাহায্য চায়, তাহা জানি; কাহাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে হইবে, তাহা বুঝি।

বিদেশে ইহার কিছুই হয় না। যদি ৫০ঘর বিদেশীর মধ্যে আমি এক ঘর রহিলাম, তাহা হইলে ত আমাকে বনবাসের অপেক্ষাও কষ্টে থাকিতে হইবে। তা না হইয়া যদি ৫০ঘরের মধ্যে আমরা দশ ঘর বাঙ্গালী থাকি, তবুও বিড়ম্বনা বড় কম নয়। আমরা দশ ঘর বাঙ্গালী বটে,—কিন্তু তাহার মধ্যে দুই ঘর বা শ্রীহট্টী, তিন ঘর বরিশালী, দুই ঘর বর্দ্ধমানী, দুই ঘর কলিকাতার। সভ্যতার পালিশের গুণে হয় ত একপ্রকার সৌজন্য আছে; কিন্তু সৌহার্দ্দ্য একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়ত দুইটি রোগা ও রোগী ছেলে, বৃদ্ধ মাতা ও ভার্য্যা লইয়া প্রবাসে পড়িয়া আছ, দেখিবে প্রবাসে বাঙ্গালীর মধ্যে সৌজন্যের অভাব নাই। প্রভাতে পরিক্রমের সময়ে দেখিবে দলে দলে বাঙ্গালী বাবুরা আসিয়া কেবল সৌজন্য-সহকারে তত্ত্ব (kind enquiries) লইতেছেন—জ্বর কত ডিগ্রী উঠিয়াছিল, সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কিন্তু এই যে তোমরা আগন্তুক দম্পতী রোগের সেবায় ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া মারা যাইতে বসিয়াছ, কোনরূপ সাহায্য করিয়া তোমাদের একটু 'আশান্' দিবার প্রস্তাব কেহ কখন করিবেন কি? প্রবাসে হৃদয়ের টান প্রায়ই হয় না। তাহার উপর ইংরাজি সভ্যতার একটা মোহ হইয়াছে, ভদ্রলোকে মনে করেন সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়। পরস্পর সাহায্যে মনুষ্যত্ব—

ঘাড়-নাড়ানাড়ি বা হাত-নাড়ানাড়ি, একত্র তামাক খাওয়া বা চা পান করায় মনুষ্যত্ব হয় না। যতই দয়ার ভাবে খোঁজখবর লও, তাহাতে মনুষ্যত্ব হয় না—দয়ার বা প্রীতির বা মৈত্রীর কার্য্য করা আবশ্যক। প্রবাসে সকলেই যে মনুষ্যত্বহীন এমন কথা বলি না, তবে মনুষ্যত্ব থাকিলেও পাঁচ জনের মধ্যে বংশপরম্পরায় ঘনিষ্ঠতা না থাকায় মনুষ্যত্ব ফুটে না—বরং শুকাইয়া যায়।

প্রবাসে এক শূকর-পেটের পূরণ আর মিত্র বা অমিত্র-ভোজে খাসী-চর্ব্বির থানায় দানবোদরের সম্পূরণ ছাড়া ক্রিয়া-কলাপ কিছুই নাই। পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা আছেন—পুরোহিত ঠাকুরের ভাঁড়ার ঘরের কুলুঙ্গিতে, দুগ্ধবতী গাভী আছেন গোয়ালার গোয়ালঘরের দাওয়ায়, বড় বাড়ী দেখিয়া বাড়ীর ধারে রোয়াকে অতিথি চীৎকার করিতেছে—ডেপুটীবাবু তখন প্রবাসে চায়ে চিনি কম হইয়াছে বলিয়া চাপরাসীকে ভৎর্সনা করিতেছেন! দেশের লোকের খোঁজখবর নাই, পিতৃপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, পূজা নাই, অর্চ্চনা নাই, শ্রাদ্ধ নাই, শান্তি নাই—প্রবাসে হিন্দুর মনুষ্যত্ব কেমন করিয়া থাকিবে? না—আমরা পেটের দায়ে, অবস্থা-উন্নতির দায়ে, রোগের দায়ে, সখের দায়ে—কারণে অকারণে প্রবাসী হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সুখ হারাইতেছি।

সংসারীর সুখ-স্বচ্ছন্দতা, স্বস্তি-শান্তি—সকলই আর পাঁচ জন সংসারীকে লইয়া। প্রতিবাসীর বংশের রীতি-নীতি জানিলে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবহারে সুখ পাওয়া যায়। প্রবাসে এক জন আর এক জনের বংশের পরিচয় কিছুই জানেন না; কাজেই পরস্পরে পরস্পরের বংশ-পরম্পরার পরিচয়ে যে

ঘনিষ্ঠতা দেশে হয়, প্রবাসে তাহার কিছুই হয় না। এটি হইল সাধারণ কথা। আবার বিশেষ কথাও আছে। সখ করিয়া যাঁহারা প্রবাসী হন, তাঁহাদের মধ্যে দেশে দুষ্কর্ম্ম করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, এমনও দুই এক জন থাকেন। তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতে যাওয়া মহা বিড়ম্বনা। তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকেন, সর্ব্বদাই মনে করেন এ ব্যক্তি বুঝি আমার দেশের সংবাদ রাখে; কাজেই দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই চটিয়া লাল হন; লোকটা হঠাৎ কেন এমন করিল ভাবিয়া বিড়ম্বিত হইতে হয়। এইরূপ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রবাসে নানারূপ বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী; প্রবাসে যাওয়া বা থাকা যত কমানো যায়, ততই ভাল। ব্রহ্মচর্য্য-অবস্থায় গুরুর সহিত বিদেশ-ভ্রমণ, গৃহস্থ-অবস্থায় তীর্থপর্য্যটন, (এখন আশ্রমভেদ নাই বলিলেও হয় কিন্তু) বানপ্রস্থের মত সময়ে প্রবাসে পর্য্যটন, আর দেশে মহামারী-আদি হইলে প্রবাসে অগত্যা বাস—এই সকল সময় ছাড়া বাঙ্গালীর পক্ষে স্বেচ্ছায় অনর্থক প্রবাসবাস একেবারে পরিবর্জ্জনীয়।

(স্বগৃহে পাক)

অঋণী, অপ্রবাসী হইয়া যে ব্যক্তি আপনার গৃহে অতি যৎসামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে—সেই সুখী। দুইটি কথা লক্ষ্য করিবার আছে,—একবার 'অপ্রবাসী' বলা হইয়াছে, আবার 'স্বে গৃহে' বলা হইয়াছে। কেবল দেশে থাকিলে হইবে না, আপনার একটি গৃহ থাকা চাই। আমাদের রাঢ়ীয় কুলীন

ব্রাহ্মণদিগের একটা নিন্দার কথা ছিল, "নিবাস শ্বশুর-ঘরে।"— সেরূপ অপ্রবাসী হইলে চলিবে না, সত্যসত্যই নিজের একটি ঘর থাকা চাই। এমন কেহ মনে করিও না যে, ইহাতে একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করা নিষিদ্ধ হইতেছে; যে ভাবে আমরা বলি, "পরভাতী ভাল, পরঘরী কিছু নয়"—এ সেই ভাবের কথা। গৃহী মাত্রেরই গৃহ থাকা চাই এবং গৃহিণীও থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে কথা যুধিষ্ঠিরের উত্তরে স্পষ্ট করিয়া নাই, আমরাও বলিব না। গৃহে গৃহিণী থাকা চাই—এ উপদেশ বাঙ্গালীকে দিবার প্রয়োজন নাই! অতি সামান্য আয়ের কেরানীবাবুও এখনকার দিনে পরিবার নিকটে রাখিবার জন্য ব্যগ্র, কাজেই ও কথা বলার প্রয়োজন নাই। আর লক্ষ্য করিবার কথা 'পচতি'—পাক করে বা প্রস্তুত করে। দিনান্তে এক বার মাত্র হউক, অতি যৎসামান্য হউক, তাহা যদি সে প্রস্তুত করিতে পারে, তবেই সে সুখী; 'খাইতে পাইলে সুখী,' এমন কথা নাই। কেন না খাওয়াটা গৃহস্থালির বড় জিনিষ নয়; পাক করিবার ক্ষমতা থাকা গৃহস্থের লক্ষণ—তবে ত দেবতা-অতিথিকে দিয়া আহার। সুতরাং পাক করা চাই।

যুধিষ্ঠিরের উত্তরে বুঝা গেল, দরিদ্রের কুটীরে পর্য্যন্ত সুখ থাকিতে পারে। তাহার ঋণ না থাকিলেই হইল, (জন্মভূমিতে) একখানি স্থায়ী কুটীর থাকিলেই হইল এবং দিনান্তে হাঁড়ী চড়িলেই হইল। সুখ ভোগে নহে, সুখ ঐশ্বর্য্যে নহে, সুখ ভোগ-বিষয়ের প্রাচুর্য্যে নহে। এইটি ভারতের একটি মূল কথা। ঋণ করিয়া ভোগের আড়ম্বরের কথায় আমরা এই কথারই আলোচনা করিয়াছি, আবার সেই কথারই তোলাপাড়া করিতেছি।

(সন্তোষ)

আমরা বলি সন্তোষ সুখের মূল ; বিদেশীয়েরা বলেন সন্তোষ সকল দুঃখের আকর।—সন্তোষ হইতে আলস্য আসে, আলস্য হইতে অভাবমোচনের শক্তি কমিয়া যায়, অভাবগ্রস্ত হইয়া আমরা নানা দুঃখ পাই। সুতরাং কি রাজনীতি, কি সমাজনীতিতে অসন্তোষই হইল উন্নতির উপায়। কিন্তু যাঁহারা এইরূপ অসন্তোষের উপদেশ নিয়ত দিয়াছেন, তাঁহারাই এখন একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন। এখন রাজনীতিক্ষেত্রে ভারতে মহা অসন্তোষ দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, বলিতেছেন—এরূপ অসন্তোষ ভাল নহে। আমরা রাজনীতির কথা তুলিব না, তবে সমাজে অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়া বা বৃদ্ধি করিয়া যাঁহারা সমাজের মঙ্গল-কামনা করেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বা প্রকরণ-পদ্ধতির প্রশংসা করিতেও পারি না। অসন্তোষ—অধর্ম্ম। অধর্ম্মে কোন সমাজের বা ব্যক্তির বা পরিবারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কথা বুঝিতে পারি না।

বালকে আপনার অবস্থা বুঝে না, কাজেই সর্ব্বদা—ইহা কৈ, উহা কৈ, ক্ষীর খাইব, মিঠাই খাইব বলে। বালকের সেই অসন্তোষে প্রশ্রয় দিয়া তাহাকে অসন্তুষ্ট যুবা করিতে পারিলেই কি সুবুদ্ধিমানের কাজ হয়? না,—সেই বালককে বুঝাইতে হইবে যে, বাপু, আমরা ক্ষীর-মিঠাই কোথা পাইব? যাহার যেমন সঙ্গতি, তাহার ছেলেপিলেরা সেই মতই খাইতে পায় ; আমাদের যেমন অবস্থা, সেই মত অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তোমার জন্য মোয়া আছে, নাড়ু আছে, তাহাই খাইয়া সন্তুষ্ট হও। যে যে অবস্থার লোক হওনা কেন, সন্তোষ সকলকেই শিখিতে হইবে, কেন না

অপরিসীম উপকরণ থাকার সম্ভাবনা নাই।—এই যে চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি পাপ—এগুলি কি সন্তোষের ফল? না অসন্তোষের পরিণাম? নিশ্চয় অসন্তোষ হইতেই এই সকলের উৎপত্তি; সুতরাং সন্তোষই বাঞ্ছনীয়—অসন্তোষ নহে। তবে সন্তোষ হইতে আলস্য আসিয়া পড়ে—এ কথাও একেবারে ফেলিয়া দিবার উপায় নাই। কিন্তু এখনও আমরা যেমন 'পেট বড় ওস্তাদ' বুঝিয়া গৃহস্থালি বদলে পাকস্থলীকে ওস্তাদিতে বাহাল রাখিয়াছি, আর তাহারই তাড়নায় আলস্য ত্যাগ করিতেছি, সেইরূপ পূর্ব্বের মত যদি গৃহস্থালিকে আবার ওস্তাদিতে বসাইতে পারি—যদি অতিথি-দেবতার পূজা, অবশ্য-পোষ্যের পালন পেটপূরণের মত প্রয়োজনীয় মনে করি, তাহা হইলে আমরা অলস হইবার অবসর পাইব না। পাঁচ জনকে দিয়া, তবে পেট পূরাইতে হয়—এই ধারণা বদ্ধমূল থাকিলে আলস্য আর আমাদের উপর বল করিতে পারে না।

(শ্রীবৃদ্ধি)

আর শ্রাদ্ধের পর আমরা পিতৃলোকের নিকট কিরূপ বর প্রার্থনা করি, তাহা স্মরণ কর,—

"দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমৎ বহু দেয়ঞ্চ নোঽস্থিতি॥"

—মনু, ৩।২৫৯।

—হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যাগাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা বেদশাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়; আমাদের পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা

যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে; বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্ত দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না থাকে।

যে ঐকান্তিকতা-সহকারে ঐরূপ প্রার্থনা আপনার পিতৃপুরুষের কাছে করিতে পারে, সে কি কখন আর অলস হইতে পারে? এখনকার দিনের বিজ্ঞেরা বলেন, ষ্টাইল (style) না বাড়াইলে উপার্জ্জন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? সাংসারিক উন্নতি হইবে কি প্রকারে? আমরা বিনীতভাবে সেই বিজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রার্থনায় কি ষ্টাইল বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না? পায় বৈ কি। তবে আমাকে কোপ্তা-কাবাব, কারি-কাট্‌লেট দাও—সে কথা নাই বটে; গাড়ী দাও, জুড়ি দাও—সে কথাও নাই বটে; শাল দাও, রুমাল দাও—সে কথাও নাই বটে,—কিন্তু আমার বংশে দেয় বস্তু বৃদ্ধি পাউক, বংশে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাউক—এ কি শ্রীবৃদ্ধির কথা নহে? যে যত পরের দুঃখ দূর করিতে পারে, তাহাকে আমরা তত শ্রীমান্ মনে করি। সেই শ্রী লাভ করিবার জন্য আমরা ব্যগ্র—আমরা কখন অলস হইতে পারি কি? আর যে আলস্যে ঋণ বৃদ্ধি হয়, সে আলস্য কি আমাদের আশ্রয় হইতে পারে? তাহা পারে না। আমরা যুধিষ্ঠিরের উপদেশ সম্যক্ প্রতিপালনের চেষ্টাই করিয়া থাকি। আমরা বুঝি তাহাতেই স্বচ্ছন্দতা, সুখ, স্বস্তি এবং পারিবারিক শান্তি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

শ্মশানে

এইখানে আসিলে সকলেই সমান হয়। পণ্ডিত, মূর্খ; ধনী, দরিদ্র; সুন্দর, কুৎসিত; মহৎ, ক্ষুদ্র; ব্রাহ্মণ, শূদ্র; ইংরেজ, বাঙ্গালী—এইখানে সকলেই সমান। নৈসর্গিক, অনৈসর্গিক সকল বৈষম্য এইখানে তিরোহিত হয়। শাক্যসিংহ বল, শঙ্করাচার্য্য বল, ঈশা বল, রুসো বল, রামমোহন বল; কিন্তু এমন সাম্য-সংস্থাপক এ জগতে আর নাই। এ বাজারে সব এক দর—অতি মহৎ এবং অতি ক্ষুদ্র, মহাকবি কালিদাস এবং বটতলার নাটকলেখক, একই মূল্য বহন করে। তাই বলি, এ স্থান ধর্ম্মভাবপূর্ণ—এ স্থান সদুপদেশপূর্ণ—এ স্থান পবিত্র।

এইখানে বসিয়া একবার চিন্তা করিতে পারিলে, মনুষ্য-মহত্ত্বের অসারতা বুঝিতে পারি, অহঙ্কার চূর্ণীকৃত হয়, আত্মাদর সঙ্কুচিত হয়, স্বার্থপরতার নীচতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরে হউক, সকলকেই আসিয়া এই শ্মশানমৃত্তিকা হইতে হইবে। যে অনভিভবনীয় বীর্য্য, যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার—আর পৃথিবী নাই বলিয়া রোদন করিয়াছিল, তাহা এই মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে,—তুমি আমি কে? যে উৎকট আত্মাভিমান ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে কর চাহিয়াছিল, *

* See Lewes's History of Philosophy. Auguste Comte.

তাহা এই মাটীতে বিলীন হইয়াছে,—তুমি আমি কে? সে দিন যে চিন্তাশক্তি ঈশ্বরকে স্বকার্য্য-সাধনে অক্ষম বলিতে সাহস করিল,* তাহা এই মাটীতে মিশিয়াছে,—তুমি আমি কে? যে রূপের অনলে ট্রয় পুড়িয়াছিল, যে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গে বিপুল রাবণবংশ ভাসিয়া গিয়াছিল, যে লাবণ্য-রজ্জুতে জুলিয়স্ সিজর বাঁধা পড়িয়াছিল, যে পবিত্র সৌকুমার্য্যে এ পাপহৃদয়ে কালানল জ্বলিয়াছে, সে সুন্দরী, সে দেবী, সে বিলাসবর্ত্তী, সে অনির্ব্বচনীয়া এই মাটীতে পরিণত হইয়াছে,—তুমি আমি কে? কয় দিনের জন্য সংসার? কয় দিনের জন্য জীবন? এই নদীহৃদয়ে জলবিম্বের ন্যায় যে বাতাসে উঠিল, সেই বাতাসেই মিলাইতে পারে। আজি যেন অহঙ্কারে মাতিয়া একজন ভ্রাতাকে চরণে দলিত করিলাম, কিন্তু কালি এমন দিন আসিতে পারে যে, আমাকে শৃগালকুক্কুরে পদাঘাত করিলেও আমি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিব না। কেন অহঙ্কার? কিসের জন্য অহঙ্কার? এ অনন্ত বিশ্বে আমি কে—আমি কতটুকু—আমি কি? এই মাটীর পুতুলে অহঙ্কার শোভা পায় না। তাই বলিতেছিলাম, এই স্থান মনে উঠিলে সকল অহঙ্কার—বিদ্যার অহঙ্কার, প্রভুত্বের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, সৌন্দর্য্যের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার, প্রতিভার অহঙ্কার, ক্ষমতার অহঙ্কার, অহঙ্কারের অহঙ্কার—সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। আর সেই দিন অপরিহার্য্য—পলাইয়া রক্ষা নাই। যে ভীরুশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ সেন জীবনের ভয়ে যবনহস্তে জন্মভূমি নিক্ষেপ করিয়া, মুখের গ্রাস ভোজনপাত্রে ফেলিয়া তীর্থযাত্রা করিলেন, তিনিও এড়াইতে পারিলেন না। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৈষম্য নাই—ঈশ্বরের

* See J. S. Mill's Three Essays on Religion.

চক্ষে সকলেই সমান। স্বর্গ কি, তাহা জানি না—কখনও দেখি নাই, হয় ত কখনও দেখিবও না। কিন্তু শ্মশানভূমির এই উপদেশ জীবন্ত। এ স্থান স্বর্গের অপেক্ষাও বড়। এ স্থান পবিত্র।

আর স্বার্থপরতা? তাহারও ক্ষুদ্রত্ব অনুমিত হয়। সম্মুখে, অসীম জলরাশি অনন্তপ্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। পদতলে, বিপুলা ধরিত্রী পড়িয়া রহিয়াছে। মস্তকোপরি, অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাতে অসংখ্য সৌরমণ্ডল, অগণনীয় নাক্ষত্রিক জগৎ নাচিয়া বেড়াইতেছে; সংখ্যাতীত ধূমকেতু ছুটাছুটি করিতেছে। ভিতরে অনন্ত দুঃখরাশি, ক্ষুব্ধসাগরবৎ, মদমত্ত মাতঙ্গবৎ, দুলিতেছে। যে দিকে দৃষ্টি ফিরাও, সেই দিকেই অনন্ত—আমি অতি ক্ষুদ্র—কত সামান্য। এই সামান্যের, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতরের জন্য এত আয়াস, এত যত্ন, এত গোল, এত বিভ্রাট, এত পাপ!—বড় লজ্জার কথা। এই ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র করিয়া যে জীবন অতিবাহিত হইল, তাহার মহত্ত্ব কোথায়? কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র হইলেও মানবজাতি ক্ষুদ্র নহে। একটি একটি মনুষ্য লইয়াই মনুষ্যজাতি, স্বীকার করি; কিন্তু জাতিমাত্রই মহৎ। বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; কণা কণা বাষ্প লইয়া মেঘ; রেণু রেণু বালুকা লইয়া মরুভূমি; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র লইয়া ছায়াপথ; পরমাণু লইয়া এ অনন্ত বিশ্ব। একতাই মহত্ত্ব—মনুষ্যজাতি মহৎ। মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করায় মহত্ত্ব আছে—স্বীকার করি, ব্যক্তিমাত্রের ন্যায় জাতিমাত্রেরও ধ্বংস আছে। এরূপ প্রমাণ আছে যে, এ কাল পর্য্যন্ত অনেক প্রাচীন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং অনেক নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে

আমার ক্ষতি কি? যে দিন মনুষ্যজাতির লোপ হইবে, সে দিন আমিও তাহা দেখিতে থাকিব না, কেননা, আমিও মনুষ্য—মনুষ্যজাতির অন্তর্গত। কিন্তু কি যে বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গিয়াছি—

এইখানে আসিয়া সকল জিনিষের সমাধি হয়। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ—সব এই পথ দিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায়। এ সুখের স্থান। এইখানে শয়ন করিতে পারিলে শোকতাপ যায়, জ্বালাযন্ত্রণা ফুরায়, সকল দুঃখ দূর হয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—সকল দুঃখ দূর হয়। আবার তাও বলি, এ দুঃখের স্থান। এইখানে যে আগুন জ্বলে, তাহা এ জন্মে নিবে না। তাহাতে সৌন্দর্য্য পোড়ে, প্রেম পোড়ে, সরলতা পোড়ে, ব্রীড়া পোড়ে, যাহা পুড়িবার নয়, তাহাও পোড়ে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরের আশা, উৎসাহ, প্রফুল্লতা, সুখ, উচ্চাভিলাষ, মায়া—সব লুপ্ত হয়। তাই বলি, এ স্থান সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে,—যে চলিয়া যায়, তার সুখ; যে পড়িয়া থাকে, তার দুঃখ. এ সংসারেরই ঐ নিয়ম—সবই ভাল, সবই মন্দ। কুসুমে সৌরভ আছে, কণ্টকও আছে; মধুতে মিষ্টতা আছে, তীব্রতাও আছে; সূর্য্যরশ্মিতে প্রফুল্লতা আছে, রোগজনন-প্রবণতাও আছে; * রমণীর চক্ষে সৌন্দর্য্য আছে, সর্ব্বনাশও আছে; রমণীহৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রতারণাও আছে; ধনে ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যৌননির্ব্বাচনের প্রতিবন্ধকতাও করে। জগতে কোথাও নির্দ্দোষ কিছু দেখিতে পাইবে না। সকলই ভাল-মন্দ-মিশ্রিত। সুতরাং

* Sunstroke. See Tanner's Practice of Medicine, Vol. I.

প্রকৃতি দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যে আদি কারণ, সেও ভালমন্দতে মিশ্রিত; অথবা দুইটি শক্তি হইতে এ জগৎ সমুৎপন্ন—সেই শক্তির একটি ভাল, একটি মন্দ; একটি স্নেহ, একটি ঘৃণা; একটি অনুরাগ, একটি বিরাগ; একটি আকর্ষণ, অপরটি প্রতিক্ষেপ। কিন্তু কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি—

এই যে সংসার, ইহা এক মহাশ্মশান! চিরবহমান কালস্রোত দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পলকে পলকে, সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়া বিস্মৃতির গর্ভে ফেলিতেছে। পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে যাহা দেখিয়াছি, উপস্থিত মুহূর্ত্তে আর তাহা নাই—প্রাণ দিলেও আর ফিরিয়া আসিবে না। এইক্ষণে যাহা রহিয়াছে, পরক্ষণে আর তাহা থাকিবে না—অখিল সংসার খুঁজিয়া দেখিও, কোথাও পাইবে না। কোথায় যাইবে, কোথায় যায়, তাহা তুমিও যতদূর জান, আমিও ততদূর জানি, এবং তুমি আমি যাহা জানি, তাহার অধিক কেহই জানে না। সবই যায়, কিছুই থাকে না—থাকে কেবল কীর্ত্তি। কীর্ত্তি অক্ষয়। কালিদাস গিয়াছেন, শকুন্তলা আছে; সেক্সপীয়র গিয়াছেন, হ্যামলেট আছে; ওয়াসিংটন গিয়াছেন, আমেরিকার স্বাধীনতাধ্বজা আজও উড়িতেছে; রুশো গিয়াছেন, সাম্যের দুন্দুভিনাদ আজও পৃথিবী ভরিয়া ঘোষিত হইতেছে। কীর্ত্তি থাকে, অকীর্ত্তিও থাকে। লর্ড নর্থব্রুক যাবেন, কিন্তু লক্ষ্মী রাণীর চক্ষের জল শুকাইবে না, বরদার দুঃখশ্বাস মিলাইবে না। অকীর্ত্তিও থাকে। লোকের ভাল লোকের মন্দ, লোকের সঙ্গে চলিয়া যায়; কীর্ত্তি এবং অকীর্ত্তি জগতে বিচরণ করিতে থাকে। ওয়াসিংটনের স্বদেশানুরাগ

তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, সেক্ষপীয়রের চরিত্রদোষও তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা লোকের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার সৌরভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি—

"ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়—
পর উপকার সে লাভ।"

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব—ধর্ম্মের মূল ভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ-সোপান। কিন্তু কি বলিতেছিলাম?

—এই সংসার এক মহাশ্মশান। যে চিতানল ইহাতে গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিষ নাই। জড়প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না; যাহা সম্মুখে পড়ে, তাহাই পোড়াইয়া, সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে নক্ষত্রনিচয় অল্পান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ সকল এই বিশ্বব্যাপী মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র। এ সংসারে কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রিকায়, প্রফুল্ল মল্লিকায়, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মৃদুল পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না? ভালবাস, পুড়িতে হইবে; ভালবাসিও না, তদধিক পুড়িতে হইবে। পুত্রকন্যা না হইলে, শূন্য গৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে; হইলে, সংসার জ্বালায় পুড়িতে হইবে। শুদ্ধ মনুষ্য কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, যৌননির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, সামাজিক নির্ব্বাচনে পুড়িতেছে, পরস্পরের অত্যাচারে পুড়িতেছে। কে পোড়ে না? এ সংসারে আসিয়া সুস্থ-মনে, অক্ষত-শরীরে

কে গিয়াছে? আবার দুঃখের উপর দুঃখ এই যে, এ পাপ সংসারে সহৃদয়তা নাই, সহানুভূতি নাই, করুণা নাই। এই অনন্ত জীব-সমূহ এই মহাবহ্নিতে হাড়ে হাড়ে দগ্ধ হইতেছে;—জড়প্রকৃতি কেবল ব্যঙ্গ করে মাত্র। শশধরের সদা হাসি-হাসি মুখে কখনও কি বিষাদচিহ্ন দেখিয়াছ? নক্ষত্ররাজির সোহাগের মৃদু-কম্পনে কখনও কি হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়াছ? কল্লোলিনীর কল-নিনাদে কখনও কি স্বরবিকৃতি দেখিয়াছ? নবকুসুমিতা ব্রততীর দোলনীতে কখনও কি তালভঙ্গ দেখিয়াছ? আমরা পুড়িতেছি—কিন্তু ঐ দেখ, বৃক্ষরাজি করতালি দিয়া নাচিতেছে—ঐ শুন, সমীরণ হাসিতেছে—হো—হো—হো!

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।



সভ্যতা

আজি কালি যেখানে সেখানে সভ্যতা শব্দটী লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে। চলিত কথাবার্ত্তায়, সাময়িক পত্রিকায়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, ঐতিহাসিক বা দার্শনিক প্রবন্ধে ও বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শব্দের ছড়াছড়ি। ইহাতে মনে হইতে পারে যে, সভ্যতা কাহাকে বলে আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে দেখিবে অনেকেই সদুত্তর দিতে পারেন না; আর ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মত। কেহ কেহ ভাবেন যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা সভ্যতার চরম-সোপানে উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন ইংরেজেরাই সভ্যতার সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। কেহ আমাদিগের আচার-ব্যবহার সভ্যসমাজের উপযোগী জ্ঞান করেন; কেহ ইংরেজ-দিগের রীতিনীতির পক্ষপাতী। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, ইংরেজদিগের অনুকরণে আমাদিগের অবনতি হইবে; কেহ কেহ বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হন যে, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃন্ময় দীপের আলোকে লেখা-পড়া করি। শেষোক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা শুনিয়া বোধ হয়, তাঁহারা কলিকাতার লালবাজারের মদোন্মত্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধুতিচাদরপরা নিরামিষভোজী নির্ম্মলজলপায়ী সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকেও অসভ্য শ্রেণীতে স্থান দিতে চাহেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে এরূপ মতভেদ হইবার প্রথম কারণ এই যে, আমরা এক্ষণে দুইটী প্রতিকূল স্রোতের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা এবং (২) বিলাতি শিক্ষা। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে একদিকে লইয়া যাইতেছে; বিলাতি শিক্ষা আর এক দিকে। দেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে, এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতি-নীতি, চিরাগত আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-কাণ্ড উত্তম। বিলাতি শিক্ষা পদে পদে তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের অপেক্ষা ভাল বলিয়া পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও কর্ম্ম-কাণ্ড আমাদিগের সম্মুখে আদর্শস্বরূপ ধরিতেছে। দেশীয় শিক্ষা বলিতেছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালীন মহিমা পুরাতনপ্রণালীসম্ভূত। বিলাতি শিক্ষা বলিতেছে যে, পুরাতন পথ পরিত্যাগ না করিয়াই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, কেহ দেশীয় স্রোতে, কেহ বা বিলাতি স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন।

সভ্যতা সম্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, গূঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণবাচক কথা শুনিয়া প্রায়ই মানসপটে তদনুযায়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি উদিত হয় না; সুতরাং কথাটী সঙ্গতরূপে ব্যবহৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভুলাইয়া থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে "পবিত্র ধর্ম্মের" নামে ভূমণ্ডল প্লাবিত হইয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে "স্বাধীনতা"র পতাকা উড়াইয়া স্বেচ্ছাচারিতা ফ্রান্স প্রভৃতি কত দেশে রাজত্ব করিয়াছে। এই কারণেই অনেক সময়ে অসভ্য

জাতিদিগকে "সভ্য" করিবার ছলে তাহাদিগকে নির্ম্মূল বা দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ন্যায়, অন্যায়, সত্য, মিথ্যা, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম প্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ যে অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া বুঝে না, ইহা ইউনানি পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি সক্রেতিস্ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি তিনি ভূমণ্ডলে পুনরাগমন করিতে পারিতেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে, দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আথেন্স মহানগরীতে লোকে অর্থ না বুঝিয়া যেরূপ শব্দ প্রয়োগ করিত, এই উন্নতিগর্ব্বিত ঊনবিংশতি শতাব্দীতেও সভ্যতাভিমানী ব্যক্তিবর্গও সেইরূপ করিয়া থাকেন।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহার অর্থের আভাস কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়। ব্যুৎপত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যায় যে "পক্ষী" শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং "উরগ" বলিতে বুকের উপর ভর দিয়া চলে এমন কোন জন্তু বুঝায়। এই প্রণালীতে "সভ্যতা" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে, সমাজবাচক "সভা" শব্দ হইতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের অর্থ সামাজিকতা হইতেছে, অর্থাৎ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে যাহা কিছু তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গণনীয় হইতেছে।

কিন্তু কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জানিতে পারা যায় না। ব্যুৎপত্তি দেখিয়া জানা যায় যে "তৈল" বলিতে প্রথমে তিলের নির্য্যাস বুঝাইত; কিন্তু এক্ষণে আমরা সরিষার তৈল, বাদামের তৈল, মাষ তৈল ইত্যাকার অনেক প্রকার কথা ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং প্রচলিত প্রয়োগে তৈল বলিতে কেবল তিলের নির্য্যাস না বুঝাইয়া নানা-

প্রকার নির্য্যাস বুঝাইতেছে। এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিতে গেলে "অম্লজান" শব্দে যে বায়ুর সংযোগে অম্ল উৎপাদিত হয় সেই বায়ুকে বুঝায়। আদৌ রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই অর্থেই "অম্লজান" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে পরীক্ষা-দ্বারা জানা গিয়াছে যে এমন অনেক অম্ল আছে যাহাতে উক্ত অম্লজান বায়ু নাই। সুতরাং এখন আর ব্যুৎপত্তি দেখিয়া "অম্লজান" শব্দের প্রচলিত অর্থ জানা যায় না। এই প্রকার দোহনবোধক দুহ্ ধাতু হইতে দুহিতা শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, গৃহে গাভীদোহন যাহার কার্য্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎপত্তি-অনুসারে যে পালন করে সেই পিতা। এরূপ হইলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ বহুসন্তানসত্ত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন।

এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভ্য ও অসভ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগকে আমরা অসভ্যজাতি বলি তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সভ্যনামপ্রাপ্ত জাতিদিগের তুলনা করি, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, অসভ্যজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ভ্রমণশীল অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি; সভ্যজাতিগণ বহুসংখ্যক লোকে একত্র হইয়া গ্রামে ও নগরে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহে অবস্থিতি করেন। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের বাহুল্য। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব-স্ব-প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপলক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং অনেকে একত্র হইয়া থাকিতে ভাল বাসে না; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাপ্রবৃত্তি বলবতী,

পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য-সাধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়া থাকে। অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা-জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল-বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং প্রত্যেকের স্বত্বরক্ষা-জন্য আইন, আদালত বা রাজশাসন নাই; সভ্যজাতিদিগের মধ্যে স্ব স্ব শরীর ও সম্পত্তি-রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি অপেক্ষা সামাজিক শাসনের সহায়তা অবলম্বন করে।

পৃথিবীতে এমন অসভ্যজাতি অল্প, যাহাদিগের মধ্যে সমাজ-বন্ধনের সূত্রপাতমাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমণ্ডলে এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, যাঁহারা সামাজিক অবস্থার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে, সামাজিক ভাবের তাবতম্যানুসারেই অনেক পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি বুঝায়, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গকে এক শাসনসূত্রে আবদ্ধ রাখিতে পারে, এমন একটী নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। যাহাতে একের সুখ তাহাতে অন্যের দুঃখ। এইরূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকলের বিবাদভঞ্জন করিতে পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে পারে এবং কাহাকে আজ্ঞা-পালনে পরাঙ্মুখ দেখিলে উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারে, কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সমাজবন্ধনের মূলে রাজার হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে। কিন্তু যত সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ম্ম, রীতি ও নীতিসম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক-

সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেষে প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বপ্রকৃতিমণ্ডলীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজমধ্যে কার্য্যবিভাগ আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার প্রয়োজনমত সমুদয় কার্য্য করে। একই ব্যক্তি সূত্রধার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, গৃহনির্ম্মাতা, ইত্যাদি। ইহাতে কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না, কোন দিকে উন্নতি হয় না। যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য পড়ে, প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপ মনোযোগ দিতে পারে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা ও কৌশল দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে পারে। এইরূপে পরস্পর-সাপেক্ষতাগুণে কার্য্যবিভাগ-দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের উপকার সাধিত হয়। অতি প্রাচীন কালেই সামাজিক কার্য্যবিভাগ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে এইরূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়। ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মের চর্চ্চা করিবেন। ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশরক্ষা করিবেন। বৈশ্য বা বণিক্ বাণিজ্য ও কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। শূদ্র বা দাস অন্য শ্রেণীর লোকের সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। কিন্তু এ গুলিও কেবল মোটামুটি বিভাগ। ভারতবর্ষে যে সকল মিশ্রবর্ণ জন্মিল, তাহাদিগেরও পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্মকার, তন্তুবায় বস্ত্রবয়নব্যবসায়ী ইত্যাদি। এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেষ উপকার হয়।

যে যাহা শিখিত আপন সন্তান-সন্ততিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শিখাইত। ইহাতে এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু যখন শ্রেণীবন্ধন এরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল যে, এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা থাকিল না, তখন তিনটী অপকার ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ অপেক্ষা আপন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল; (২) অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত হওয়ায় কোন শ্রেণীতে নূতন বল বা প্রতিভা প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল; (৩) যে ব্যক্তি স্বশ্রেণীর ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার পায়ে শৃঙ্খল পড়িল। এইরূপে যে সামাজিক পরস্পর-সাপেক্ষতার গুণে কার্য্য-বিভাগ-প্রণালীর সৃষ্টি, পরিণামে তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইল। ঈদৃশ গৃহবিচ্ছেদপূর্ণ সমাজ যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভারতবর্ষ এবং মিসরই ইহার সুন্দর দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়তঃ, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়-জ্ঞাপনার্থে একটী সাধারণ ভাষা থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি একাকী বনে বনে ভ্রমণ করে, তরুলতা-পশুপক্ষী যাহার সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই। কোকিলের কূজন শুনিয়া সে আনন্দে কুহুরব করে, করুক। নিঃশব্দে বসন্ত-বিহগের গীত শ্রবণ করিলেও তাহার ক্ষতি নাই। সমীরণ-প্রভাবে মহীরুহব্যূহের স্বনন শুনিয়া তদনুকরণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়, হউক। নীরব ভাবুক হইলেও তাহার হানি নাই। কিন্তু মনুষ্যসমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে না। পদে পদে অন্যের

সাহায্য লইতে হয়। যাহা মনে আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলে কিরূপে সাহায্য মিলিবে? যে যে বস্তুতে যাহার প্রয়োজন আছে, সে সে বস্তুর অক্ষয়ভাণ্ডার তাহার থাকা অসম্ভব। সুতরাং অন্যের নিকটে অভাবপূরণার্থে মনের কথা বলিতে হয়। আবার ভাবিয়া দেখ, আমরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎসাহ, প্রশ্রয়, প্রশংসা চাই; বাক্য-দ্বারাই এ সকল ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়। যদি অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালন-দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে মনের ভাব অপর লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়, সত্য। কিন্তু এরূপ সঙ্কেত অতি অল্প বিষয়েই খাটে। ভাষার সাহায্যে মনের ভাব যে প্রকার পরিস্ফুটরূপে বিজ্ঞাপিত হইতে পারে, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্য-সকল উত্তরকালবর্ত্তী লোকের জ্ঞানগোচর হইয়া সামাজিক উন্নতি সংসাধন করে।

চতুর্থতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রকাশ করা অভ্যাস চাই। অন্যের দোষমার্জ্জনা করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু অনেকে একত্র থাকিতে হইলে অনেক অপরাধ সহ্য করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এই প্রকার শিক্ষার অভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি সামান্য কারণে নরহত্যা হয়। দোষীকে ক্ষমা করা যেরূপ একটী সামাজিক গুণ, বিপন্নকে সাহায্য করাও তদ্রূপ আর একটী। ঘটনাসূত্রে কত লোক বিপত্তি-জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হইয়া তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্নশীল হইলেই সামাজিক পরস্পর-সাপেক্ষতানুযায়ী

কার্য্য করা হয়। এই প্রকার সহায়তা-লাভ-প্রত্যাশাই সমাজ বন্ধনের মূল।

পঞ্চমতঃ, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একতা চাই; একজনের বা এক অঙ্গের দুঃখে অন্য সকলের দুঃখিত হওয়া চাই, এবং সমাজরক্ষা-জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে সকলেরই প্রস্তুত হওয়া চাই। এরূপ যেখানে নাই, সেখানে সমাজ বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে না। গ্রীস ও রোমে বহুসংখ্যক দাস ছিল। দাসদিগের দুঃখে রাজপুরুষদিগের দুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল না। আমাদিগের বিবেচনায় ইহাই গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারণ। আর আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ ও মিসরে জাতিভেদ-সংস্থাপন-নিবন্ধন একতাহ্রাস তত্তদ্দেশের স্বাতন্ত্র্যবিলোপের মুখ্য হেতু।

কোন জাতিই অদ্যাপি সামাজিক অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে নাই। উক্ত সোপানে উঠিলে সমাজের নূতন আকার হইবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই পরোপকারার্থ জীবনধারণ করিবেন, আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্য্যে দেহমন সমর্পণ করিবেন। তখন স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, সর্ব্বত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপচিকীর্ষা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে। কবিগণ কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়াছেন। খ্রীষ্টভক্ত দূরে এই "মিলেনিয়ম" দেখেন; দেখেন যে সমুদয় মনুষ্যজাতি ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক-পরিবারভুক্ত হইয়াছে এবং অস্ত্রশস্ত্র ভাঙ্গিয়া হল প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশীয় শাস্ত্রকারগণ দিব্যচক্ষে কলির অবসানে এই প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে পান। দর্শনবিৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া

অনুমান করেন যে, সমাজের উন্নতিসহকারে সর্ব্বহিতকরী নিঃস্বার্থ-প্রবৃত্তিনিচয় নৈসর্গিক নির্ব্বাচন-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় সময় উপস্থিত করিবে। কিন্তু এখনও এ সকল বহুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূরবর্ত্তী নীহারিকাবৎ সামান্যদৃষ্টিপথের অতীত। এখনও সংসার স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে, এখনকার সুসভ্য ভদ্রলোক হয়ত নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার হয়, এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্যের সভ্যতা বলিতে কেবল সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র বুঝায় না; যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য জীবকুলশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞানের উন্নতিও বুঝায়। জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি; এ সকল কি গ্রীস, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি মিসর, কি কাল্ডিয়া,—কি ফ্রান্স, কি জর্ম্মণী, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, যেখানে দৃষ্ট হউক, সেইখানেই আমরা সভ্যতার আবির্ভাব স্বীকার করিব। বাল্মীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র,—গৌতম, অরিস্ততল বা বেকন—আর্য্যভট, টলেমি বা নিউটন,—যেখানে সমুদিত, সেখানে সভ্যতা সপ্রমাণ করিতে অন্য সাক্ষী চাই না।

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজো বুঝিয়াছিলেন যে, সভ্যতা বলিতে কেবল "সামাজিক সম্বন্ধ-বর্দ্ধনই" বুঝায় না, মনুষ্যের উৎকৃষ্ট বৃত্তিসকলের উন্নতিসাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও

যে সকল দেশ সভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন :

"যদিও সমাজ অন্য স্থানের অপেক্ষা অসম্পূর্ণ, তথাপি মনুষ্যত্ব অধিকতর মহিমা ও প্রভাব-সহকারে বিরাজমান। অনেক সামাজিক অধিকার-বিস্তার বাকি আছে, কিন্তু আশ্চর্য্যরূপ নৈতিক ও বৌদ্ধিক অধিকার-বিস্তার ঘটিয়াছে; বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও স্বত্ব নাই, কিন্তু অনেক বড় লোক জগতের নয়নপথে জাজ্বল্যমান বিরাজিত। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প তাহাদিগের প্রভা বিকাশ করিতেছে। যেখানে মনুষ্যজাতি মানবপ্রকৃতির ঈদৃশ মহিমপ্রদ এই সকল মূর্ত্তির সমুজ্জ্বল আবির্ভাব দর্শন করে, যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পায়, সেইখানেই সভ্যতার পরিচয় পাইয়া তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করে।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।



রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

হল্‌দীঘাটার যুদ্ধ

তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদিকে অসহ্য অবমাননার প্রতিশোধ-বাঞ্ছা, অপরদিকে শিশোদিয়া-কুলের চিরস্বাধীনতা-রক্ষার স্থির-প্রতিজ্ঞা। একদিকে মোগল ও অম্বরের অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্য, অপরদিকে মেওয়ারের অতুল ও অপরিসীম বীরত্ব।

হল্‌দীঘাটার উপত্যকায় ও উভয় পার্শ্বের পর্ব্বতের উপর দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত সজ্জিত রহিয়াছে, দলে দলে যোদ্ধগণ আপন আপন কুলাধিপতির চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া অপূর্ব্ব রণ দিতেছে; কখনও বা দূর হইতে তীর বা বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে, কখনও বা কুলাধিপতির ইঙ্গিতে বর্ষাকালের তরঙ্গের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া ছারখার করিতেছে।

পর্ব্বত-শিখরের উপর অসভ্য জাতিগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বর্ষার বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করিতেছে, অথবা সুবিধা পাইলেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড শত্রুসৈন্যের উপর গড়াইয়া দিতেছে।

অদ্য তুমুল উৎসবের দিন, সে উৎসবে কেহ পরাঙ্মুখ হইল না; চোহান ও রাঠোর, ঝালা, চন্দায়ৎ ও গাওয়ৎ—সকল কুলের যোদ্ধগণ ভীষণনাদে শত্রুর উপর পড়িতে লাগিল। এক দল হত হয়, অন্য দল অগ্রসর হয়; অসংখ্য সৈন্যের শবরাশির উপর দিয়া অসংখ্য সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সৈন্যের বিরুদ্ধে এ বীরত্ব কি করিবে? দিল্লীর ভীষণ কামানশ্রেণী হইতে ঘন ঘন মৃত্যুর আদেশ বহির্গত হইতে লাগিল, দলে দলে রাজপুতগণ আসিয়া জীবনদান করিল।

এই বিঘোর উৎসবে প্রতাপসিংহ পশ্চাতে ছিলেন না। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে অম্বরাধিপতির দিকে তিনি ধাবমান হইলেন, কিন্তু দিল্লীর অসংখ্য সেনা ভেদ করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না।

তৎপরে প্রতাপসিংহ, সলীম যথায় হস্তী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই দিকে নিজ অশ্ব ধাবমান করিলেন। এবার ভীষণনাদে রাজপুতগণ মোগলসৈন্য বিদীর্ণ করিয়া অগ্রসর হইল। স্তরে স্তরে মোগলসৈন্য সজ্জিত ছিল, কিন্তু বর্ষাকালের পর্ব্বত-তরঙ্গের ন্যায় সমস্ত প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইলেন, বর্শা ও অসির আঘাতে মোগলদিগের সৈন্যরেখা লণ্ডভণ্ড করিয়া অগ্রসর হইলেন। সলীম ও প্রতাপসিংহ সম্মুখীন হইলেন।

দুই পক্ষের প্রসিদ্ধ যোদ্ধগণ নিজ নিজ প্রভুর রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন। অচিরে যে তুমুল হত্যাকাণ্ড, যে গগনভেদী জয়নাদ ও আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। রাজপুত ও মোগলদিগের বিভিন্নতা রহিল না, শত্রু ও মিত্রের বিভিন্নতা রহিল না। দুই পক্ষের পতাকার চারিদিকে শব রাশীকৃত হইল।

প্রতাপের অব্যর্থ খড়্গাঘাতে সলীমের রক্ষকগণ ভূতলশায়ী হইল। তখন প্রতাপ সলীমকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘ বর্শা নিক্ষেপ করিলেন, হাওদার লৌহে সেই বর্শা প্রতিরুদ্ধ হওয়ায় সলীম সেদিন জীবনরক্ষা পাইলেন। রোষে তর্জ্জন করিয়া প্রতাপ অশ্ব ধাবমান

করাইলেন, অশ্ববর চৈতকও প্রতাপের যোগ্য, লম্ফ দিয়া হস্তীর শরীরের উপর সম্মুখ-পদ স্থাপন করিল। প্রতাপের অব্যর্থ আঘাতে হস্তীর মাহুত হত হইল। হস্তী তখন প্রভুর বিপদ্ জানিয়াই যেন সলীমকে লইয়া পলায়ন করিল। তুমুল শব্দে দুর্দ্দমনীয় প্রতাপসিংহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ পশ্চাদ্ধাবন করিলেন; মোগলসৈন্যের শ্রেণী বিদীর্ণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহের সে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া হিন্দুগণ অর্জ্জুনের কথা স্মরণ করিল, মুসলমানগণ মুহূর্ত্তের জন্য মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তখন মুসলমানগণ নিজের বিপদ্ দেখিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। মুসলমান যোদ্ধগণ ভীরু নহে, পঞ্চশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছে, অদ্য হিন্দুর নিকট অবমাননা স্বীকার করিবে না। একবার "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিয়া প্রতাপকে চারিদিকে বেষ্টন করিল। রাজপুতগণ পলায়ন জানে না, প্রভুর চারিদিকে হত হইতে লাগিল। শরীরের সপ্তস্থানে আহত হইয়াও প্রতাপ বিপদ্ জানেন না, তখনও অগ্রসর হইতেছেন।

পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন রাজপুত যোদ্ধা মহারাণার বিপদ্ দেখিলেন এবং হুঙ্কার শব্দ করিয়া শিশোদিয়ার পতাকা লইয়া অগ্রসর হইলেন। পতাকা দেখিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, প্রতাপ যে স্থানে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইল, সবলে প্রভুকে সেই নিশ্চয়-মৃত্যু হইতে সরাইয়া আনিল। সে উদ্যমে শত রাজপুত প্রাণদান করিল।

পুনরায় প্রতাপসিংহ যুদ্ধমদে সংজ্ঞা হারাইয়া মোগলরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। পুনরায় তাঁহার রাজচ্ছত্র শত্রুবেষ্টিত

দেখিয়া রাজপুতগণ পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইয়া সমরোন্মত্ত বীরকে নিশ্চয়-মৃত্যুর কবল হইতে সবলে উদ্ধার করিয়া আনিল।

কিন্তু প্রতাপসিংহ অশ্ব ক্ষিপ্ত-উন্মত্ত! জ্ঞানশূন্য হইয়া তৃতীয় বার মোগলসৈন্যরেখার ভিতর প্রবেশ করিলেন। এবার মোগলগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইল, রোষে হুঙ্কার করিয়া শত শত সেনা প্রতাপকে বেষ্টন করিল। প্রতাপের বহির্গমনের পথ রাখিল না। এবার মোগলগণ এই কাফের বীরকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের কণ্টকোদ্ধার করিবে, মানসিংহের অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

পশ্চাতে রাজপুতগণ মহারাণার বিপদ্ দেখিয়া বার বার তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিল; কিন্তু মোগলসৈন্য অসংখ্য, রাজপুতদিগের প্রধান প্রধান বীর হত হইয়াছে, রাজপুতগণ হীনবল হইয়াছে, এবার প্রভুর উদ্ধার অসম্ভব।

বার বার দলে দলে রাজপুতগণ প্রভুর উদ্ধার-চেষ্টা করিল, দলে দলে কেবল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া আপনারা বিনষ্ট হইল, মোগলরেখা অতিক্রম করিতে পারিল না, এবার প্রভুর উদ্ধার করিতে পারিল না।

দূর হইতে দৈলওয়ারার অধিপতি এই ব্যাপার দেখিলেন; মুহূর্তের জন্য ইষ্টদেবতা স্মরণ করিলেন, পরে আপনার ঝালাবংশীয় যোদ্ধা লইয়া সম্মুখে ধাবমান হইলেন। মেওয়ারের কেতন স্বুবর্ণ-সূর্য্য একজন সৈনিকের হস্ত হইতে আপনি লইলেন এবং মহা কোলাহলে সেই কেতন লইয়া ঝালাকুলের সহিত অগ্রসর হইলেন।

সে তেজ মোগলগণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না, বীর দৈলওয়ারাপতি শত্রুরেখা বিদীর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝালাকুল,

যথায় প্রতাপ উন্মত্ত রণকুঞ্জরের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছিলেন, তথায় উল্লাসরবে উপস্থিত হইলেন। সবলে প্রভুকে রক্ষা করিলেন, প্রতাপকে সেই শত্রুরেখা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিলেন ও সেই উদ্যমে সম্মুখরণে আপনার প্রাণদান করিলেন।

পতনশীল দেহের দিকে চাহিয়া মহানুভব প্রতাপ বলিলেন, "দৈলওয়ারা! অদ্য আপনার জীবন দিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ।" দৈলওয়ারা ক্ষীণস্বরে উত্তর করিলেন, "ঝালা স্বামিধর্ম্ম জানে, বিপৎকালে মহারাণার পার্শ্ব ত্যাগ করে না।"

প্রতাপসিংহ স্মরণ করিলেন, ফাল্গুন মাসের শেষদিন রজনীতে দৈলওয়ারাপতি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। দৈলওয়ারাপতির জীবনশূন্য দেহ ভূতলে পড়িল।

দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুত যোদ্ধার মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র সে দিন ভূতলশায়ী হইল, অবশিষ্ট আট সহস্র মাত্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিল। প্রতাপসিংহ অগত্যা হল্‌দীঘাটার যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। মোগলগণ জয়লাভ করিল, কিন্তু সে যুদ্ধকথা সহসা বিস্মৃত হইল না। বহুবৎসর পরে দিল্লীতে, দাক্ষিণাত্যে বা বঙ্গদেশে প্রাচীন যোদ্ধগণ যুবক সেনাদিগের নিকট হল্‌দীঘাটা ও প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর গল্প বলিয়া রজনী অতিবাহিত করিত।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

বিদ্যাসাগর

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি সুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মাননীয় পণ্ডিতের যশ শুধু বাঙ্গালার মধ্যেই আবদ্ধ নহে; উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রধান কর্ম্মবীর বলিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত। সার সেসিল বিডনের বন্ধু ও ড্রিন্‌কৃওয়াটার বেথুনের সহযোগী এই উন্নতমনা বাঙ্গালীর মহৎ চরিত্র ও কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করেন নাই, এরূপ ইংরাজ তৎকালে অতি অল্পই ছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই অতি উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ইংরাজ-রাজত্ব ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এদেশে নব আশা, নূতন ভাব ও নূতন উদ্যমের সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্যে ইহার পরিচয়।

এই দুই কর্ম্মবীরের জীবনের কতিপয় প্রধান ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার-সম্বন্ধীয় তাঁহার চূড়ান্ত কার্য্য ব্রাহ্মসমাজ বা একেশ্বরবাদী হিন্দুসমাজ স্থাপন করেন; পর বৎসর বালক ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার

জীবনের কার্য্যোপযোগী বিদ্যাশিক্ষার্থ জন্মস্থান হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন, ইহার কয়েক বৎসর পরেই ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন সমাপনান্তে দক্ষতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বিদ্যাসাগর' এই উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে যে সকল অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতি এদেশীয় ভাষাসকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে একুশ বৎসর বয়সে ইহার প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এই পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌভাগ্য-গৌরব সূচিত হয়। ইতিপূর্ব্বে তিনি অতি অল্পই ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ে প্রয়োজনবশতঃ তাঁহার উত্তমরূপে ইংরাজি ভাষা শিখিবার বাসনা বলবতী হয়। তিনি সমবয়স্ক ও একাগ্রচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর সহিত ইংরাজি শিক্ষা করেন। এই রাজনারায়ণবাবু পরে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের এই অংশ কতকগুলি বিশেষ গুরুতর ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয়। তাঁহাকে এই সময়ে কতিপয় বিশিষ্ট ইংরাজ ও কয়েকজন দেশীয় কর্ম্মবীরের সংস্পর্শে আসিতে হয়। তাঁহারই সাহায্যে অল্পবয়স্ক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়েই তিনি হিন্দুসমাজের তৎকালীন নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নিকট পরিচিত

হন ও এই সময়েই অসাধারণ প্রতিভাশালী অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসরের মধ্যে যখন বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে এক শত একটি 'হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়' স্থাপিত হইল, তখন সেই সমুদয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-নির্ব্বাচনের ভার মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল। এই প্রভূত ক্ষমতার পরিচালনে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার উপর যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল, তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহার সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া সুযোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চ পদলাভে সাহায্য করিতেন, তাহার একটি সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, মার্শাল সাহেবের সুপারিশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। ঐ পদের বেতন ৯০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে ৫০৲ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ-গ্রহণে অসম্মত হন ; কারণ তাঁহার বিবেচনায় প্রসিদ্ধ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় যোগ্যতর ব্যক্তি বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ই ঐ পদে মনোনীত হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে কলিকাতা হইতে কালনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় অতিশয় বিস্মিত ও

চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে বলিয়াছিলেন, "ধন্য বিদ্যাসাগর! তুমি মানুষ নও, তুমি মনুষ্যাকারে দেবতা!"

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ শূন্য হয়। তখন খ্যাতনামা বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ উদ্যমের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদকের পদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিতে তিনি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করেন। বেতন বৃদ্ধি করা হইল না বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদে মনোনীত হইলেন। ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী-সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। সংস্কার-সম্বন্ধীয় তাঁহার কঠোর ব্যবস্থাসকল দেখিয়া রসময়বাবু পর্য্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাঁহার কতিপয় প্রস্তাব অনুমোদিত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিয়া কিছুদিনের জন্য কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার-সম্বন্ধীয় একটি বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। রসময়বাবু দেখিলেন, এক্ষণে তাঁহার পদত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর। তখন সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ এক হইয়া প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামত সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কারে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর মাত্র। তিনি

বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত জমিদারগণের দ্বারা বন্ধুরূপে পরিগণিত হইলেন। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এই নূতন সহযোগীকে পাইয়া আনন্দসহকারে ইঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। যে সকল সহৃদয় ইংরাজ ভারতের উন্নতি-কল্পে ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহারা একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাইলেন। তিনি এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষাপ্রচলনে মন, প্রাণ সমর্পণ করেন এবং এতৎ-সম্বন্ধে মহানুভব বেথুন সাহেবকে অনেক সাহায্য করেন। বঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যার ফ্রেড্‌রিক হ্যালিডে সাহেব তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর বেথুন স্কুল নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন এ দেশে বাঙ্গালা ও ইংরাজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা গবর্নমেণ্টের অভিপ্রেত হয়, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখেন। এই রিপোর্ট-পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ২০০৲ টাকা বেতনে হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলাসমূহের একজন বিশেষ ইনস্পেক্টাররূপে নিযুক্ত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন ৩০০৲ টাকাও পাইতেন। তিনি ঐ চারিটি জেলায় বালকবালিকাগণের জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময়ে তাঁহাকে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের কার্য্যেরও তত্ত্বাবধান করিতে হইত। তাঁহার একান্ত অনুরোধে অক্ষয়কুমার দত্ত নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-চর্চ্চায় বিরত হন নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বাঙ্গালা

'শকুন্তলা' প্রকাশিত হইল। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক 'সীতার বনবাস' প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ঋণী।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষা তেজোময়ী ও ভাবপ্রকাশক হইলেও অতীব জটিল ও দুর্ব্বোধ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার-বাবুই যে আধুনিক মনোহারী বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের স্থষ্টিকর্ত্তা, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত করা হয় না। যে সকল ইংরাজ লেখক রাজ্ঞী অ্যানের সময়ে ইংরাজি গদ্যকে বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালিয়া ভাষার স্রোত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়কুমার স্বদেশীয় সাহিত্য-সেবা-বিষয়ে তুলনায় সমকক্ষ।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি গুরুতর কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই বহুশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করিলেন যে, শাস্ত্রে হিন্দু-বিধবাদিগের চির-বৈধব্য-বিধি নাই এবং বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার প্রত্যেক নগরে এবং প্রত্যেক গ্রামে তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দাশরথি রায় এই নব্য সমাজ-সংস্কারককে ব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে উৎসবাদি-উপলক্ষে বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গান গীত হইতে লাগিল। শান্তিপুরের তন্তুবায়েরা স্ত্রীলোকদিগের শাড়ীর পাড়ে এই সম্বন্ধে গান বুনিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরে ঘরে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মুখে কেবল এই কথা। অতঃপর এই সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব স্বয়ং গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন।

এই প্রবল ঝটিকার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অচল ও অটল। বিরুদ্ধ-মতসকল খণ্ডন করিয়া তিনি আর একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে তিনি যেরূপ প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুন্দর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই আন্দোলন প্রায় একরূপ বন্ধ হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে নিজমতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পর পুনর্বিবাহিত হিন্দুবিধবাগণের সন্তানসন্ততিকে আইনসম্মত উত্তরাধিকারী করিবার জন্য গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়ক আইন পাস হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড ক্যানিং কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ৩৯ জন মাত্র। তন্মধ্যে কেবল ৬ জন এ দেশীয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শিক্ষাবিভাগের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া আসিল। এডুকেশন কাউন্সিলের স্থানে ডাইরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন পদের সৃষ্টি হইল ও গর্ডন ইয়ং সাহেব প্রথম ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইলেন। ইনি একজন নবীন ও অল্পদর্শী কর্ম্মচারী। এ স্থলে সেই পুরাতন নিয়মানুযায়ী ব্যবস্থাই হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী-সংস্কারক, বাঙ্গালা শিক্ষার জন্মদাতা, স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তনকারী, একাগ্রচিত্ত সংস্কারক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবক, তথাপি স্বদেশের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিল না। কারণ তিনি এ দেশীয়।

আবার যিনি তাঁহার উপরে নিযুক্ত হইলেন, সেই গর্ডন ইয়ং সাহেব তাঁহার গুণগ্রহণে সমর্থ হইলেন না, পরন্তু তাঁহার সহিত বিশেষ ভাল ব্যবহারও করিতেন না, এরূপ শুনা যায়। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে তিনি গবর্নমেণ্টের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। তাঁহার এত দিনের কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি কোনরূপ পেন্‌সন বা পুরস্কারও পাইলেন না। তাঁহার কর্ম্মত্যাগ মঞ্জুর করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর গবর্নমেণ্ট যে পত্র লিখেন, তাহার শেষে লেখা ছিল, দেশীয় শিক্ষার জন্য তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা গবর্নমেণ্ট স্বীকার করিতেছেন।

ইহা অবশ্য অতিশয় সুখের বিষয় যে, এই কর্ম্মত্যাগের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপর অপর কার্য্যে দানশীলতার সুবিধা হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যত দিন না বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সাধারণে বুঝিয়াছিল, ততদিন সাহিত্যিক হিসাবে বাঙ্গালায় তাঁহার সমকক্ষ অপর কেহই ছিল না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল পরোপকারী এবং আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনকারী মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্থান। তাঁহার পুস্তকের প্রভূত আয় আর্ত্ত ও দরিদ্রদিগের দুঃখ দূর করিতে ব্যয়িত হইত, শত শত দরিদ্র-বিধবা জীবিকার জন্য ও শত শত অনাথ বালক শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তাঁহার নাম-কীর্ত্তন হইত, কি ধনী—কি দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে সমভাবে ভালবাসিত।

যাঁহারা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাও

ইঁহাকে ইঁহার সহযোগীদের ন্যায় মান্য করিতেন। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জমিদারগণ এই শ্রদ্ধাস্পদ, সরল, অসম-সাহসী ও অসীম-দয়াবান্ পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়া আনন্দিত হইতেন। তৎকালীন ছোটলাট স্যার সেসিল বিডন এই অবসরপ্রাপ্ত, শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী পণ্ডিতের সহিত প্রায়ই পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত এবং তাঁহার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর আমি তাঁহার সহিত পত্র-ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগের কার্য্য-সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের উল্লেখ করিতে তিনি তখনও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেন। তিনি যাঁহাদিগের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তখনকার দিনে এক এক জন কর্ম্মবীর। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মধুসূদন দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই এই তালিকাভুক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় কার্য্যের ইতিহাস আশার শুভ্র আলোকে সমুজ্জ্বল এবং ইহার সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মভাবে জড়িত।

আমি প্রায়ই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাতভ্রমণের সঙ্গী হইতাম এবং কখনও কখনও তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতাম ; তখন আমি তাঁহার সংগৃহীত ইংরাজি ও সংস্কৃত পুস্তকরাশি দেখিবার অনুমতি পাইতাম। তাঁহার কথাবার্ত্তায় তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্পই শুনা যাইত এবং

তাঁহার সরস রসিকতা তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল।

আমি যখন আমার কর্ম্মস্থলে পুস্তকালয় স্থাপন করিলাম, তখন তিনি প্রায়ই স্বরচিত পুস্তকাবলী আমাকে প্রেরণ করিতেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন আমি প্রতিবাদের ভীষণ ঝটিকার মধ্যে ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, তখন মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় আমায় বিশেষরূপে সাহায্য করেন।

এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি প্রায়ই কলিকাতা ছাড়িয়া কর্ম্মাটারের বাটীতে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতেন। তথায় সরল গ্রামবাসিগণ দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত এবং তিনি তাহাদের বিপদে-আপদে সর্ব্বদাই সাহায্য করিতেন; তিনি এই দরিদ্রদিগের মধ্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার দয়ায় ইহারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে সকলই ফুরাইল, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী আমাদের ছাড়িয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

অশ্রু

"Sweet tears, the awful language eloquent
Of infinite affection far too big
For words,"

তোমার ঐ মণিমুক্তার মোহন-মালা দূরে রাখ; আমি একবার নয়ন ভরিয়া মনুষ্যের নয়ন-বিলম্বিনী অশ্রুমালা নিরীক্ষণ করিয়া লই। মণিমুক্তা পরিণামে পৃথিবীর ধূলি-সমান; বালক, বণিক্ কিংবা বিনোদ-ভাব-বিহ্বলা অবলা ভিন্ন আর কাহারও কাছে উহার মূল্য নাই। অশ্রুমালা দ্রবীভূত মনুষ্যহৃদয়ের সজীব ধারা; পৃথিবীর কোন বস্তুর সহিতই উহার তুলনা নাই।

এই সংসার-মরুতে মনুষ্যহৃদয়ের অবলম্ব কি?—মনুষ্যহৃদয়। মানুষী তৃষ্ণার তৃপ্তিস্থল কোথায়?—মনুষ্যহৃদয়ে। হৃদয় যদি হৃদয়কে সম্ভাষণ করিয়া প্রতিসম্ভাষণে প্রীত, আশ্বস্ত ও পরিতৃপ্ত না হয় তাহা হইলে কে এই শূন্যসংসারে ইচ্ছাসহকারে জীবন ধারণ করে? হৃদয় যদি হৃদয়ের উপর ভর করিয়া প্রতিনির্ভরে প্রাণ-বল না পায়, তাহা হইলে কে এই দগ্ধ শ্মশানে অস্থি-সংগ্রহের জন্য পড়িয়া থাকিতে সম্মত হয়? হৃদয় যদি প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে আত্ম-দান করিয়া প্রতিদানে হৃদয় না পায়, তাহা হইলে কে এই তিমিরান্ধ-ভুবনে ভবলীলার নট-নৈপুণ্য-শিক্ষার জন্য বন্দী রহিতে পারে? রাজার প্রাসাদ, বুভুক্ষু ভিখারীর পর্ণকুটীর, যোগীর তপোবন, বিয়োগীর নিভৃত-কানন, পুণ্যাত্মার শান্তিনিকেতন,

প্রমোদীর বিলাস-ভবন,—ইহার সর্ব্বত্রই মনুষ্যের আশ্রয়স্থান মনুষ্য-হৃদয়। কবিতা মনুষ্যহৃদয়েরই প্রীণনের জন্য ফুলের মধু, লতার মাধুরী এবং এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সারভূত সৌন্দর্য্য-সুধা পক্ষিণীর ন্যায় চঞ্চুপুটে সঞ্চয়ন করিয়া নিত্য আনিয়া উপহার যোগাইতেছে। চিন্তা হৃদয়েরই ক্ষুন্নিবৃত্তি ও প্রকৃত পুষ্টির জন্য, আকাশে উড্ডীন হইয়া, সাগরে ডুব দিয়া এবং ভূ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়া সুস্বাদ ও সুভক্ষ্য ফল চয়ন করিতেছে। উদ্দীপনাও হৃদয়েরই উদ্বোধনের জন্য, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরা এবং প্রতপ্ত তাড়িত প্রবাহ উন্মাদিনীর মত ঢালিয়া দিতেছে। ফলতঃ, হৃদয় না থাকিলে এই জগতে কাহার জন্য কে ? বুদ্ধি জ্ঞান দান করিতে পারে ; বিবেক নির্ম্মল-চেতা নির্ভীক সুহৃজ্জনের ন্যায় নীতির দুর্গম-পথ প্রদর্শন করিতে পারে ;—কিন্তু তৃষ্ণায় তৃপ্তি দান করিতে, জ্বালা ও বেদনায় শান্তি দিতে, এবং শান্তি যখন আশাতীত ও অসম্ভব হয়, তখন সহানুভূতির অমৃতস্পর্শে প্রাণ জুড়াইতে মানবজগতে একমাত্র বস্তু মনুষ্যহৃদয়। অশ্রুধারা সেই মনুষ্যহৃদয়ের জীবনময়ী নির্ঝরিণী। উহা কখনও ধীরে বহে, কখনও বেগে প্রবাহিত হয়, কখনও বা নিশার শিশিরবিন্দুর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঝরিতে থাকে। কিন্তু যেই মনুষ্য উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, অমনি তাহার হৃদয় অন্তরতম স্থলে স্পৃষ্ট হইয়া এই বিশ্বাস ও এই গভীর আনন্দে উল্লসিত হয় যে, এই সংসার কঙ্করময় কান্তার অথবা হৃদয়-শূন্য দগ্ধ প্রান্তর নহে।

যাহারা ক্ষণকালও কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে চাহে না, অথবা প্রকৃতির চাপল্যে ক্ষণকালের তরেও কোন বিষয়ে

মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় না,—কার্য্য, কারণ, সৃষ্টি, স্থিতি, জীবন ও মৃত্যু, এবং মানবজীবনের উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্বই যাহাদিগের নিকট হাস্তের বিষয়, সেই বিকটবুদ্ধি কিস্তূত পুরুষেরা অবশ্যই মনুষ্যের অশ্রু লইয়া উপহাস করিতে পারে। আর যাহারা মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শিক্ষা, সংসর্গ অথবা কর্ম্মগুণে ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস হইতেও নিষ্ঠুর হইয়াছে,—কাব্যে যাহাদিগের নাম ধূম্রলোচন কিংবা ফ্রন্ট্-ডি-বিয়ফ, ইতিহাসের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চিত্রে যাহারা ভিটেলস কি ভিস্‌কণ্টী, তাহারাও মনুষ্যের অশ্রুদর্শনে খিল খিল করিয়া হাসিতে পারে! কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বাংশে অন্তঃসারহীন ও প্রাণবিহীন নহেন, মনুষ্যত্ব একেবারে যাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, উহা স্বভাবতঃই তাঁহাদিগের ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ করে, এবং আপনি তরল হইয়াও তাঁহাদিগের তারল্যকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলে। মনুষ্যের অশ্রু বস্তুতঃও সামান্য পদার্থ নহে।

অশ্রু দয়ার প্রবাহ! স্বার্থপরতা নিভৃতে বসিয়া ক্ষতি-লাভ গণনা করে। লোভ কাহার কি হরণ অথবা কোথা হইতে কি উপায়ে কখন কি আহরণ করিবে, সেই চিন্তায় সর্ব্বত্র সাবধানে বিচরণ করে। ঈর্ষ্যা পরের সুখসম্পদ্ ও সম্মান-দর্শনে আপনি পুড়াইয়া মরে এবং বিষাক্ত দৃষ্টি ও বিষাক্ত বাক্যে অন্যকে পুড়াইয়া ভস্ম করে। কামাদি কলুষিত বৃত্তি প্রমত্ত পশুর ন্যায় আরক্তলোচনে সতত ভোগ্য বিষয়েরই অনুসন্ধান করে। কিন্তু পরদুঃখ-কাতরা দয়া নয়নজলে বিগলিত হইয়া,—আপনাকে আপনি পরের আগুনে ঢালিয়া দিয়া, পরকীয় হৃদয়ের দুঃখ-দাহ নির্ব্বাণ করে। দয়ার অশ্রু দেবতারও দুর্লভ ধন। যাঁহার চক্ষু

দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা। তাঁহাকে অভিবাদন কর। তিনি হীন-কুল-জাত হইলেও মহাকুলীন, মূর্খ হইলেও পণ্ডিতের মুকুটস্থানীয়, এবং কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া থাকিলেও রাজরাজেশ্বর। কেন না, সংসারে বৃথাজ্ঞানী ও বৃথাভিমানীরা নানাবিধ বৃথা শ্রম করিয়াও, চিরজীবনে যাহা করিতে পারিতেছে না, তিনি স্বভাবতঃই তাহাতে সিদ্ধ,—তাহারা কৃত্রিম প্রতিপত্তির কৌশলময় সোপানপরম্পরায়, শত সহস্র ভেরী তুরীর বাদ্যকোলাহলের মধ্যে, দ্রুতপদ-সঞ্চারে আরোহণ করিয়াও মনুষ্যত্বের যে উন্নতমঞ্চে অধিরূঢ় হইতে অসমর্থ, তিনি জন্মান্তরীণ মহাপুরুষের মত স্বভাবতঃই সেখানে অধ্যাসীন। তিনি এই পৃথিবীর পাপ-চক্ষে পাপাত্মা হইলেও, তুমি তাঁহাকে পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্রবস্তুজ্ঞানে পূজা করিও। কেন না, তাঁহার জীবন পরের জন্য,—তাঁহার অস্তিত্ব পরের সুখশান্তির উদ্দেশ্যে,—তিনি দয়ার বিগ্রহ অথবা দয়ার সেবক এবং সুতরাং তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে,—লোকলোচনের অগোচরে, জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে,—লৌকিক জীবনের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনন্ত অনুষ্ঠানে দয়াময় মন্ত্রের মহাসাধক, দয়াময়ের প্রকৃত উপাসক।

যে যাহারে ভালবাসে, সে তাহারে প্রায়শঃই ভালবাসিতে পারে। কিন্তু, পরকে ভালবাসে কে? আপনার পুত্র, কন্যা ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তির প্রতি সকলেরই স্নেহ-সঞ্চার হয়। কিন্তু পরকে প্রমুক্তচিত্তে স্নেহ বিলাইতে পারে কে? যেখানে রূপ আছে, গুণ আছে, প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তি কিংবা কুসুমের সুকুমার সৌরভ আছে, সেখানে সকলেরই অনুরাগ আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যেখানে রূপ নাই, গুণ নাই, নয়ন-মনোবিনোদনের কিছুই

নাই,—আছে দুঃখের কালিমা এবং দুর্ভাগ্যের কশাঘাতজন্য ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন, তাদৃশ স্থানে হৃদয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত স্ফুরণে অনুরক্ত হইতে পারে কে? যেখানে সম্পদের সুখ-সামগ্রী মাক্ষিক-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে মধুগন্ধে মোহিত রাখে, সেখানে সকলে গিয়া মমতার বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু, যেখানে বিপদের ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবাতে সকলই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাও বিনাশ পাইতেছে, এবং আশার শেষ আলোকবর্ত্তিকাও নিবিয়া যাইতেছে, আপনা হইতে সেখানে যাইয়া আপনাকে আপনি মমতার রজ্জুতে জড়াইতে পারে কে? যে পবিত্র, পূত-চরিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ, তাহাকে সকলেই শ্রদ্ধা করিতে পারে। কিন্তু যে অধম, অপাত্র, অপবিত্র ও অস্পৃশ্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া আবরিতে পারে কে? হৃদয় যেখানে উড়িয়া পড়িতে সুখানুভব করে,—সুখ-সংস্পর্শে শীতল হয়, সেখানে সকলেই স্বয়মাহূত উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু যেখানে সকলই দুঃসহ, দুর্নিরীক্ষ্য ও নিদারুণ দুর্ভোগ,— যে স্থানের বীভৎস দৃশ্যে বিরক্তি ও ঘৃণা ব্যতীত আর কোন ভাবেরই উদ্রেক হয় না,—যেখানে বল-প্রয়োগেও চিত্তকে প্রেরণ করা যায় না, সেখানে আপনা হইতে যাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে কে?

তুমি প্রভুত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ কর,—প্রভুত্বলাভে পূর্ণকাম হইবার জন্য অকথ্য ক্লেশ স্বীকার কর,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। তুমি সারস্বত সমুদ্রে সাতার দিয়া একেবারে উহাতে ডুবিয়া থাক,—সরস্বতীর পাদপদ্মে একেবারে বিলীন হইয়া যাও,—সে তোমার আপনার জন্য; পরের জন্য নহে। যদি প্রভুত্বের উপাসনায় ও সরস্বতীর পদারবিন্দসেবায়

কোনরূপ অলৌকিক মাদকতা না থাকিত, তাহা হইলে তুমি তাহাতে দেহ-মন অর্পণ করিতে পারিতে কি না, সন্দেহের কথা। তুমি কীর্ত্তির বিশ্ববিনোদ বংশীধ্বনি-শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত হইয়া কীর্ত্তিকর ও যশস্কর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান কর,—যে সকল কঠোর, কষ্টজনক ও দুঃসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভনিবহে আপনার নামাক্ষর লিখিয়া রাখিতে যত্নপর হও, তাহাও তোমার আপনার জন্য,—পরের জন্য নহে। পরের জন্য দয়ার অশ্রু,—পৃথিবীর অমূল্য ধন, প্রাণপ্রদ—প্রাণস্পর্শী এবং অপ্রত্যক্ষ মহত্বের প্রত্যক্ষ ফল।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

দিল্লীর অস্ত্রাগার

দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার নগরের অন্তর্ভাগে রাজপ্রাসাদের কিয়দ্দূরে অবস্থিত ছিল। অস্ত্রাগারে সমস্ত আবশ্যক যুদ্ধোপকরণের কিছুরই অভাব ছিল না। কামান, বারুদ, গোলা, গুলি সমস্তই এই অস্ত্রাগারের যথাস্থলে যথানিয়মে সন্নিবেশিত ছিল। লেপ্টেনেণ্ট জর্জ উইলোবি নামক একজন সৈনিকপুরুষ এই অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহার অধীনে ৮ জন ইউরোপীয় কার্য্য করিতেন। অস্ত্রাগারেব অবশিষ্ট লোক ভারতবর্ষীয়। সোমবার (১১ই মে, ১৮৫৭) প্রাতঃকালে উইলোবি অস্ত্রাগারের কার্য্য পরিদর্শন করিতেছিলেন এমন সময়ে, দিল্লীর ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার টমাস মেট্‌কাফ্‌ তাঁহাকে জানান যে, মিরাট হইতে উত্তেজিত অশ্বারোহী সৈনিকদল নদী পার হইতেছে। ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য রেসিডেণ্ট দুইটি কামান প্রার্থনা করেন। তিনি এই কামান যমুনার নৌসেতুতে রাখিয়া আগন্তুক অশ্বারোহীদিগকে উড়াইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, বাধা দিবার সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। অশ্বারোহিগণ নদী পার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা অবগত হইয়াই মেট্‌কাফ সাহেব অবিলম্বে কার্য্যান্তরে গেলেন, এবং উইলোবি আপনার অস্ত্রাগার রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে, আগন্তুক সৈনিকদিগের সহিত নগরের উন্মত্ত লোক অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া বারুদ, গোলা, গুলি ইত্যাদি লুঠিয়া

লইতে পারে। মিরাট হইতে ইউরোপীয় সৈন্য না আসিলে তিনি দীর্ঘকাল এই অস্ত্রাগার রক্ষা করিতে পারিবেন না। অস্ত্রাগারের একজন দ্বারবানের উপর উইলোবির সন্দেহ হয়। এই দ্বারবানের নাম করিমবক্স্। উইলোবির বিশ্বাস জন্মে যে, এই ব্যক্তি শত্রু-পক্ষের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিতেছে। এই বিশ্বাসে উইলোবি আপনার একজন ইউরোপীয় সহযোগীকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি করিমবক্স্ অস্ত্রাগারের দ্বারের দিকে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহাকে গুলি করা হয়।

অস্ত্রাগারে আর যে সকল এতদ্দেশীয় লোক ছিল, তাহারাও উন্মত্ত সিপাহীদিগের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করে নাই। উপস্থিত সময়ে, সকলেই, ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে, অলক্ষ্যভাবে একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল ; এক আশঙ্কা, এক চিন্তা, এক অনুভূতি ও এক ধারণা, সকলকেই এক করিয়া তুলিয়াছিল। সে সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ পূর্ব্বে ইহা বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইল, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এক সময়ে যাহারা তাঁহাদের অধীনে শান্তভাবে কার্য্য করিয়াছিল, শান্তভাবে তাঁহাদের নিকট সৌজন্য ও নম্রতার পরিচয় দিয়াছিল. তাহারা সকলেই এখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, এবং সকলেই পরস্পর একতাসম্পন্ন হইয়া এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।

অস্ত্রাগারে যে ৯ জন ইঙ্গরেজ ছিলেন, তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, এবং মিরাট হইতে শীঘ্র সাহায্য পাওয়া যাইবে ভাবিয়া আশ্বস্তহৃদয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। অস্ত্রাগারের দ্বার রুদ্ধ হইল। রুদ্ধ দ্বারদেশে গোলাপূর্ণ

কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইল। এক এক জন আগুন হাতে করিয়া এই সজ্জিত কামানের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই কাজ শেষ হইলে যে গৃহে বারুদ ছিল, সেই গৃহ হইতে অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণস্থিত একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত মাটির নীচে বারুদ সাজাইয়া রাখা হইল। এইস্থানে অস্ত্রাগারের স্কলি নামক একজন কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া রহিলেন। অদূরে বক্‌লি নামক উইলোবির একজন সহকারী শেষ আদেশ জানাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিলেন। যদি আর কোন উপায় না থাকে, তাহা হইলে উইলোবির আদেশে বক্‌লি সাহেব টুপি খুলিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র, মৃত্তিকার নিম্নস্থিত বারুদে আগুন লাগাইয়া সমস্ত অস্ত্রাগার উড়াইয়া দেওয়া হইবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। স্কলি উইলোবির এই শেষ আদেশ পালনের জন্য মৃত্তিকার নিম্নস্থ সেই সজ্জিত বারুদের নিকট রহিলেন।

যখন অস্ত্রাগারের ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে-ছিলেন, তখন বিপক্ষদিগের কয়েকজন আসিয়া দিল্লীর সম্রাটের নামে অস্ত্রাগার তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে কহিল। ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ কোন উত্তর দিলেন না, নীরবে ঐ কথার প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহার পর আরও অনেকে আসিয়া কহিতে লাগিল যে, সম্রাট্ অস্ত্রাগারের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছেন, অস্ত্রাগারে যে সকল যুদ্ধোপকরণ রহিয়াছে, তৎসমুদয় তিনি সৈনিকদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু উইলোবি এ কথারও কোন উত্তর দিলেন না। তিনি নীরবে আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বিপক্ষগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রাগারের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইল এবং প্রাচীরের গায়ে কতকগুলি মই

ফেলিয়া দিল। অস্ত্রাগারের অভ্যন্তরে যে সকল এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা অবিলম্বে অস্ত্রাগারের ছোট ছোট ঢালু ছাদ দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং অপরপার্শ্বস্থিত মই দিয়া নীচে নামিয়া আক্রমণকারীদিগের দলে মিশিল।

ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ এখন কালবিলম্ব না করিয়া বিপক্ষদিগের উপর গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। গোলার পর গোলা আসিয়া বিপক্ষদলে পড়িতে লাগিল। বিপক্ষেরাও এই বাধা অতিক্রম করিতে লাগিল। তাহাদের নিক্ষিপ্ত গুলিও রক্ষকদিগের ব্যূহভেদ করিতে লাগিল। ৯ জন ইঙ্গরেজের মধ্যে ২ জন আহত হইলেন। এ দিকে আক্রমণকারিগণ অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টি করিতেছিল। তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অনেকে অনুমান করেন যে, মিরাটের ১১গণিত ও ২০গণিত সৈনিকদলই প্রধানতঃ এই কার্য্য সাধন করিতেছিল; দিল্লীর ৩৮গণিত সৈনিকদিগেরও অনেকে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, আক্রমণকারিগণ এরূপ প্রবলবেগে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, ইঙ্গরেজ রক্ষকগণ আর কিছুতেই সেই আক্রমণের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের শেষ উদ্যম পর্য্যদস্ত হইল। তাঁহারা আর অন্য উপায় না দেখিয়া আপনাদের শেষ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। উইলোবি অবিলম্বে ইঙ্গিত করিলেন। ইঙ্গিত করামাত্র বক্‌লি মাথার টুপি খুলিয়া স্কলিকে দেখাইলেন। স্কলি নির্ভীকচিত্তে সজ্জিত বারুদে আগুন দিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ঘোরতর শব্দের সহিত অস্ত্রাগার ফুটিয়া উঠিল।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের ৯ জনের মধ্যে ৬ জনের প্রাণরক্ষা হইল। উইলোবি একজন সহকারীর সহিত

মেইন গার্ডে উপনীত হইলেন। আর কয়েকজন ভিন্ন দিক্ দিয়া পলাইয়া মিরাট প্রভৃতি নিরাপদ্ স্থানে পঁহুছিলেন। কিন্তু যিনি সজ্জিত বারুদে আগুন দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধগামী ধূমস্তরের সহিত মিশিয়া গেল। স্কলি অসীমসাহসে ও অম্লানভাবে প্রজ্বলিত বারুদে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এইরূপ অপূর্ব্ব সাহস-সহকৃত আত্মত্যাগে বীরপুরুষের বীরত্বকীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া রহিল।

রজনীকান্ত গুপ্ত।



বুদ্ধচরিত

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিষ্ক্রমণ করেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ হইতে মণিমুক্তা আভরণ সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।" ছন্দক বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল, "প্রভু! আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব।" কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন; বলিলেন, "তোমার এখনও সন্ন্যাস-গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবেন। তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল। আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্য কেহ যেন চিন্তাকুল না হন।"

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্ত্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসিবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার কোন ঠিকানা নাই।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে বিশ্রাম করত পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন। বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য তেজঃপুঞ্জদৃষ্টে নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্ত্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বিম্বিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন-সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার স্থবিমল দেহকান্তি-দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রভু! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্ত্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান, সকলই পাইবেন।" তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান্ সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, এই দুর্লভ কাম্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।" এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিষয় আপনারই থাকুক, আমি কোন

কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।” পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, “কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্ব লাভের আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।” বিম্বিসার তখন বলিলেন, “স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমি আপনার ধর্ম্মের আশ্রয় লইব।” এই বলিয়া বিম্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্ব-লাভের পর তাঁহাদের পুনর্ম্মিলন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট-সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব্ব সাধনক্ষেত্র। বিন্ধ্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নিকর্ষবশতঃ ভিক্ষান্ন-সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গৌতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিন শত শিষ্য ছিল। গৌতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্মশিক্ষা করেন। তাহাও

তাঁহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরূপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব হয়, এবং দৈবশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি-লাভ ও প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গৌতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন। তদনুসারে তিনি বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্য্যে ছয় বৎসর যাবৎ ঘোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়" তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল। এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। ক্রমে তাঁহার কর্ণচ্ছিদ্র রুদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর-শোষণে অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে, তাঁহার যথার্থই মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন। এই

অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই প্রকার তপশ্চর্য্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে হতাশ হইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মিত আহারাদি করিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। এই সঙ্কট-সময়ে, "যখন তাঁহার পক্ষে অপরের সমবেদনা বিশেষ আবশ্যক ছিল, যখন অনুরক্তজনের প্রীতি, ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহার সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পারিত, তখন তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী চলিয়া গেল। তপশ্চরণ পরিত্যাগ করার দরুন তিনি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহাদের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতার তীব্র জ্বালা একাকী সহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।"

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈরঞ্জনাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটস্থ এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন। ইহার অব্যবহিতপূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিনী সুজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন করেন। সুজাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'আমার একটি শিশু-সন্তান হইলে বনদেবতার নিকট পূজা দিব।' যখন তিনি এই ঘোরতর উপোষণাদি কৃচ্ছ্র সাধনে ম্রিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহার সম্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, কি আনিয়াছ?" সুজাতা কহিলেন, "আমি আপনার জন্য এই পরম উপাদেয় পরমান্ন আনিয়াছি। ভগবন্! সদ্যঃপ্রসূত শত গাভীদুগ্ধে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ করিয়াছি, তাহাদের দুগ্ধে পঁচিশ, তাহাদের দুগ্ধে আবার বারোটি গাভী

পরিপুষ্ট। এই দ্বাদশ গাভীর দুগ্ধ পান করাইয়া আমার পালের মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুহিয়া লই। সেই দুগ্ধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে সুগন্ধি মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চ্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমান্ন লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন।"* সিদ্ধার্থ সুজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।" এই দুগ্ধপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রিতে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ 'বোধিবৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,
চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া।

* *Light of Asia*, Edwin Arnold.

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হ'তে।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তিনি তত্ত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন। তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্য্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা এই,—

অবিদ্যা হইতে সংস্কার।
সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness)।
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ।
নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়)।
ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ।
স্পর্শ হইতে বেদনা।
বেদনা হইতে তৃষ্ণা।
তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি)।
উপাদান হইতে ভব।
ভব হইতে জন্ম।
জন্ম হইতে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা।

অবিদ্যাই সকল দুঃখের মূল। অবিদ্যা-নাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব্ব দুঃখ বিদূরিত হয়। এইরূপে দুঃখের মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই আমাদের

সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিদ্যার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোদ্ধৃত উদান গান করিয়াছিলেন,—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্‌সম্‌ অনিব্বিসম্‌
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি
সব্বাতে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ।
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহাকাব্যের লক্ষণ

ইংরাজি এপিক্‌-শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না, তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে, আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্‌ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে বোধ করি এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতঃই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য

নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয় ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না। কেন না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সঙ্গত নামকরণ চলিতে পারে। কুমার-সম্ভব-কিরাতার্জ্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে; অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন

সত্ত্বেও ইউরোপখণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্ত্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলঙ্কারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও প্যারাডাইস্ লষ্ট্‌কে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই ; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না ; কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাম মনে রাখিয়াও অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও এক বারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল ; তাহার পর কত-হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার

কারণ চিন্তনীয় ; কিন্তু সেই কারণ আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা বোধ করি আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্য-সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না ; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্য-স্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন নাই। সিডান্‌-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ন্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ন্‌-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময় আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষ-মাত্রশাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু

তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও বোধ করি সময়মত কৌপীনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোষাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন, নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্, কোনরূপ রঙ্-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয় ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্ খাঁর প্রেতাত্মার আর লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতঃই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদ্‌লায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যে কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে, তাহা

আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসদ্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের বোধ করি আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতঃই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণকলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃত-রসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের

মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্‌ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

অমঙ্গলের উৎপত্তি

একখানি সাময়িক পত্রে দেখিলাম, লেখক বিগত ভূমিকম্প ঘটনার দুইটি উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছেন। প্রথম, বাঙ্গালাদেশের জমিদারেরা গরিব প্রজার উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন; সেইজন্য ঈশ্বর তাঁহাদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, কাহারও বা হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া যথোচিত শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয়, দুর্ভিক্ষে গরিব লোকের অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছিল; এখন বহুলোকের ঘর-বাড়ীর নির্ম্মাণ-উপলক্ষে বহুতর লোক মজুরি পাইয়া জীবন রক্ষা করিবে। উভয়ত্রই ঈশ্বরের করুণার পরিচয়।

কিন্তু কূটবুদ্ধি লোকে জিজ্ঞাসা করিতে ছাড়ে না, দোষীর সহিত অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও প্রাণ গেল কেন? অমুক বড় লোক প্রজাপীড়ক ছিলেন, ঘরের দেওয়াল পড়িয়া তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়াছে, ইহা সুদৃশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে অমুক নিরীহ ব্যক্তি, যাহার সুশীলতায় এ পর্য্যন্ত কেহ সংশয় করে নাই, তাহার মাথা চেপ্‌টা করিয়া দিয়া তাহার অনাথা পত্নীর অন্নের সংস্থান বন্ধ করা কেন হইল?

এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া হয়। সে ব্যক্তি না হয় নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক ছিল, কিন্তু তাহার পত্নীর কথা কে জানে? অথবা তাহার দোষ না থাকুক, তার বাপের দোষ ছিল, অথবা পিতামহের দোষ ছিল; অথবা এ জন্মে দোষ না থাক, পূর্ব্বজন্মে দোষ ছিল না, তাহা কে বলিল? ব্যাঘ্র মেষশাবককেও ঠিক এইরূপ বলিয়াছিল।

ইহুদী জাতির বাইবেল-নামক প্রামাণিক ইতিবৃত্তে দেখা যায়, তাহাদের জেহোবা-নামধেয় ঈশ্বর সময়ে সময়ে অত্যন্ত কুপিত হইয়া আপন প্রিয়তম জনসমাজের মধ্যে অত্যন্ত হুলস্থুল ঘটাইয়া দিতেন এবং তৈমুরলঙ্গ ও জঙ্গিস খাঁর অবলম্বিত নীতির আশ্রয় করিয়া পাপের শাস্তি আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলের উপর অপক্ষপাতে অর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে অনেকে বাইবেলের জেহোবার ছাঁচে ঈশ্বর গঠন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঈশ্বরের পরমকারুণিকতা ও ন্যায়পরতা-সম্বন্ধে ঐরূপ যুক্তি অহরহঃ শুনিতে পাওয়া যায়।

জগতের যেসকল ঘটনা স্থূলদর্শীর চোখে খাঁটি অমঙ্গলরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার অভ্যন্তরেও পরমকারুণিক বিধাতৃপুরুষের যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, সে বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী লোকের কোন সংশয় নাই।

জগতে অমঙ্গলের উৎপত্তির অনুসন্ধানের পূর্ব্বে, প্রথমে অমঙ্গল আছে কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। নতুবা কেহ যদি বলিয়া বসেন, অমঙ্গল আদৌ অস্তিত্বহীন, তাহা হইলে সমুদয় পরিশ্রম পণ্ড হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে যদি চেতন জীবের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত কেন, সমস্ত ভূমণ্ডল চূর্ণ হইয়া আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলেও, কাহারও কোনও মাথাব্যথা ঘটিত না এবং ব্যাপারটা মঙ্গল কি অমঙ্গল, তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না। জগতে জীবের অস্তিত্ব না থাকিলে এবং জীবের আবার সুখদুঃখ বুঝিবার শক্তি না

থাকিলে, অমঙ্গল শব্দের অর্থ লইয়া বিচার করিবার অবকাশই উপস্থিত হইত না। অচেতন প্রাণহীন জড় জগতে মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই।

এক দল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা জীব-মধ্যে কেবল মনুষ্যের ইষ্টানিষ্ট হিসাব করিয়া মঙ্গল ও অমঙ্গলের নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাহাতে মনুষ্যের ইষ্ট আছে, তাহাই মঙ্গল; যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট, তাহাই অমঙ্গল। ইঁহাদের ভাবটা এই,—এই প্রকাণ্ড জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া মানুষের ভোগের জন্যই বর্ত্তমান রহিয়াছে; মনুষ্য জগৎকে উপভোগ করিতেছে বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব সার্থক; মনুষ্যের ভোগের উপযুক্ত না হইলে কোনও পদার্থের কোনও প্রয়োজন থাকিত না। সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের ভোগের জন্যই এতটা পরিশ্রম করিয়াছেন; তাঁহার সৃষ্ট পদার্থসমূহের মধ্যে যাহা মানুষের সুখবিধানে যত সাহায্য করে, তাহার অস্তিত্ব ততদূর সার্থক এবং সৃষ্টিকর্ত্তার চেষ্টা ততদূর সফল এবং তাঁহার নৈপুণ্য ততদূর প্রশংসনীয়। সৃষ্টিকর্ত্তা ধন্য, কেন না, তাঁহার নির্ম্মিত জগৎ আমাদের চক্ষে এমন সুন্দর লাগে, আমাদিগকে এমন প্রীতি দান করে। তিনি ধন্য, কেন না, এত বিচিত্র দ্রব্যের সমাবেশ করিয়া এত বিবিধ উপায়ে তিনি আমাদের জীবনরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি সুনিপুণ কারিকর, কেন না, এত কৌশলসহকারে তিনি যখন যেটি দরকার, যখন যাহা নহিলে মানুষের অসুবিধা হইবে, তখন তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন, স্তুতিভাজন ও প্রীতিভাজন, কেন না, তাঁহার রচিত জগতের মধ্যে আমরা এত স্ফূর্ত্তি-সহকারে বেড়াইতেছি। অতএব গাও হে তাঁহার নাম ইত্যাদি।

সূর্য্য কেমন অদ্ভুত পদার্থ! সূর্য্যের উত্তাপ নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিজ্ঞানবিদ্যা শতমুখে সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণ গান করিতেছে। বায়ু নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? বিধাতা আমাদিগকে বায়ু দিয়াছেন। জল নহিলে আমরা কোথায় থাকিতাম? তাই বিধাতা আমাদিগকে জল দিয়াছেন। পৃথিবী না থাকিলে আমাদের দাঁড়াইবার স্থল থাকিত না; পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁহার কেমন দূরদর্শিতার পরিচায়ক! এমন কি, বিধাতা আমাদের আহারের জন্য ঘাসের ফলকে শস্যে ও আমাদের শীত-নিবারণের জন্য কাপাসের ফলকে তুলায় পরিণত করিয়া কি অপূর্ব্ব মানবহিতৈষার পরিচয় দিয়াছেন! এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান, সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান;—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও শাস্ত্রকার ও ধর্ম্মবক্তা সকলেরই মুখে এই একই কথা চিরকাল শুনা যাইতেছে।

সমস্ত জগৎটাই যখন মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য ও সুবিধার জন্য নির্ম্মিত, তখন জগতের মধ্যে যদি এমন কোন পদার্থ থাকে, যাহা মানুষের কোন কাজে লাগে না, তাহা হইলে সেই পদার্থের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্যপ্রণালীতে দোষারোপ ঘটে। সেইজন্য এক দলের পণ্ডিত জাগতিক সমুদয় পদার্থের মনুষ্যের পক্ষে উপকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল। যদি সহজ চোখে কোনরূপ প্রমাণ না মিলে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে জ্ঞানের উন্নতি-সহকারে ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে, এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাঁহারা মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন।

কিন্তু এইখানে একটা সমস্যা আসিয়া দাঁড়ায়। কোটি সূর্য্য-মণ্ডলে পরিপূর্ণ জগতের মধ্যে পৃথিবী একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র

বালুকাকণামাত্র, এবং এই প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই মনুষ্যের কারবার। আবার এই পৃথিবীতেই এই কয়েক বৎসর মাত্র মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে, এবং আর কয়েক বৎসর পরে মনুষ্যের আবার বিলোপ হইবে, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা সন্দেহ করেন না। বিশ্বজগতের কিন্তু সীমা পাওয়া যায় না, এবং কোন্ কাল হইতে জগৎ বিদ্যমান আছে, এবং কতকাল ধরিয়া জগৎ বিদ্যমান রহিবে, তাহারও আদি-অন্ত কিছু নিরূপণ হয় না। ক্ষুদ্র সাদি ও সান্ত মনুষ্যের জন্যই এত বড় অনাদি অনন্ত কারখানাটা চলিতেছে, এইরূপ বিশ্বাস করা নিতান্তই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পৃথিবীর ইতিহাসে মনুষ্য ছিল না, অথচ অন্যান্য জীবজন্তু বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বাহিরে অসীম আকাশে অবস্থিত অসংখ্য বৃহত্তর পৃথিবীতে জীবজন্তু যে বর্ত্তমান নাই, তাহারও প্রমাণ নাই; এমন কি, পৃথিবীতে জীবের ধ্বংস হইলেও অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রে জীব বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কাজেই জগৎটা মানুষের জন্য নির্ম্মিত, মানুষেরই একমাত্র ভোগ্য বস্তু, এইরূপ বলিতে সকল সময় সাহসে কুলায় না। জগৎটা জীবের জন্য, চেতন সুখদুঃখভোগী জীবমাত্রেরই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, এইরূপ নির্দ্দেশই সঙ্গত হইয়া পড়ে।

এই বিচারে অধিক সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই। মনুষ্য অথবা মনুষ্যেতর জীব, যাহার চেতনা আছে, যাহার সুখভোগের ও দুঃখভোগের ক্ষমতা আছে, তাহারই সুবিধার জন্য, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য ও আরামে রাখিবার জন্য, জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। জগতের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যই এই। যে ব্যাপার এই

উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা মঙ্গল ও যাহা ইহার প্রতিকূল, তাহা অমঙ্গল।

মঙ্গলের উৎপত্তি বেশ বুঝা যায়; কেন না, সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যই তাহাই। কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না; এবং ইহা বুঝিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞানেতিহাসের আরম্ভ হইতে আজি পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিতেছে।

জীবকে সুখে রাখিবার জন্য ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, অথচ অমঙ্গল সেই সুখের বিঘ্ন উৎপাদন করে! তবে অমঙ্গলের উৎপত্তি কেন হইল?

ইহার প্রচলিত উত্তর নানাবিধ। একে একে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম, ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমেই মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবকে সুখ দেওয়া ও দুঃখ দেওয়া উভয়ই তাঁহার অভিপ্রায়। জীবকে সুখ ও দুঃখ দিয়াই তাঁহার আমোদ। এই তাঁহার লীলা। ইহাতে তাঁহার লাভ কি, তিনিই জানেন। তিনি রাজার উপর রাজা, বাদশার উপর বাদশা; তাঁহার অভিরুচির উপর কাহারও হাত নাই। তাঁহার খেয়ালের ও তাঁহার খেলার অর্থ তিনিই জানেন।

এইরূপ নির্দ্দেশে তর্কশাস্ত্র কোনও দোষ দেখে না। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের চরিত্রে নিতান্ত দোষ আসিয়া পড়ে। পরমকারুণিক, মঙ্গলময় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ, যাহা ঈশ্বরের পক্ষে নিজস্ব রহিয়াছে, সেইগুলির আর প্রযোজ্যতা থাকে না। কাজেই এইরূপ উত্তর অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

কাজেই বলিতে হয়, ঈশ্বর মঙ্গলার্থে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন; তবে কি কারণে জানি না, মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গলও আসিয়া পড়িয়াছে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে; ঈশ্বর হইতে অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে না। অমঙ্গলের উৎপত্তির কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। অমঙ্গল ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, এবং ইহার উন্মূলনের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বদা প্রয়াস; কাজেই ইহার মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।



সেকালের সুখদুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপতিকে নর-বলি দিয়াছিল। ঘাতকের শাণিত কুঠার যখন সেই রাজমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করে, শোণিত-লোলুপ জনসাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের মত ভৈরব-নৃত্যে করতালি দিয়া কিছু দিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্থাপিত করিয়াছিল! কিন্তু তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে কুটীরে, দুর্গে-দুর্গে, প্রাসাদে-প্রাসাদে কত কৃষক, কত সৈনিক, কত সম্ভ্রান্ত পরিবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল! বাঙ্গালী যখন ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে গৃহতাড়িত করে, মীরনের নৃশংস আদেশে সিরাজ-মুণ্ড যখন দেহ-বিচ্যুত হয়, দেশের রাজা-প্রজা তখন সকলে মিলিয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন;—সিরাজের শোচনীয় পরিণামে তাঁহার জন্য কেহই একবিন্দু অশ্রুমোচনের অবসর পান নাই।

এসকল এখন পুরাতন কথা। দেশের আর সে অবস্থা নাই, লোকের আর সে তীব্র প্রতিহিংসা নাই, সিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাজা-প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ

করিয়াছেন। এখন বোধ হয়, বাঙ্গালী যথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চরিত্র আলোচনা করিবার অবসর পাইবেন।

সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা * "সমুদয় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত হৃত-সর্ব্বস্ব কাঙ্গাল-ভূমি। সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, বাঙ্গালীর সে রাজপদ, মন্ত্রিপদ, জমীদারদিগের সে জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা নাই;—সে বাহুবল, সে রণকৌশল—সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এ দেশে মুসলমানের নামগন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবল হিন্দু অধিবাসীর শঙ্খ-ঘণ্টারবে প্রতিশব্দিত হইত। কিন্তু সে বহুদিনের কথা। সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের শিষ্টাচার, মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্রুতিসুমধুর, সুমার্জ্জিত যাবনিক

* Akbar and Aurangzeb.

ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত "মা-বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না, বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাসলোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালা দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য-বিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না।

সেই একদিন আর এই একদিন! আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বাস্তব রাজ্যের, বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য

সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে,—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতৃপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাক্‌লায় এবং ১,৬৬০ পরগনায় বিভক্ত ছিল।* পরগনাগুলি কোন না কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের স্বাধীন শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎ-শেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা মুদ্রিত হইত; পরগনাধিপতি জমীদারগণ জগৎ-শেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন, এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা-চাপকান পরিয়া উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া মুসলমানী প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার-অবিচার ছিল না তাহা নহে; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে

* Grant's Analysis of Finances of Bengal.

অরাজকতায় জমীদার ও মহাজন যতই উৎপীড়িত হন না কেন, কৃষক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথা-প্রাপ্য শস্য সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না, কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি-তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচার-কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু-তস্করে উপদ্রব করিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে! দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্সী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন করিলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ঋণ-গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; দুই-এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ

বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না, সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথ-ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর সময়ে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে এক জনের স্থানে দুই তিন জন চাপিয়া বসিত; কখনও বা বর্ষার জলে—নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-বড়ে টিপিয়া বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা

কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙ্গিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাবুরী-চুলে চিরুনী গুঁজিয়া, শুক-সারি অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুলবুল্ হাতে লইয়া তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া, পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য চণ্ডীমণ্ডপে, নদী-সৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া দেশের কথা, দশের কথা, কত কি আবশ্যক-অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসঙ্কীর্ত্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তি-গদ্‌গদ-হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে-অসময়ে ছেলে ঠেঙ্গাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শীতল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন; কত কথা, কত রঙ্গরস—তাহার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব-হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠন-জড়িত অস্ফুট সখী-সম্ভাষণ, এবং স্থবিরার স্খলদ্‌বচনে শিবমহিম্নস্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্য সম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত!

সেদিন আর নাই; এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্গমের পূর্ব্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখনও বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে; যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখনও বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায়

দেশে-দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে ; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন ; আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামিপুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।



বিশ্বামিত্রের পতন

১

বিশ্বামিত্র অপ্রতিহতপ্রভাবে ও অপত্যনির্ব্বিশেষে নিজ নূতন সৃষ্টি পালন করিতে লাগিলেন। যাহাতে লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে লোকে জীবনকাল পরম সুখে কাটাইয়া যাইতে পারে, একটুকুও কষ্ট না হয়, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণপণ যত্ন, কিন্তু তাঁহার নিজের কি? যত দিন সৃষ্টি-উৎসাহে ছিলেন, নিজের কথা মনে হয় নাই। নিজে তিনি সৃষ্টির ঈশ্বর। যখন মানুষের সঙ্গ না পায়, যখন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে না পায়, তখন সামান্য মানুষ ক্ষেপিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড পুরুষ, প্রধান মহারাজ বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করিয়া আপনার এককত্ব বুঝিতে পারিলেন। সব হইল, কিন্তু সুখ কৈ? নিজের কি হইল? তিনি নিজ সৃষ্টিস্থ মানুষের সঙ্গে মিশিলেন; কিন্তু যাহাদের সঙ্গে চিরদিন কাটাইয়া আসিয়াছেন, যাহারা তাঁহার নিজসুখদুঃখ বুঝে, তাহারা কৈ? ইহারা ত সুখী, বিশ্বামিত্র ত মানুষ। দুঃখ-ভোগ ত তাঁহার অদৃষ্টলিপি। তিনি দুঃখিত হইলে, উন্মনা হইলে তাঁহার মুখপানে তাকায়, এমন লোক কৈ? তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়, শেষে তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, কতকগুলি পৃথিবীর লোক আনিয়া রাখিতে হইবে। এই

বলিয়া তিনি কান্যকুব্জ নগরটি উঠাইয়া আনিবার জন্য প্রকাণ্ড নগর নির্ম্মাণ করিলেন। এ সৃষ্টিতে ত শত্রু-ভয় নাই, নগরে গড়-প্রাচীর কিছুই রহিল না। সুরম্য হর্ম্ম্যে, প্রকাণ্ড প্রাসাদে নগর পরিপূর্ণ হইল। তখন বিশ্বামিত্র পৃথিবীতে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জ নগরে গেলেন। মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরিবারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; দেখিলেন, এই সমস্ত আপন লোকের মধ্যে যত সুখ, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানুষ যদি ঈশ্বর হয়, তথাপি একাকী তাহার তত সুখ হয় না। একবার ইচ্ছা হইল, পৃথিবীতে থাকি, আবার সেখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার কর্ত্তৃত্ব ও এখানকার ব্রাহ্মণদিগের কথা মনে পড়িল; তিনি স্বজনবর্গকে আপন সৃষ্টিতে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন।

সমস্ত কান্যকুব্জ নগর শুদ্ধ উঠিতে লাগিল। আস্তে আস্তে উঠিতে লাগিল, পৃথিবীর লোক আশ্চর্য্য হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। উড্ডীয়মান নগরমধ্যে নানারূপ সুন্দর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তাহাদিগের সুখ দুঃখরূপে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। তাহাদের নিশ্বাস বহে না, গলা ফুলিয়া উঠিল। বিশ্বামিত্র পৃথিবী-বায়ু আকর্ষণ করিলেন। তাহা আসিল না। বিশ্বামিত্র মহা বিভ্রাটে পড়িলেন। পৃথিবী-বায়ু সৃষ্টি করিতে গেলেন, তাহা হইল না। ব্রহ্মাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা আসিলে তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহ? আমি এই আপন স্বজন সঙ্গে নিজ সৃষ্টিতে যাইব, তুমি বাধা দিতেছ কেন?" ব্রহ্মা বলিলেন, "তুমি যে তপের বলে সৃষ্টি

করিয়াছ, সে কেবল তাহাতেই ক্ষয় হইয়াছে,—তোমার আর তপোবল নাই যে, তুমি কোন নূতন কাজ কর। নূতন কাজ করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টি নাশ হইবে। আমি তোমায় বলি, তুমি এখনও স্থির হও, বুঝিয়া চল।" "পাষণ্ড, যত বড় মুখ, তত বড় কথা! আমায় বল কি না, বুঝিয়া চল! এই দেখ, নিজ পৃথিবী হইতে বায়ু আনিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব" বলিয়া বিশ্বামিত্র বেগে প্রস্থান করিলেন। কান্যকুব্জ তথা হইতে বেগে পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, তাহা হইলে নিজ সৃষ্টিই নাশ হইবে। নিজে ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইয়া যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের অনুচরবর্গ ব্রাহ্মণদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। রাক্ষসদিগের সহিত যোগ দিয়া নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল।

২

বিশ্বামিত্র আপন পৃথিবীর বায়ু শূন্যপথে চালাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রহ্মার স্মরণ করিলেন। আবার ব্রহ্মা আসিলে বলিলেন, "আমার বায়ু শূন্যপথে যাইবার পথ ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মা বলিলেন, "সে তপোবল তোমার নাই; আর, তোমার তপোবল না থাকিলে আমার দিবারও ক্ষমতা নাই।" বিশ্বামিত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে কারাগারে রুদ্ধ করিতে গেলেন; পারিলেন না। তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া গদা তুলিয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই থাক, নূতন কার্য্য করিতে গেলেই তোমার সৃষ্টিনাশ

হইবে।" বিশ্বামিত্র গালি দিয়া ব্রহ্মাকে দূর করিয়া দিলেন। পরে গদা তুলিলেন। গদা এক বার হাত হইতে পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বার মহাবেগে গদা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল; ওদিকেও তাঁহার পৃথিবীতে ফাট ধরিল। তিনি গদা ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ইচ্ছা, ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া গদা প্রহার করেন। এই জন্য লক্ষ্য করিতেছেন, আর গদা ঘুরাইতেছেন। তাঁহার পৃথিবীর সন্ধি-সকল আরও বিশ্লিষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে গদা যত ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নীহারিকারূপে পরিণত হইল।

বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িলেন, আর তাঁহার সংগৃহীত নীহারিকা-সমূহ যে যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, ভীমবেগে সেই সেই দিকে চলিয়া গেল। অনন্ত-গর্ভ গহ্বর যেমন ক্ষীণালোকময় ছিল, তেমনি ক্ষীণালোকময়ই রহিল। আর নীহারিকাকুল যে সকল নক্ষত্রাদি টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে নূতন পৃথিবী 'জলের বিম্ব জলের' ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া গেল। যে ঈশানকোণ পৃথিবী হইতে নক্ষত্র-রাশিতে ভরা-ভরা দেখা যাইত, তাহা আবার শূন্যময় হইয়া গেল। বিশ্বামিত্র-পৃথিবীতে নূতন মনুষ্যের যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল, তাহা আর রহিল না। মানুষও সব আবার অগঠিতপদার্থরাশিমধ্যে বিলীন হইল। সে সুন্দর পাহাড়-পর্ব্বত-সৌধ-প্রাকার-রাজপথ-সমবেত সমস্ত পৃথিবী আবার অগঠিতপদার্থরাশিরূপে পরিণত হইল। যে সমাজবন্ধনে অত্যাচার ছিল না, ছোটবড় ছিল না, যাহাতে কেবল প্রেম আর ঐক্য আর সাম্য, তাহাও অনন্তগর্ভে নিহিত হইল।

৩

আর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়াই মূর্চ্ছিত। কোথায়? স্থান আছে কি? শূন্যমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ এতক্ষণ ছিল, এখন তাঁহার মৃতপ্রায় দেহপিণ্ড আমাদের পৃথিবী আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে বড় ভালবাসিতেন, এই জন্যই বারংবার তিরস্কৃত হইয়াও উঁহার নিকট বারংবার যাইতেন এবং উঁহাকে ব্রাহ্মণ করিবার জন্য বারংবার উদ্যোগও করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি দেখিলেন, বায়ু-অভাবে অচিরাৎ বিশ্বামিত্রের প্রাণনাশ হয়। এ জন্য নিজে পৃথিবী-বায়ু আনিয়া তাঁহার নিকট ধরিলেন। বিশ্বামিত্রের প্রাণবিয়োগ হইল না, কিন্তু তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য-পথে মূর্চ্ছিতভাবে পড়িতে লাগিলেন। মুখে রক্তবমন হইতে লাগিল। শরীর ফুলিয়া উঠিল। আর তিনি পড়িতে লাগিলেন, কে জানে, কত কাল ধরিয়া তিনি পড়িয়াছিলেন?

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।



স্বদেশ-মন্ত্র

হে ভারত! ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।

হে বীর! সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ—আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ।
১৮৬২ - ১৯০২

গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্ম্মল নীলাভ জল— যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখ্‌না গোণা যায়, সেই অপূর্ব্ব সুস্বাদু হিমশীতল "গাঙ্গং বারি মনোহারি" আর সেই অদ্ভুত "হর্ হর্ হর্" তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সাম্‌নে গিরিনির্ঝরের "হর্ হর্" প্রতিধ্বনি,—সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার-শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ বারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্য্যন্ত দেখেচ; কিন্তু আমাদের কর্দ্দমাবিলা, হরগাত্র-বিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলিকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে, তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার—কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে এ কি সম্বন্ধ!—কুসংস্কার কি? হবে, গঙ্গা গঙ্গা কোরে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর-দূরান্তরের লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপাত্রে যত্ন কোরে রাখে, পালপার্ব্বণে বিন্দু-বিন্দু পান করে। রাজারাজড়ারা ঘড়া পুরে রাখে, কত অর্থব্যয় কোরে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায়—রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন্, মাল্‌টা—সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা-গঙ্গা—হিঁদুর

হি ছুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়েছিলুম—কি জানি বাগে পেলেই এক-আধ বিন্দু পান কর্‌তাম। পান কর্‌লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্ত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম পারিস, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম—সব লোপ হয়ে যেত, আর শুন্‌তাম—সেই "হর্ হর্ হর্", দেখ্‌তাম—সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায়-শিরায় সঞ্চার কর্‌চেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাক্‌চেন—"হর্ হর্ হর্!!"

* * * * *

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা-বোঁচা ভাই-বোন-ছেলে-মেয়ের চেয়ে গন্ধর্ব্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্ব্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখ্‌বার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গালা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ—কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময়, মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইচে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ,—এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনারা, বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড-

হারদ্বারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে, সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোণালি কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্‌চে, তার নীচে ফিকে, ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কালো-মেশানো, ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ী ঢালা আঁব-নীচু-জাম-কাঁটাল,—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড়-ঝাড় বাঁশ হেল্‌চে দুল্‌চে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানি তুর্কিস্তানি গাল্‌চে-দুল্‌চে কোথায় হার মেনে যায়—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে-ছুঁটে ঠিক কোরে রেখেচে; জলের কিনারা পর্য্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেচে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে-আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্য্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি, আর কোথাও দেখেচ? বলি, রঙের নেশা ধরেচে কখন কি—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হু, বলি—এই বেলা এ গঙ্গা-মার শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও, আর বড়একটা কিছু থাকচে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ-সব যাবে। ঐ ঘাসের যায়গায় উঠ্‌বেন—ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন—ইটখোলার গর্ত্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে

খেলা করচে, সেখানে দাঁড়াবেন—পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নীচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ও-সব কি আর দেখ্‌তে পাবে? দেখ্‌বে—পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আচেন কলের চিম্‌নি!!!

* * * * *

কি সুন্দর! সাম্‌নে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত—ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা—সেই "গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ।" সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির, সাম্‌নে মধ্যবর্ত্তী রেখা। জাহাজ এক বার সাদা জলের এক বার কালো জলের উপর উঠ্‌চে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সাম্‌নে-পেছনে আশে-পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল-পট্টবাস-পরিধান। কোটী কোটী অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জ্জন, বিকট-হুঙ্কার, ফেনময়-অট্টহাস দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতাণ্ডবে মত্ত হয়েচে! তার মাঝে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগর ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী—বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্ত্তিমান আত্ম-নির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান—সগর্ব্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্ফ গুরুগর্জ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্র-বল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের

হুহুঙ্কার—সে এক বিরাট্ সম্মিলন—তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি ; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীরনাদ ও তার-সম্মিলিত "রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্" মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল !

স্বামী বিবেকানন্দ।



শুভ উৎসব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। দোল দুর্গোৎসবই কি, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি, আর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অল্প দিন-মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়া-কর্ম্মেই যেন কি একটি পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—প্রাচীনকালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল তাহা বুঝি আর থাকে না, ইহার ব্যাপক সার্ব্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশঃ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতামাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়! কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্ব্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজাপার্ব্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভকর্ম্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত যেন তাহার নিজের বাড়ীর কাজ। এক্ষণে নবাগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে—আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বুঝিতেছি; সুতরাং হৃদয়ের

কাঁচা সরস সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে, যে সকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এতদিন সজীব ও নবীন ছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেগুলি ক্রমশঃ মৃত্যুর মত হিমপাণ্ডু হইয়া আসিতেছে, এবং এই মৃত্যুহিম বিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহ-বাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্য-সঞ্চার-চেষ্টার মত উৎসব-শ্রীসম্পাদনে এই সমারোহাড়ম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চঞ্চল আলোকরশ্মি জনতার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন ম্লানমুখে প্রতিফলিত হইয়া আমাদের শীর্ণ মূর্ত্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে হৃদয়ের সম্বন্ধাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূক্ষ্ম বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন দশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপর্ব্বের ভারও তখন পাঁচ-জনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরা-কাণ্ডেও সকলের সমবেত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যতন্ত্রের নাগরিক অধিকার-অনধিকার-বিধি তখনও হয় নাই—সুতরাং আমার কাজে খাটিয়া দিতে পাঁচজনের অনধিকার সঙ্কোচও বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচজনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনরূপ দ্বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে আঁটিয়া পরিবেষণে লাগিয়া যাইত, কেহ বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ

করিত, নিতান্ত কোন কাজ না পাইলে ডাক্‌হাঁক ও মোড়লী করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঔদাস্যভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসব-সৌষ্ঠব-সম্পাদন-বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজহস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত; এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইত।

এখনকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশঃই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গাম যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়ত সূক্ষ্ম-রূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সেকালে বরঞ্চ পাওনাগণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনি যেন সে বিনা অর্থেও ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইত এবং উক্ত কার্য্য না করিলেও কর্ত্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুম্ভকার

শুভ কার্য্যের দিনে গুটিকতক চিত্রিত নূতন ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্ম্মই বন্ধ হইয়া থাকে, পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তাবন্ধন—এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায়। সেই জন্যই মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কাঁসার কুমোর ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাওয়ে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায়; এমন কি, নাপিত, পাচক, পরিবেষকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়াকর্ম্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী-পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেনারসী ও

চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা— নানান্ জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, মেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না, এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না-হইবে দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড় বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে "ফাউ" আদান-প্রদানটুকু ইহাতেই বিশেষ আনন্দ, এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান-প্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নবনব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী

নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালাপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সূতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুঞ্জন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার-প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনা-পাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে —যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভ কামনা কার্য্য করে, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্য-বিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক্ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্ব্বের মত এক-সংসারভুক্ত অবশ্য-পোষ্য-সম্বন্ধ

ঘুচিয়া গিয়া বিদেশী ইংরাজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, পাকা নব্যতন্ত্রিগণের নিকট সেকালের মাঠাকুরাণী দিদিঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্য্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল সামান্য পরিবর্ত্তন হয়ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসবপ্রসঙ্গে এ সকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট-সম্বন্ধস্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলি যে বড়বড় পূজাপার্ব্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বার ব্রত, যে কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়;

এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশ্বঃ গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্যদিন কোন শুভতিথি বা বার-মাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্ব্বণ, কোন দিন বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃ-পূজন, কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখিবন্ধন, কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোন দিন পৌত্রের জাতকর্ম্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতেখড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত—যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তের পার্ব্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতিমাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা দাঁড়াইয়া যায়, এবং ধর্ম্ম-কার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান, ধ্যান, সদনুষ্ঠান ও দশজনের সহিত আত্মীয়তা-প্রকাশ ও সকলের আনন্দবর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য, একটা উপলক্ষ পাইলেই হয়।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয়ত এতটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণকামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীন-দুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী

করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সংকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতি-ব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না,—প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূত-পল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিব-সুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভ কামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অশ্রুজল

জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়তন্ত্রীতে এক একটি সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যেদিন আঘাত পড়ে সেইদিন সহসা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন তড়িৎ-স্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মথিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের হয়ত গভীর সুখ-দুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উচ্ছ্বাস যখন সংযত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয়ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায় এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রুভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্যের বিজন কাননে

যখন আত্মহারা দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা; আসন্ন নির্ব্বাণের বিবর্ণ অধরে যখন ক্ষীণ দীপশিখার মত একটি ম্লান অস্ফুট রজত-সৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন সেও ত সেই অবসন্ন হৃদয়ের নীরব ভাষা। তাই বলিয়া এসব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে মাত্র, কিন্তু একভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত এক নয়—বেশ একটু তফাৎ আছে।

নয়নে অশ্রু বহে কখন? অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। আনন্দেও অশ্রু ঝরে। সুখের শুধু অশ্রু নাই। দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা-উচ্ছ্বাস। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি? দীর্ঘনিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, অশ্রুজলে শান্তির ভাব। হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়া আপনার মধ্যে মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া মরে। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অন্তর্দাহ হয়, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। অশ্রুজলে এ দাবানল ভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায়; বেদনার অনেকটা উপশম হয়। দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায়? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতিদিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া থাকে, তাহার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ঘুচে না। এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আট্‌কাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে। তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে

কল্পনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উথলিয়া উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত যেন হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই শুকাইয়া আসে, তখন উন্মাদ-হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—ম্লান, ক্ষীণ, নিভ-নিভ। সে যাতনায় শান্তি আছে,—দীর্ঘনিশ্বাসের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুছিতে থাকে, তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু আশা আছে—তখন অভিমানকে শান্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শান্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অনুতাপও চোখের জল ফেলিলে, ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বুঝি নব-উদ্যমে কাজে লাগে। আর অনুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু দুঃখের গভীরতা কোথায়—অশ্রুজলে কি দীর্ঘনিশ্বাসে? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও যেমন, অশ্রুজলের হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধ প্রবাহ, রুদ্ধ উচ্ছ্বাস-যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর সেখানে উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই

ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে — হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলট্‌পালট্‌ হয় যে, কিছুই যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিশ্বাসে সান্ত্বনা পায় না। অশ্রুজলে কতকটা তবু সান্ত্বনা আছে—আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমদুঃখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসে জীবন যেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উদ্যমে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটী বড় পরিস্ফুট—নৈরাশ্য নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটী পবিত্র সৌন্দর্য্য চিরবিকশিত—সেই ভাবটী। সে ভাবে উগ্রভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রৌদ্র ভাব বলা যাইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায় ততই তাহার গভীরতার উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই, যত ডুবি আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর বুঝি কোথাও নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচজনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জ্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ

ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভান না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাণিত দন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই জন্য হৃদয়ের অশ্রুজল বিজন অরণ্যের শান্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠ-স্ফীত বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া দু'এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারিদিকে পরহৃদয়চ্ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আইনবদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হৌক, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না একদিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসীম সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত যাহা উঠে—অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি সুগভীর স্নেহ, শান্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যখন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরকযন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা-ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি! অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-তপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নির্ম্মম হাহাকার ঘুচিয়া যাক। সংসারের শোক-তাপ-ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয়পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হোক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানব-শিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে,—বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির-রচনায় সাহায্য করিয়াছেন; রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির-গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন।—বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহা-বংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্ন-রাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত

ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে,—এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, এ কথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

(ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও, সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ-বপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্ত্তন অধিকতর পরিশ্রম-সাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ।) অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জল-সেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ-নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্যশালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম-সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। এখন দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপ নয়নে চাহিতেছেন; কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর-সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে—দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে—ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন

করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এত দিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটী-রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্-বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে তাহা যেন নষ্ট না হয়,—তাহার উর্ব্বরতা যেন কতকগুলি আবর্জ্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

"বিশেষ বিবেচ্য" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এত কাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত—কি প্রতীচ্য, কি প্রাচ্য এই উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন—বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ কেবল তাঁহাদের—সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের—অবসর বিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? এক প্রকার ছিলই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস-কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথের নাম বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটী বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জিত হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল,

এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি,—সর্ব্ব প্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে 'জাতীয় সাহিত্য' বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন বঙ্গভাষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য-গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপ ভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই-একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃতব্যবসায়ী অধ্যাপকবর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তর-কালেও তাঁহারা সে উচ্চাসনের অধিকারী থাকিবেন সত্য; কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধারলে, বঙ্গের প্রায় প্রতিপল্লীতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যে স্থানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে সে স্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে যেখানে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব, এমন পল্লী বঙ্গে থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জনসাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে।

যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাহাদের বাস, সেই সেই পল্লীতে এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক,

সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন-না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস—যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না—সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা-সহকারে লোক-মত পরিচালনা করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লান মনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতগণকে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্য-প্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না।

স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়,—সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা-গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য-গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত কোন ভাবুক ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতাপূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাঁহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন-না, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সাধারণ মত-গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ঐ মাতৃভাষাকে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্ব-প্রথম কর্ত্তব্য। কেন-না, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথায়, তাঁহাদের আচার-ব্যবহারে, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জন-সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি

সহজেই সাধারণকে স্ব স্ব মতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির—উদীয়মান জাতিরও—স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক, অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাঁহারা বঙ্গের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে—সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে—সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে—অধঃপাতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন জনসঙ্ঘের চিত্ত শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাকচিক্যে বশীভূত করিয়া যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্—এই দুই-এরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্-বিপদ্ উভয়ই নির্ভর করিতেছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জনসঙ্ঘকে যদি সৎ পথেই লইয়া যাইতে হয়—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে

পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্ত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্মসমাজের কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয় আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী হইতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্ত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্পবিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু-না-কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশসমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে; কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায় কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে,—সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এ দেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এ দেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়,

এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে সেই পথে আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়-প্রণালী অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাঁহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই,—অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ-কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টিবাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটীতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিত-গণের প্রতিপদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়-বশতঃ ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে—সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে—পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছ দর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বনপূর্ব্বক দোষ-পরিহার ও গুণ-গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহ কালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়। ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিক-বাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বরং যতটা সম্ভব, উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশপূর্ব্বক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয় সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বপ্রকারে তাহা করিতে হইবে।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।



তাজমহল

সম্রাটের নিবাস-দুর্গের অভ্যন্তরস্থ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে যখন গাইডের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন এক সময়ে সে আমাকে এক আলোকহীন নির্ব্বাত সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকদূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছিল; কিছুদূর পর্য্যন্ত সিড়ি দিয়া নামিয়া যাইতে হয়, তাহার পর পথ ক্রমে অপ্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে এবং উহা এমন সূচিভেদ্য অন্ধকারে আবৃত যে, সে অন্ধকারে অল্পক্ষণ থাকিলেই সূর্য্যচন্দ্রালোকিত ধরণীর বক্ষোবিহারী জীবের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হয়। বৃহৎ একটি মশাল জ্বালাইয়া আমাদের সঙ্গে এক ব্যক্তি সেই সুড়ঙ্গপথে পথ দেখাইয়া যাইতেছিল, আমি এবং আমার গাইড মীর খাঁর তৎকালীন মনোভাব কি ছিল জানি না; আমি স্বীকার করিতেছি যে যতদূর আমি সেই সুড়ঙ্গপথে নামিয়া গিয়াছিলাম, ভয়লেশশূন্য দ্বিধাহীন চিত্তে যাই নাই। কিছুদূর গিয়া যখন অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল এবং বায়ুহীন সুড়ঙ্গের আর্দ্রমৃত্তিকা আমার পায়ে ঠেকিতে লাগিল, আমি আর অগ্রসর না হইয়া মীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাতালোকবর্জ্জিত এই পাতালপুরীর সুড়ঙ্গপথ মোগল বাদশাহগণের কি প্রয়োজনে লাগিত, জান? সে আমার প্রশ্নের রকম শুনিয়া হাসিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই:—মুসলমান বাদশাহগণের একাধিক বেগম থাকিতই। যদি কখনও কোন বেগমের স্নেহ মমতা প্রেম ও সতীত্বের প্রতি

বাদশাহের সন্দেহ জন্মিত, তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান হইত। কিন্তু বধদণ্ডার্হ সাধারণ জনগণের মৃত্যু-ব্যবস্থার সহিত বেগম-গণের মৃত্যু-ব্যবস্থা এক হইতে পারে না এবং প্রকাশ্য স্থানেও তাহাদের বধকার্য্য সমাধা হইতে পারে না, সেই জন্য রঙমহলের মধ্যে এই অন্ধকার মৃত্যুপুরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত, তাহাকে এই আলোকহীন বায়ুশূন্য পাতাল-পুরীতে রাখিয়া তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত। অল্পকাল মধ্যেই সে হতভাগিনী এই অন্ধকার হইতে আর কোন গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হইত কি না কে জানে? এইরূপে নিরুদ্বেগে বেগমের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত, বাহিরের কাকপ্রাণীতেও জানিতে পারিত না।

সূচিভেদ্য অন্ধকারাবৃত বাতবিবর্জ্জিত মৃত্যুপুরীর সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া মীর খাঁর মুখে এই কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমি আর অগ্রসর হইলাম না। তাহাকে কহিলাম, "ফিরিয়া চল।" এই বলিয়া আমি সর্ব্বাগ্রে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মীর খাঁর ইচ্ছা ছিল যে আরও কিছুদূর আমরা যাই; সে বারংবার বলিতে লাগিল যে আর একটু অগ্রসর হইলেই যেখানে বেগম সাহেবাদিগের বধকার্য্য শেষ করা হইত, সে অন্ধকার মৃত্যুগহ্বর দেখা যাইবে। আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যে ব্যক্তি মশাল লইয়া গিয়াছিল তাহাকে ফিরিতে বলিলাম এবং এক তিলও অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে, যে পথে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই পথে, ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। অগত্যা মীর খাঁ এবং মশালচীও আমার সঙ্গে ফিরিল। সুড়ঙ্গপথ এমনই বায়ুহীন যে, যে সময়টুকু আমরা

সেখানে ছিলাম সেই অল্পকাল মধ্যেই আমাদের মশাল দুই তিন বার নিবিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, জানি না কি কৌশলে মশালচী একেবারে উহা নির্ব্বাপিত হইতে দেয় নাই। যদি সেই বাতালোক-বিবর্জ্জিত রসাতলপথে আমাদের মশালটি নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে আমি যে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমার কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হইতেছে না। যাঁহারা আগ্রাদুর্গের এই রসাতলপুরীর অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সত্য সত্যই কিংবা ভয়ে জানি না, যখন সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে দাঁড়াইয়া অভাগিনী বেগমগণের শোচনীয় মৃত্যুগল্প খাঁ সাহেবের মুখে শুনিতেছিলাম, আমার বোধ হইতে লাগিল যেন শ্বাসক্রিয়া-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাহার উপরে সেই বায়ুহীন রসাতলের আর্দ্রমৃত্তিকার স্পর্শ যখন পদতলে অনুভব করিলাম তখন মনে হইতেছিল, সত্য সত্যই বুঝি যমপুরীতে আসিয়াছি এবং আর কিছুক্ষণ এখানে বিলম্ব করিলে ভূতপূর্ব্ব বেগমগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভও বুঝি অসম্ভব নহে। মীর খাঁ তাহার গাইডগিরি ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর হইতে বহু লোককে এই যমদ্বার দেখাইয়া আনিয়াছে; সুতরাং তাহার মনে কোন আশঙ্কা জাগিবার কোন কারণই হয়ত ছিল না। কিন্তু বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমও যাহার পূর্ণ হয় নাই, সেরূপ বঙ্গ-সন্তানের মনোভাব সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে বিশেষ আয়াস করিতে হইবে না। যাহা হউক, সেই যমপুরীর অন্ধকার দ্বারদেশ হইতে উদ্ধারলাভ

করিয়া আর বিলম্ব করি নাই এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাজগঞ্জে পৌছিতে হইবে বলিয়া সেই সময়েই তদভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম।

আগ্রাদুর্গের ফটক হইতে তাজের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পথ নিতান্ত কম নহে; এই দীর্ঘপথ একাকী গাড়ীতে বসিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল এবং তখন মনের মধ্যে কত কি যে উদয় হইতেছিল তাহা আজ বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার উপায় নাই। তবে এইটুকু মনে আছে যে, যে রাজাধিরাজের অকৃত্রিম নিবিড় প্রেম এবং দুঃসহ বিরহ-বেদনার মূর্ত্তচ্ছবি পৃথিবীর নানা দিগ্দেশাগত বিরহবিধুর নরনারীর হৃদয়ের ধন হইয়া রহিয়াছে, সেই প্রেমিক-প্রধান শাজাহানের নিবাস-দুর্গে নারীবধের নির্ম্মম আয়োজনের সামঞ্জস্য আমি নিজ মনে রক্ষা করিতে পারিতে-ছিলাম না;—কেবলই আমার মনে হইতেছিল যে ঐ অন্ধকার বায়ুবিহীন মৃত্যুপুরী শাজাহানের পূর্ব্বগত বা পরবর্ত্তী কোন সম্রাটের কীর্ত্তি; শাজাহানের আজ্ঞায় উহা কখনই নির্ম্মিত হয় নাই। কিংবা সেই অন্ধকার ভূ-গৃহ অন্য কোনও প্রয়োজন-সাধনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, নিঃস্নেহ নারীর নিধনকল্পে নির্ম্মিত হইবার কথা মীর খাঁর কল্পিত কাহিনী। প্রিয়-বিয়োগের দিন হইতে মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাহার অশ্রুজলের বিরাম ছিল না, যে বাদশাহের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, ঊর্দ্ধ-তার লোচন প্রিয়দয়িতার সমাধি-মন্দিরের স্বর্ণশীর্ষ নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিরদিনের জন্য নিমীলিত হইয়া গিয়াছে, চির-বিরহের দুঃসহ দুঃখে উচ্ছ্বসিত যাহার দীর্ঘশ্বাস আজও বুঝি তাজের মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটি নারীর শেষ-শয়ন রচনা করিতে রাজকোষ শূন্য করিয়া যে প্রেমিক সপ্তসাগরের মণিমাণিক্য পরম যত্নে

আহরণ করিয়াছেন, নারীবধের অমানুষিক নির্ম্মম অনুষ্ঠান তাঁহার অনুজ্ঞায় অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা আমার অন্তরাত্মা কিছুতেই মানিতে চাহিল না, এবং শাজাহানের উপরে আমার সাময়িক সন্দেহ সেদিনে ক্ষণকালের জন্যও যে গিয়া পড়িয়াছিল, সেজন্য আমি সেই লোকান্তরিত প্রেমসর্ব্বস্ব সম্রাটের উদ্দেশে যোড়করে বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

নিজ মনে এইরূপ কত কি চিন্তা কতক্ষণ ধরিয়া করিতেছিলাম, তাহা ঠিক মনে নাই। এক সময়ে দেখিলাম আমাদের গাড়ী কতকগুলি পাথরের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোচ্‌বক্স হইতে মীর খাঁ নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল, এবং আমাকে উদ্দেশ করিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "হুজুর, গাড়ী তাজগঞ্জ পঁহুছ গেয়ী।" আমি সুপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া উঠিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম।

এ যে দিনের কথা বলিতেছি, সে দিনে ম্যাক্‌ডোনাল্ড পার্ক রচিত হয় নাই, পত্র-পুষ্প-পল্লব-সমাকুলিত বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ উদ্যানের মধ্য দিয়া নতোন্নত প্রশস্ত রাজপথ তাজ-তোরণের সম্মুখে গিয়া শেষ হয় নাই। সে দিনে আগ্রা সহর হইতে যে পথে তাজের দ্বারদেশে পঁহুছিতে হইত সে পথ ধূলিমলিন, অমেধ্য-সমাকীর্ণ, সংস্কারবিহীন এক প্রকার দুর্গম পথই ছিল। তাজ-দর্শনার্থিগণ নানাবিধ যান-বাহনের সহায়তায় কোনমতে তাজের দ্বারদেশে গিয়া পঁহুছিত। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তাজ-তোরণের সম্মুখে কতকগুলি প্রস্তর-বিক্রেতার দোকান থাকায় ক্রেতা-বিক্রেতার সমবেত সোর-হাঙ্গামায় সমাধি-মন্দিরের শব্দবিহীন স্তব্ধ মহিমা এবং শান্তির সম্যক্‌ ব্যাঘাত জন্মাইত। গাড়ী হইতে যেমন

নামিয়াছি, মুহূর্তের মধ্যে দেখিলাম প্রায় ত্রিশজন পাথরওয়ালা তাহাদের নানাবিধ কারুখচিত পাথরের থালা, রেকাবী, গেলাস, বাটি লইয়া আমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং কে কত সস্তায় সে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবার প্রাণপাত চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের প্রাণপ্রিয়তমা মহিষীর শ্মশানশয্যার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের এই কর্ণভেদী শব্দ আমার সমস্ত হৃদয়-মনকে যেন বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত তাজসুন্দরীর তোরণদ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

তাজ-তোরণের বিরাট্ মহিমা এবং তাহার শিল্প-নৈপুণ্যের কথা বহু পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং লোকমুখে সে কথা বহুবার শুনিয়াছি। কিন্তু সে দিকে আমার মন ছিল না এবং সেই তোরণদ্বারের দিকে দৃষ্টি দিয়া সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছাও আমার ছিল না। ব্যথিত রাজরাজের বিয়োগবেদনা মন্থিত করিয়া ধরণীর যে অষ্টম বিস্ময়ের জন্ম সম্ভব হইয়াছে, সেই পাষাণসুন্দরীকে কখন দেখিব সেই আগ্রহে আমি পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া ছিলাম।

তাজগঞ্জে পঁহুছিয়াই একেবারে তোরণদ্বার পার হইয়া গিয়া সেই অমল ধবল পাষাণনির্ম্মিত শোকমূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম দর্শনে মনের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইয়াছিল কি না এবং হইয়া থাকিলে কি ভাব তখন মনে আসিয়াছিল, কর্ণ যাহা শুনিয়াছিল চক্ষু তাহা দেখিল কি না, কিংবা যাহা দেখিল, কোটিকল্প ধরিয়া কীর্ত্তিত মহিমা তাহার তুল্য হইতে পারিত কি না, এ সকল কোন কথাই আজ বলিতে

পারিব না।) কেবল এই মাত্র মনে আছে যে, পৃথিবীর সেই শ্রেষ্ঠতম বিস্ময়ের সম্মুখে বিস্মিত ও নিমেষহত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম এবং কেবলই মনে হইতেছিল যে ইহাকে না দেখিলে এবারের মানবজন্মটা নিতান্তই নিষ্ফল হইত। ✓

এ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহা মনে নাই, বোধ হয় বহু ক্ষণই হইবে। এক সময়ে মীর খাঁ আমার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "হুজুর চলিয়ে, ভিতর যাকে দেখিয়ে।" তাহার কথায় মন্ত্রচালিতের মত চলিলাম। তোরণ হইতে তাজের রক্তপাষাণ-নির্ম্মিত আসনপীঠ পর্য্যন্ত যে সকল ধারা-যন্ত্র সারি সারি সাজান রহিয়াছে, সে দিকে এবং চতুর্দ্দিক্‌স্থ কুঞ্জবনের বৃক্ষবল্লরীর দিকে মীর খাঁ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, আমি নীরবে হস্তদ্বারা তাহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে ইঙ্গিতে বলিয়া, আমার নির্নিমেষ নয়ন তাজসুন্দরীর দিকে একাগ্রভাবে নিবদ্ধ রাখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই রক্তপাষাণ-বেদিকার নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং পাদুকা উন্মোচন করিয়া শ্বেত-প্রস্তরের সিঁড়ি বাহিয়া তাজ-যোগিনীর মর্ম্মর-যোগাসনের সন্নিহিত হইলাম। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে তীরস্থ হইয়া ভক্ত যেমন পাদস্পর্শ-জনিত পাপের ক্ষয়-কামনায় সুরেশ্বরীর উদ্দেশে "অতঃ স্পৃশামি পাদাভ্যাং পাপং মে হর জাহ্নবি" বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, জানি না কেন সে দিনে সেই শুভ্র নিষ্কলঙ্ক শ্বেতমর্ম্মর-বেদিকার উপরে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে আমারও অন্তরাত্মা পাদস্পর্শ-জনিত প্রত্যবায়ের ক্ষমার জন্য পরলোকবাসিনী সম্রাজ্ঞী বানু-বেগমের উদ্দেশে তদ্রূপ কোন মন্ত্রোচ্চারণের জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও যোড়করে অনুষ্টুভ্‌ ছন্দের

কোন সংস্কৃত শ্লোক সশব্দে উচ্চারণ করি নাই, কিন্তু 'ময়ূর-সিংহাসনে' সমাসীন রাজাধিরাজের হৃদি-সিংহাসনের একাধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশে তাঁহার শেষ-শয়ন-সন্নিধানে উপনীত হইবার জন্য মর্ম্মরপীঠে অপরিহার্য্য পাদস্পর্শ-পাপের অপরাধ-ভঞ্জনকল্পে অন্তরোত্থিত মন্ত্র যে অন্তরে-অন্তরেই উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা আজও আমি বিস্মৃত হই নাই।

গতপ্রায় বসন্ত-দিবসের অস্তগামী সূর্য্যালোকে তাজের অভ্যন্তরের কারুশোভা যেখানে যাহা দেখিবার ছিল, তাহা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। গাইড মীর খাঁ কোন্ মূল্যবান্ প্রস্তর কোথা হইতে কত মূল্যে আসিয়াছে এবং কোন্ শিল্পী কোথা হইতে আসিয়া কত দিনে কতটুকু শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত তালিকা আমাকে শুনাইতে লাগিল সত্য, কিন্তু সে দিকে আমার কিছুমাত্র মনোযোগ ছিল না। আমি আমার সকল মন এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম দিয়া এই স্মৃতিমন্দিরের দেহহীন সৌন্দর্য্যটুকু ধরিবার প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছিলাম। ইহার প্রতি প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে বিবিধ বর্ণানুরঞ্জিত-প্রস্তরখচিত ভিত্তিগাত্রের এবং শবাধারের আচ্ছাদন-শিলার শিল্পকৌশলের মধ্যে বাদশাহের বিপুল প্রেম এবং বিরহীর বিরাট্ বেদনা কেমন করিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাই বুঝিবার চেষ্টায় আমার সকল মন-প্রাণের শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলাম। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবনে আমি শতাধিকবার তাজ দেখিয়াছি—যখনই পশ্চিমে গিয়াছি, টুণ্ডলা ষ্টেশনের নিকট দিয়া যাইতে হইলেই একবার তাজ দেখিয়া তবে আমার গন্তব্য স্থানে যাইতে মন অগ্রসর হইয়াছে।

স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আগ্রায় আমি কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। সে সময়ে প্রতিদিন অপরাহ্ণে বায়ুসেবনের ছলে তাজ দেখিতে গিয়াছি; প্রথম যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা বয়সে—কত সুখ কত দুঃখের দিনে, কত শোক ও আনন্দের মুহূর্ত্তে, কত মিলন ও বিরহের হর্ষ-বিষাদে, বারবার করিয়া দেখিতে দেখিতে তাজের সম্বন্ধে যে ভাব আমার হৃদয়ে আজ জাতমূল হইয়া গিয়াছে, প্রথম দর্শনের মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে সেই ভাব পরিপূর্ণরূপে আসিয়াছিল এ কথা বলিলে ঠিক বলা হইবে না; এবং তাজ সম্বন্ধে আজ যাহা বলিতেছি, তাহা ঠিক সেই প্রথম দর্শন-দিনের কথা, ইহাও ঠিক নহে। প্রথম দর্শন-মুহূর্ত্তে মনে হইয়াছিল ইহা অপূর্ব্বদর্শন, ইহাকে না দেখিলে দর্শনেন্দ্রিয় সার্থক হয় না—এই মাত্র। তাই ইহাকে বারবার করিয়া দেখিয়াছি এবং বারংবার দেখিতে দেখিতে আজ বুঝিয়াছি যে, পরিণত জীবনে বিশ্ব-ভুবনের সকল-বাড়া জীবনসর্ব্বস্ব ধনটিকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে বিদায় দিয়া সেই অসহ্য বিরহের বিপুল দুঃখে উচ্ছলিত অশ্রুসমাকুল নয়নে তাজসুন্দরীর দিকে না চাহিলে শাজাহানের সুনিবিড় প্রেম ও সুদুঃসহ বেদনার কোন পরিমাপই পাওয়া যায় না।

তাজের অভ্যন্তরভাগ দেখিয়া যখন পুনরায় বাহিরে আসিলাম তখন গোধূলিলগ্ন প্রায় সমাগত। অস্তগমনোন্মুখ দিননায়ক পশ্চিম-শিখরীর উপর ঢলিয়া পড়িতেছেন। দিনশেষের ম্লানায়মান রবিরশ্মি কয়টি যাই যাই করিয়াও যেন যাইতে পারিতেছে না। শাজাহানের অফুরন্ত প্রেমের পরম ধনটি যেখানে তাহার শেষ-শয়ন বিছাইয়া চিরদিনের জন্য চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে, সেই

প্রেমমন্দিরের শুভ্রশীর্ষে এবং তাহার সুবর্ণচূড়ায় পরম স্নেহভরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের যেন যাইবার উপায় নাই। স্নিগ্ধ সান্ধ্য রবির কিরণ কয়টি কবর-চূড়ায় পড়িয়া তাহাকে যে কি শোভাই দিয়াছিল, তাহা না দেখিলে বলিয়া বুঝাইবার ভাষা কি আছে? নীল নির্ম্মল বসন্তাকাশের নিবিড় নীলিমার নিম্নে পদতলবাহিনী নৃত্যপরা নীল যমুনার ঊর্দ্ধে, কালিন্দীর তটসংলগ্ন নিকুঞ্জের শ্যাম মহোৎসবের মধ্যে শুভ্রমর্ম্মর-বিনির্ম্মিত গম্বুজের শ্বেতাম্বুজের উপরে রবিকিরণ-সম্পাতের শোভা যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, কোন বর্ণনা দ্বারাই তাহাকে সে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বুঝান যায় কি না জানি না—বোধ হয়, না। সে দিনে পূর্ণিমা ছিল, কি প্রতিপদ, তাহা আজ ঠিক মনে নাই—ফলতঃ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সম্পূর্ণ গৌরবে পূর্ণপ্রায় চন্দ্রমার বিকাশের দিন, তাহা মনে আছে। চন্দ্রকরস্নাতা তাজসুন্দরীর অপরূপ লাবণ্য দেখিবার জন্য উদ্যানমধ্যস্থ শ্বেতমর্ম্মরের 'চবুতরা'র উপরে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ এক সময়ে মনে হইল, অপূর্ব্ব আলোকে তাজের মর্ম্মর-গম্বুজ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখি কোমল জ্যোৎস্নাধারা পাষাণসুন্দরীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া চতুর্দ্দিকের কালো আকাশ আলো করিয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন বিচ্ছুরিত চন্দ্ররশ্মিগুলি কোমল আলোকের রজ্জুরূপে চাঁদ এবং তাজকে একগ্রন্থিবন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছে। প্রাণহীন কঠিন পাষাণের উপরে সূর্য্যচন্দ্রের কিরণসম্পাতে তাহাকে এমন কোমল করিয়া তুলিতে পারে, এত সৌন্দর্য্য তাহাকে দান করিতে পারে, ইহা আমি জীবনে এই প্রথম দেখিলাম; এবং ইহাই শেষ, কারণ

তাজ ব্যতীত অন্য কোন মন্দির, মীনার, মস্‌জীদ, কবর, পুরী, প্রাসাদের কথা শুনি নাই বা পুস্তকে পড়ি নাই, যাহাকে অন্তরীক্ষ-চারী রবি-চন্দ্র-তারকা প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহের রশ্মিরেখা প্রতিদিন নব নব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া মানবের নয়ন-মনের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে পারে। অস্তগমনোন্মুখ রক্তরবির রক্তিম রশ্মি-রেখায় মণ্ডিত তাজের সম্মুখে যখন দাঁড়াইলাম, তখন সেই দিনের কথা মনে আসিল, যে দিন সেলিম-নন্দন শাজাহান 'খুস্‌রোজের মীনাবাজারে' আসফ্‌নন্দিনী অনূঢ়া বানুর বিপণির সম্মুখে মুগ্ধনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রালোকে পরিস্নাত তাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যখন তাহাকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তখন এই মর্ম্মর-মন্দিরকে স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনে হয় নাই। মনে হইয়াছে, রাজাধিরাজের পরিপূর্ণ প্রেমে পরম পরিতৃপ্তা প্রিয়রাণী তাঁহার অনিন্দ্য প্রৌঢ় সৌন্দর্য্যে রাজপুরী আলো করিয়া যেন অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। যে দিন বালসূর্য্যের অরুণিমায় পরি-ভূষিতাঙ্গী পাষাণসুন্দরীকে দেখিয়াছি, সে দিনে মনে হইয়াছে, যেন প্রাতঃস্নাতা পূজার্থিনী দেবমন্দিরে আত্মনিবেদনার্থ প্রস্তুত হইয়া মন্দিরপথ আলো করিয়া যাত্রা করিয়াছে; দিবা দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রতাপ-স্তব্ধ বিমল যমুনার তীর-পুলিনে তাজসুন্দরীকে যে দিন বাক্যহীন মহামৌনতার মধ্যে সমাহিত দেখিয়াছি, সে দিন এই পাষাণসুন্দরী আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রিয়-প্রেম-প্রার্থিনী পঞ্চতপা পার্ব্বতীর পরিপূর্ণ গৌরবে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

দুঃখ-শোক-বন্ধন-বেদনায় জর্জ্জরিত মানবজীবনে প্রেমের মত একান্ত প্রার্থনার সামগ্রী হয়ত দ্বিতীয় আর নাই। অসীম সম্পদের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিতই থাকুক, কিংবা দারিদ্র্যের সহিত

দৈনিক যুদ্ধে সর্ব্বাঙ্গে শ্রমজলের বন্যা বহিতেই থাকুক, একজনের একনিষ্ঠ প্রেমের সুনিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার ইচ্ছা মানবহৃদয়ের একান্ত স্বাভাবিক ইচ্ছা। যাহার আগমন-প্রতীক্ষায় আকুল দুইটি আঁখি দিনান্তে দ্বারপ্রান্ত হইতে পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না, প্রজ্বলিত সান্ধ্য দীপালোকে রজনীর বিশ্রামার্থ শয্যারচনা যাহার জন্য হয় না, ব্যাধি-পীড়ার দিনে দুই খানি শ্রান্তিহীন সেবাহস্তের সস্নেহ শুশ্রূষা দিতে এ সংসারে যাহার কেহ নাই, তাহার জীবনের সহিত তুলনায় আরবের বালুবেলা এবং সাহারার মরুক্ষেত্রকেও সরস বলিতে হইবে। শাজাহান যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা মানবজীবনে দুষ্প্রাপ্য এবং রাজজীবনে অপ্রাপ্য বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। সুন্দরী-প্রধানা নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী বানুবেগমের সৌন্দর্য্যের স্তবগান ইতিহাস চিরকাল ধরিয়া গাহিয়া আসিতেছে; যে দিল্লীর রঙমহলে দিল্লীশ্বরের বিলাস-বাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত পৃথিবীর নানা দিগ্দেশ হইতে সমাহৃত নারীসৌন্দর্য্যের লীলাতরঙ্গ নিয়ত উচ্ছলিত থাকিত, সেই শুদ্ধান্তের সম্রাজ্ঞী যে সুন্দরী হইবেন ইহা বিশেষ বড় কথা নহে। কিন্তু বহুবল্লভ নৃপতির হৃদিসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার প্রেমরাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিতে পারা অতিবড় সৌভাগ্যের কথা, এবং মমতাজের অদৃষ্টে জীবনান্তের পরেও সে পরম সৌভাগ্য অটুট এবং অক্ষয় হইয়াই রহিয়াছিল। বাদশাহের সকলগুলি পুত্রকন্যার একমাত্র জননী হইবার সৌভাগ্য কেবল মমতাজের অদৃষ্টেই ঘটিয়াছিল এবং ইহা যে দিল্লীর রঙমহলের রাজ্ঞী-জীবনের কি অপার গৌরবের সামগ্রী তাহা তাঁহারাই জানিতেন, যাঁহারা সেই হত্যা-হলাহলে ভীষণ,

হিংসাদ্বেষে কলুষিত, একান্ত ভয়াবহ ঐশ্বর্য্য-নরকের মধ্যে নৃপতির নর্ম্মসহচরী হইয়া প্রবেশ করিতে বাধ্য হইতেন। কিশোরী বাম্নুর সৌন্দর্য্যমুগ্ধ শাহজাদা শাজাহান যে দিন এই নারী-রত্নকে জীবনসঙ্গিনীরূপে অন্তঃপুরের একান্তে বরণ করিয়া লন, সেই দিন হৃদয়ের নিভৃত-নন্দনজাত প্রেমমন্দারদামে যে অমূল্য অর্ঘ্য তাঁহার জন্য রচিত হইয়াছিল, তাহার একটিমাত্র পরাগকেশরও জীবনে পরিম্লান বা ধূলিমলিন হইতে পারে নাই। নারী-জীবনে ইহার অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে জানি না, এবং এ সৌভাগ্য বানু বেগম কেবল মাত্র তাঁহার জন্মকালীন গ্রহনক্ষত্রের সংস্থানবলে লাভ করেন নাই। তাঁহার রাজদয়িত তাঁহাকে যে অমূল্য, অপার্থিব, অনন্য-দুর্ল্লভ, পরম বাঞ্ছনীয় প্রেমের পুষ্পাসনে রাজরাজেশ্বরীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি কার্য্যে, প্রতিপাদক্ষেপের মধ্যে সেই প্রেমের প্রতিদান দিয়া আজ তিনি অমর হইয়া উভয়ের এই প্রেমকে অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন। যৌবনারম্ভের প্রথম দর্শনের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত হইতে যে প্রেম ইঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল, কোনও প্রতিকূল ঘটনাতেই সে প্রেমের সার্থকতা হইতে ইঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হয় নাই; কোন অকরুণ আত্মীয় বা আত্মীয়ার অকারণ মনোরঞ্জনার্থ এই প্রেমিক যুগলকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যর্থজীবন যাপন করিবার দুঃসহ বেদনায় জর্জ্জরিত হইতে হয় নাই। সৌভাগ্য বা সঙ্কটে, কিংবা রণে বনে দুর্গমে যখন যে অবস্থায় পড়িয়াছেন, এই রাজদম্পতীকে একদিনের জন্যও পরস্পরের বাহুবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে কেহই পারে নাই। যখন

সর্ব্বগ্রাসী কাল আসিয়া সেই অখণ্ড মিলনের মধ্যে বিয়োগের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করিয়া দিল, শাজাহানের সে দিনের বেদনা কেবল তিনিই জানিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে দিনের সেই উচ্ছ্বসিত শোকের হাহাকার ধ্বনিতে আকাশতল নিত্যকাল ধ্বনিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এই মৌন মর্ম্মর-মন্দিরের প্রতি-প্রস্তর-সন্নিবেশের মধ্যে যে নিদারুণ দীর্ঘশ্বাস রাখিয়া গিয়াছেন, প্রিয়-বিরহী আসিয়া এইখানে দাঁড়াইলে সে বক্ষোবিদারী দীর্ঘশ্বাস আজও শুনিতে পায়। তাই তাজকে সে আর কেবল প্রাণহীন স্মৃতিসৌধ বলিয়া মনেই করিতে পারে না।

জগদিন্দ্রনাথ রায়।

ডিরোজিয়ো ও তৎকালীন শিক্ষা

ডিরোজিয়োর নাম এখনকার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই অপরিচিত। কিন্তু এক সময়ে তিনি বঙ্গের ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ হিন্দু-কলেজের ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে কিরূপ রাজত্ব করিয়াছিলেন, এখন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ও দর্শনে ডিরোজিয়োর অসাধারণ অধিকার ছিল। তেইশ বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; কিন্তু সেই অল্প বয়সে তিনি যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক প্রাচীন ব্যক্তিতেও দুর্লভ। তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের কবিতা অনেক প্রবীণ কবিকেও লজ্জিত করিবে। কিন্তু কবি-শক্তির অথবা বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিয়োর প্রশংসা নয়; ছাত্রদিগের মনোবৃত্তির উন্মেষ করিবার জন্য তিনি যে আন্তরিক যত্ন করিতেন, তাহারই জন্য তাঁহার প্রশংসা। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে, বঙ্গদেশের আর কোন বৈদেশিক শিক্ষকই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। ছাত্রদিগকে কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন না; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেককে নিজের বাটীতেও লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতেন। পাশ্চাত্ত্য কবিগণের কাব্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অংশ, রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত হইতে তত্তদ্দেশীয় মহাপুরুষদিগের স্বদেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা এবং আত্ম-বিসর্জ্জন প্রভৃতি তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার অধ্যাপনার ও কথোপকথনের এমনই আকর্ষণ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে, কলিকাতার অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও, ঝটিকা, বৃষ্টি ভেদ

করিয়া, এমন কি গুরুজনদিগের নিষেধ অবহেলা করিয়া, তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতেন। কি যেন এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি নিজে অতি সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "ফকীর অব্ জঙ্গিরা" নামক খণ্ডকাব্য এবং নানাবিষয়িণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে, অতি আদরের সহিত পঠিত হইত। কলেজে থাকিতে তিনি "হেস্পেরস" (Hesperus) এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়ান" (East Indian) নামক একখানি পত্র সম্পাদন করিতেন। তাঁহার ছাত্রদিগকে তিনি এই সকল পত্রে লিখিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। তাঁহার উৎসাহদানের ফলে ও প্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং পরিণামে সাহিত্যের সেবা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এন্‌কোয়ারার" (Enquirer) এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিকের "জ্ঞানান্বেষণ" ডিরোজিয়োরই প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কোন সুলেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত ছাত্রেই সদ্‌গুরুর পরিচয়; ডিরোজিয়োর ছাত্রদিগের জীবন পর্য্যালোচনা করিলেও একথা সপ্রমাণ হইতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মশীল ও যশোভাজন হইয়াছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠ রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ডিরোজিয়োর শিষ্য। বঙ্গীয় সমাজের অনেক শুভজনক কার্য্য ইঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে কেবল ইংরাজী ভাষায় অধিকারলাভে সাহায্য করিয়া নিরস্ত থাকিতেন না। যাহাতে তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ, স্বদেশপ্রেমিক, এবং চিন্তাশীল হইয়া, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তজ্জন্যও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি ছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ ফিরিঙ্গি-সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি ভারতবাসীদিগকে পর এবং ভারত-বর্ষকে তাঁহার বিদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি ভারত-বর্ষকেই তাঁহার স্বদেশ এবং ভারতবাসীদিগকেই তাঁহার স্বজাতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের অতীত গৌরব ও বর্ত্তমান দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইত। কবিতায়, ছাত্র-দিগকে প্রদত্ত উপদেশে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে—নানাপ্রকারে তিনি ভারত-ভূমির সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার প্রণীত "ফকির অব্ জঙ্গিরা" নামক কাব্যের উৎসর্গপত্র পাঠ করিলে ভারতভূমির প্রতি তাঁহার যে কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ডিরোজিয়ো এদেশে সাধারণতঃ শিক্ষক নামেই পরিচিত; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সংস্কারকের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময়ও তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত লইয়া তখন বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই হয় ধর্ম্মসভা, না হয় ব্রহ্মসভা, উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ লইয়া তখন ভারতের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছিল। ডিরোজিয়ো তাঁহার ছাত্রদিগকে এই সকল আন্দোলনে যোগদান করিতে উপদেশ দিতেন। ভারতের মঙ্গলজনক কোন অনুষ্ঠান দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহার অধ্যাপনাগৃহ ছাত্রদিগের সমাজ, নীতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। শিক্ষকের সহিত অসঙ্কোচে তর্কবিতর্ক করিয়া ছাত্রেরা প্রত্যেক বিষয়েরই যৌক্তিকতা অথবা অযৌক্তিকতা নির্দ্ধারণ করিতে শিক্ষা করিতেন। স্বর্গীয় রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ডিরোজিয়োর অধ্যাপনাগৃহকে প্লেটোর "একাডিমস" (Academus) অথবা আরিষ্টটলের "লাইসিয়ম্" (Lyceum) এর ক্ষুদ্র অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার ছাত্র-দিগের চিন্তাশক্তির ও বিচারশক্তির উন্মেষ হইতে পারে, তজ্জন্য ডিরোজিয়ো, প্লেটোর "একাডেমি"র নামানুসারে, "একাডেমি" নামে ছাত্রদিগের এক সভা প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। মাণিক-তলায়, সিংহবাবুদিগের উদ্যানে, যেখানে বহুদিন ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশন ছিল, সেই খানে এই সভার অধিবেশন হইত। প্রতি-সপ্তাহে তাঁহার ছাত্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতেন। এই সভার প্রতিপত্তি এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং গবর্নর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরীর ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিগণও তাহার কোন কোন অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতেন। সভাস্থলেই হউক, বা বিদ্যালয়েই হউক, ডিরোজিয়োর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এই ছিল যে, তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে

বলিতেন। যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সত্য ও সম্মানার্হ, এবং যাহা নূতন তাহা অসত্য ও অবজ্ঞেয়, এই চির-বদ্ধমূল বিশ্বাস দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। চির প্রচলিত সংস্কারের ও শাস্ত্রানুশাসনের পরিবর্ত্তে, যাহাতে তাঁহার ছাত্রেরা যুক্তি ও বিবেকবলে হিতাহিত নির্ণয় করিতে পারেন, তাহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম ছিল। হিন্দুশাস্ত্র বা খ্রীষ্টীয়-শাস্ত্র, কোন দেশের কোন শাস্ত্রই, তিনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন না। শাস্ত্রানুশাসন যেখানে ব্যক্তিত্বের অথবা স্বাধীনতার ও সহজজ্ঞানের বিরোধী. সেখানে তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার স্বসমাজের ও হিন্দুসমাজের যে সকল আচার, ব্যবহার তাঁহার বিবেচনায় স্বাধীনতার ও সহজ জ্ঞানের বিরোধী ছিল, তিনি তাহা নির্দ্দেশ করিতেন। ডিরোজিয়োর শিক্ষাগুণে নব্য সম্প্রদায় এক অভিনব আলোক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা একাডেমির অধিবেশনে এবং সংবাদপত্রের স্তম্ভে হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ডিরোজিয়োর তত্ত্বাবধানে "পার্থিনন" (Parthenon) নামে ছাত্রদিগের একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত ; তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তিজনক বিষয়সকল লিখিত হইতে লাগিল যে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবশেষে তাহার প্রচার নিবারণের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় যেমন অনেক প্রশংসনীয় গুণ ছিল, তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও ছিল। তিনি ছাত্রদিগের হৃদয়ে যে পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রিয়তার উন্মেষ করিয়াছিলেন, সে

পরিমাণে আত্মসংযমের ও ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। হিন্দুসন্তানগণ পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রশাসন দ্বারা পরিচালিত; সহসা তাঁহাদিগের নিকট যুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করিতে যাইয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীন করিবার পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার ছিল না; সুতরাং শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, তিনি তাঁহাদিগের সকল মতই ভ্রমাত্মক ও হিন্দুজাতির সকল আচারই কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতেন। বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলেও প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্য ও অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। যুবজনোচিত ঔদ্ধত্যের ও চপলতার সহিত তিনি অনেক বিষয়ের মীমাংসা করিতেন। শাস্ত্রকারগণ বহুশত বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, যুক্তির ও সহজ জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি একেবারে তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিতে চাহিতেন।

এরূপ শিক্ষার ফল এই হইয়াছিল যে, ডিরোজিয়োর ছাত্রগণ ভ্রম ও কুসংস্কার-সংশোধনের নামে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণপ্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংস-ভক্ষণ এবং যবনান্ন-গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে

কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীতে যখন "গোখাদক" জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে, তখন বাঙ্গালী হিন্দুরাও "গোখাদক" না হইলে অপর জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগের জয়লাভের আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ক্রটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া গোমাংস-ভক্ষণপূর্ব্বক, কখন কখন প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপ সমাজবিরুদ্ধ, তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার, তাঁহাদিগের মতে নৈতিক বলের, পরিচয় দিতেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্কুল, কলেজেরও ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচারিত হইতে লাগিল। কলিকাতার গৃহে গৃহে হুলস্থূল পড়িয়া গেল এবং অনেক মাতা পিতা সন্তান-দিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।

ডিরোজিয়োর শিক্ষায় কলেজীয় ছাত্রদিগের মধ্যে যে বিপ্লব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, অনুকূল বায়ুবলে তাহা আরও বিশালাকার ধারণ করিল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার সমকালেই বঙ্গদেশে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচারের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। এদেশে কিরূপ শিক্ষা প্রচলন করা কর্ত্তব্য, এই লইয়া সে সময়কার রাজপুরুষদিগের মধ্যে কিছুদিন হইতে আন্দোলন চলিতেছিল। একদল বলিতে-ছিলেন, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের প্রচার করা এদেশে গবর্নমেণ্টের কর্ত্তব্য; অপর দল বলিতেছিলেন, দেশীয় ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ও এদেশীয়দিগকে তাঁহাদিগের জাতীয় সাহিত্যে সুশিক্ষিত করাই গবর্নমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত। উভয় দলেই বহুসংখ্যক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বর্ত্তমান

ছিলেন। খ্যাতনামা আলেকজান্দার ডফ ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন, যথাক্রমে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য ভাষা প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এদেশীয়দিগের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য এবং সুপ্রতিষ্ঠ বাবু রামকমল সেন প্রাচ্যভাষা-প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয় পক্ষই দীর্ঘকাল ধরিয়া তর্ক ও যুক্তির দ্বারা আপন আপন পক্ষ-সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাদের শেষাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে পাশ্চাত্ত্যভাষা-প্রচারার্থীদিগের পক্ষ অবলম্বন করাতে তাঁহারই অবলম্বিত পক্ষ জয়লাভ করিল। মহাত্মা লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ দিবসের প্রসিদ্ধ অবধারণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, ইংরাজী ভাষার সাহায্যে ভারতবাসীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান-প্রচারই গবর্নমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অধিকাংশ অর্থই সেই উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয় করা হইবে।

মহাত্মা বেন্টিঙ্কের এই অবধারণ ভারত সমাজে কি যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। মুসলমান রাজগণ ছয় সাত শত বৎসরের অত্যাচারে ও নির্য্যাতনেও যে পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই, বিন্দুমাত্র বলপ্রকাশ-ব্যতিরেকে এক ইংরাজী ভাষার প্রচার হইতে লোকের মানসিক ভাব ও প্রবণতা সম্বন্ধে তাহার অপেক্ষা শতগুণ অধিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ডিরোজিয়োর শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের সাংসারিক আচার-ব্যবহারে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল; গবর্নমেণ্টের অবধারণ তাঁহাদিগের চিন্তা ও মানসিক ভাব-সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত করিল। একেই ত দেশীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থানুশীলনে নব্য-শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা ছিল, তাহার

উপর গবর্নমেণ্টের এই অবধারণ প্রকাশিত হইবার পর সংস্কৃত গ্রন্থ স্পর্শ করিতেও আর তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। গবর্নমেণ্টের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অবধারণ প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, সতীদাহ-নিবারণ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উঠিয়াছিল। যাঁহারা সতীদাহ-নিবারণের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ আছে, তাহাদিগের উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় পাশ্চাত্ত্যভাষা-প্রচারার্থিগণও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে সকল অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত ও অপদস্থ করিবার জন্য তাহাদিগের কঠোর সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা স্বপক্ষীয়দিগকে বুঝাইলেন যে, যে দেশের কাব্যে হনুমানের লাঙ্গুল এবং দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত সমুদ্রের বর্ণনা স্থান প্রাপ্ত হয়, সে দেশের সাহিত্যের আলোচনা করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। সে সময়কার ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ইংরাজ ; এবং সেই ইংরাজের ইংরাজ মেকলে সাহেব যখন বলিলেন যে, সংস্কৃত সাহিত্য অতি অসার, তখন তাহাতে যে কিছু অনুকরণীয় বা জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে তাহা চিন্তা করিবারও তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি রহিল না। লর্ড মেকলে তাঁহার অভ্যাসানুরূপ অতিরঞ্জন-বহুল ভাষায় বলিলেন : "A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia." অর্থাৎ কোন য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ের একটীমাত্র আলমারিও সমগ্র আরব্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের সমতুল্য। কেবল ইহাই নয় ; তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিলেন :— "অন্য ভাষার কথা দূরে থাকুক, সংস্কৃত সাহিত্য

জর্ম্মান ও স্যাক্সন সাহিত্যেরও সমতুল্য কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors." লর্ড মেকলের এরূপ মন্তব্যের উপর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার বিন্দুমাত্রও অধিকার ছিল না এবং যিনি সংস্কৃত ভাষার আলোচনা পণ্ডশ্রমমাত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহার পক্ষে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যে কতদূর ধৃষ্টতার কার্য্য হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি ফর্দ্দুসী গজ্‌নী রাজসভা-সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"গজ্‌নী রাজসভা মহাসমুদ্রের তুল্য, কিন্তু কেহ কখন তাহা হইতে মুক্তা প্রাপ্ত হয় না।" আলেকজান্দার ডফ ফর্দ্দুসীর সেই কবিতার অনুকরণ করিয়া বলিলেন: "প্রাচ্য-ভাষাসমূহও সমুদ্রের ন্যায় মহান্, অতল এবং অকূল; কিন্তু বহুদিন অন্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।" ডফের ও মেকলের এই সকল কথা নূতন ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট বড়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা সত্য সত্যই মনে করিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই; ইহা কেবলই কুশ-তৃণের গুণাগুণে এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি-সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এই বিশ্বাস অনুসারে তাঁহারা রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্যে এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ন্যায় নাটকে মুক্তা না পাইয়া, ইলিয়াডে, ইনিয়াডে এবং ফিল্ডিংএর উপন্যাসে মুক্তা-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অতি কৃপাপাত্র, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এই তাঁহাদিগের প্রতীতি

জন্মিল। স্বদেশীয় কাব্য, পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা-লাভের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর বোধ হইল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেম্‌ননের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতেন! সেক্সপিয়রের বা মিণ্টনের গ্রন্থের কোন্ স্থলে কি আছে, তাহা তাঁহাদিগের জিহ্বাগ্রে বিরাজ করিত, কিন্তু বনপর্ব্বে রামচন্দ্রের বনবাস কি যুধিষ্ঠিরের নির্ব্বাসন লিখিত আছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ্ বোধ করিতেন। বেদব্যাসের ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দ্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব? হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য রামায়ণ মহাভারত নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন। গুপ্ত কবির "প্রভাকর" তখন বঙ্গসমাজের এক অংশে জ্যোতিঃ দান করিতেছিল বটে, কিন্তু নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট তাহার বড় সমাদর ছিল না। নব্যদিগের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহারাই তাহার সমাদর করিতেন। বাঙ্গালা গ্রন্থসমূহ নব্যদিগের পাঠাগার হইতে নির্ব্বাসিত হইল; বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা এবং বাঙ্গালায় পরস্পরকে পত্রলেখা অগৌরবকর বলিয়া তাঁহাদিগের ধারণা জন্মিল। আমরা যাহাকে বিপ্লবকাল বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছি, তাহা এইরূপে পূর্ণ হইল। ডিরোজিয়োর শিক্ষার ও পাশ্চাত্ত্যসাহিত্যের প্রবেশের সঙ্গে বঙ্গের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বদেশীয় আচার ও স্বদেশীয় সাহিত্য উভয়ই সমভাবে নির্ব্বাসিত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

যোগীন্দ্রনাথ বসু।

বিলাতের স্মৃতি

আবার লণ্ডনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার স্কট্‌ নামে একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাক্স তোরঙ্গ লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পক্ককেশ ডাক্তার, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড় মেয়েটি আছেন। ছোট দুইজন মেয়ে ভারতবর্ষীয় অতিথির আগমন-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আত্মীয়ের বাড়ি পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার দ্বারা কোনো সংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইঁহাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গেলাম। মিসেস্‌ স্কট্‌ আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেয়েরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন, তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও পাওয়া দুর্লভ।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করিয়াছি—মানুষের প্রকৃতি সব জায়গাতেই সমান। আমরা বলিয়া থাকি, এবং আমিও তাহা বিশ্বাস করিতাম, যে আমাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিষ্টতা আছে, য়ুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্‌ স্কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই,

প্রায় সব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এই জন্য স্বামীর প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট্ নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া ঘরে ফিরিবেন, তাহার পূর্ব্বে আগুনের ধারে তিনি স্বামীর আরামকেদারা ও তাঁহার পশমের জুতাজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্কটের কি ভাল লাগে আর না লাগে, কোন্ ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয়, সে কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজনমাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রান্নাঘর, সিঁড়ি এবং দরজার গায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্য্যন্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলৌকিকতার নানা কর্ত্তব্য ত আছেই। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গানবাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদপ্রমোদকে জমাইয়া তোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ।

মেয়েদের লইয়া এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে টেবিলচালা হইত। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর টিপাইটা ঘরময় উন্মত্তের মত দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রমে এমন হইল আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস্ স্কটের এটা যে খুব ভাল লাগিত, তাহা নহে। তিনি মুখ গম্ভীর করিয়া এক একবার মাথা নাড়িয়া বলিতেন, আমার মনে হয় এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না। কিন্তু তবু তিনি আমাদের এই ছেলেমানুষীকাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই অনাচার সহ্য করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্কটের লম্বা টুপি লইয়া সেটার উপর হাত রাখিয়া যখন চালিতে

গেলাম, তিনি ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—না, না, ও টুপি চালাইতে পারিবে না। তাঁহার স্বামীর মাথার টুপিতে মুহূর্ত্তের জন্ত সয়তানের সংস্রব ঘটে, ইহা তিনি সহিতে পারিলেন না।

এই সমস্তের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি। তাহার সেই আত্মবিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি, স্ত্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। যেখানে তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই, সেখানে তাহা আপনিই পূজায় আসিয়া ঠেকে। যেখানে ভোগবিলাসের আয়োজন প্রচুর, যেখানে আমোদ-প্রমোদই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাখে, সেখানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে; সেখানে স্ত্রী-প্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

কয়েক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিতে হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক, দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস্ স্কট্ আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্ত তুমি কেন এখানে আসিলে?—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ডাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে, কেহ বা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সংবাদই জানি না; কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্‌ব্রিজ্‌ ওয়েল্‌স্‌ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম, একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোন কথা বলিল না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম, তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, মহাশয় আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছেন, বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উদ্যত হইল। এই ঘটনাটি হয় ত আমার মনে থাকিত না; কিন্তু ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ষ্টেসনে প্রথম যখন পৌঁছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে তুলিয়া দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনি জাতীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্দ্ধক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্ব্বোধ বিদেশী ঠাহরাইয়া আরো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্দ্ধক্রাউন দিয়াছেন।

যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই, তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাখিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে।

আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে, যাহারা নিজে বিশ্বাস নষ্ট করে না, তাহারাই অন্যকে বিশ্বাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশী অপরিচিত, যখন খুসি ফাঁকি দিয়া দৌড় মারিতে পারি—তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-উপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীয় এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। তাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তিসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিতে ইচ্ছা করি না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই কবিতাটি বেহাগ-রাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে শুনাও। আমি নিতান্ত ভালমানুষী করিয়া তাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অদ্ভুত কবিতার সঙ্গে বেহাগ সুরের সম্মিলনটা যে কিরূপ হাস্যকর হইয়াছিল, তাহা আমিছাড়া বুঝিবার দ্বিতীয় কোনো লোক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় সুরে তাঁহার স্বামীর শোকগাথা শুনিয়া খুব খুসি হইলেন। আমি মনে করিলাম এইখানেই পালা শেষ হইল—কিন্তু হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভায় প্রায়ই আমার দেখা হইত। আহারান্তে বৈঠকখানাঘরে যখন নিমন্ত্রিত স্ত্রীপুরুষ সকলে একত্র

সমবেত হইতেন, তখন তিনি আমাকে সেই বেহাগ গান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন। অন্য সকলে ভাবিতেন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একটা বুঝি আশ্চর্য্য নমুনা শুনিতে পাইবেন—তাঁহারা সকলে মিলিয়া সানুনয় অনুরোধে যোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপান কাগজখানি বাহির হইত—আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতশিরে লজ্জিতকণ্ঠে গান ধরিতাম —স্পষ্টই বুঝিতে পারিতাম এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম, "Thank you very much. How interesting!" তখন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড় একটা দুর্ঘটনা হইয়া উঠিবে, তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত!

তাহার পরে আমি যখন ডাক্তার স্কটের বাড়িতে থাকিয়া লণ্ডন য়ুনিভর্সিটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম, তখন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লণ্ডনের বাহিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যাইবার জন্য, তিনি প্রায় আমাকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন। আমি শোক-গাথার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেষে একদিন তাঁহার সানুনয় একটি টেলিগ্রাফ পাইলাম। টেলিগ্রাফ যখন পাইলাম, তখন কলেজে যাইতেছি। এদিকে তখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসন্ন হইয়াছে। মনে করিলাম এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে বিধবার অনুরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইতে বাড়ি না গিয়া একেবারে ষ্টেসনে গেলাম।

সেদিন বড় দুর্য্যোগ। খুব শীত, বরফ পড়িতেছে, কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যেখানে যাইতে হইবে সেই ষ্টেসনেই এ লাইনের শেষ গম্যস্থান—তাই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলাম। কখন গাড়ি হইতে নামিতে হইবে, তাহা সন্ধান লইবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

দেখিলাম ষ্টেসনগুলি সব ডানদিকে আসিতেছে। তাই ডান-দিকের জানলা ঘেঁসিয়া বসিয়া গাড়ির দীপালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম। সকালসকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—বাহিরে কিছুই দেখা যায় না। লণ্ডন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল, তাহারা নিজ নিজ গম্যস্থানে একেএকে নামিয়া গেল।

গন্তব্য ষ্টেসনের পূর্ব্বষ্টেসন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল। এক জায়-গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম সমস্ত অন্ধকার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্লাটফর্ম্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের তাহা বুঝিবার উপায় নাই, অতএব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল—মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিথ্যা। কিন্তু যখন দেখিলাম, যে ষ্টেসনটি ছাড়িয়া গিয়াছিলাম সেই ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ি থামিল তখন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ষ্টেসনের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক ষ্টেসন কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল, সেইখান হইতেই ত এ গাড়ী এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইতেছে? সে কহিল, লণ্ডনে। বুঝিলাম এ

গাড়ি খেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিব্যস্ত হইয়া হঠাৎ সেইখানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কখন পাওয়া যাইবে? সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোথাও আছে? সে বলিল, পাঁচ মাইলের মধ্যে না।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি, ইতিমধ্যে জলস্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যখন দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে, তখন নিবৃত্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্য্যন্ত আঁটিয়া ষ্টেসনের দীপস্তম্ভের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সেটি তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গত্যন্তর যখন নাই, তখন এই জাতীয় বই মনোযোগ দিয়া পড়িবার এমন পরিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পরে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে—আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইল যে, তাহার পর হইতে Data of Ethics-এ মনোযোগ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাতটার সময় যেখানে পৌঁছিবার কথা, সেখানে পৌঁছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্রী কহিলেন, একি রুবি, ব্যাপারখানা কি? আমি আমার আশ্চর্য্য ভ্রমণবৃত্তান্তটি খুব যে সগর্ব্বে বলিলাম, তাহা নয়।

তখন সেখানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধারণা ছিল যে, আমার অপরাধ যখন স্বেচ্ছাকৃত নহে,

তখন গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে না—বিশেষতঃ রমণী যখন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উচ্চপদস্থ ভারতকর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী আমাকে বলিলেন—এস রুবি, এক পেয়ালা চা খাইবে।

আমি কোনো দিন চা খাই না, কিন্তু জঠরানল নির্ব্বাপণের পক্ষে পেয়ালা যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে মনে করিয়া গোটাদুয়েক চক্রাকার বিস্কুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিয়া ফেলিলাম। বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া দেখিলাম অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন সুন্দরী যুবতী ছিলেন, তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামীর যুবক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের পালা উদ্‌যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, এবার তবে নৃত্য সুরু করা যাক। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, এবং শরীর-মনের অবস্থাও নৃত্যের অনুকূল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালমানুষ যাহারা, জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে যদিচ এই নৃত্যসভাটি সেই যুবকযুবতীর জন্যই আহূত, তথাপি দশঘণ্টা উপবাসের পর দুইখণ্ড বিস্কুট খাইয়া তিনকালউত্তীর্ণ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইখানেই দুঃখের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রুবি আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায়? এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যখন তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি কহিলেন রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায়, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনি তোমার সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য। সৌজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে

খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লণ্ঠন ধরিয়া একজন ভৃত্য আমাকে সরাইয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়ত শাপে বর হইল—হয়ত এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক কিছু খাইতে পাইব কি? তাহারা কহিল, মদ্য যত চাও পাইবে, খাদ্য নয়। তখন ভাবিলাম নিদ্রা-দেবীর হৃদয় কোমল, তিনি আহার না দিন বিস্মৃতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অঙ্কেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাণ্ডা কন্‌কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন খাট ও একটি জীর্ণ মুখ ধুইবার টেবিল ঘরের আস্‌বাব।

সকাল বেলায় ইঙ্গভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ খাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজি দস্তুরে যাহাকে ঠাণ্ডা খাবার বলে, তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ গতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় খাওয়া গেল। ইহারই অতি যৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাওয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃত্যটা ডাঙায়তোলা কইমাছের নৃত্যের মত এমন শোকাবহ হইতে পারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, যাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি তিনি অসুস্থ, শয্যাগত; তাঁহার শয়নগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া তোমাকে গাহিতে হইবে। সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল। রুদ্ধদ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গৃহিণী কহিলেন, ঐ ঘরে তিনি আছেন। আমি

সেই অদৃশ্য রহস্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগ-রাগিণীতে গাহিলাম, তাহার পর রোগিণীর অবস্থা কি হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া দুই তিন দিন বিছানায় পড়িয়া নিরঙ্কুশ ভালমানুষীর প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, দোহাই তোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের আতিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিও না। এ তোমাদের ভারত-বর্ষের নিমকের গুণ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশী সমাজ

"সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতকপক্ষীর মত ঊর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে—কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জ্জন সুরু হইয়াছে—গবর্মেণ্ট সাড়া দিয়াছেন—তৃষ্ণানিবারণের যা-হয়-একটা উপায় হয় ত হইবে—অতএব আপাতত আমরা সেজন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই যে, পূর্ব্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল,—যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত—দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না?

আমাদের যে সকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, সেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্নক্লিষ্ট ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্য কর্জ্জন্‌সাহেব উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন; আচ্ছা, না হয় আণ্ড্রুল্‌-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্ত্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্বালাময় তরলরসের তৃষ্ণা—যাহা প্রলয়কালের সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় বিচিত্র উজ্জ্বল দীপ্তিতে উত্তরোত্তর আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিতেছে—তাহা পশ্চিমের সামগ্রী এবং পশ্চিম-দিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসঙ্গত হয় না—কিন্তু জলের তৃষ্ণা ত স্বদেশের খাঁটি সনাতন জিনিষ!—ব্রিটিশ

গবর্মেণ্ট আসিবার পূর্ব্বে আমাদের জলপিপাসা ছিল এবং এতকাল তাহার নিবৃত্তির উপায় বেশ ভালরূপেই হইয়া আসিয়াছে—এজন্য শাসনকর্ত্তাদের রাজদণ্ডকে কোনো দিন ত চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্য্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মত বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মত করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্ম্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্ত্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।

দেশে এই যে সমস্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহতভাবে সমস্ত ধনিদরিদ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইতেছে, না, রাজ-পুরুষদিগকে সুদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে। নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে

হয় না, রক্ত চলাচলের জন্য যেমন টৌন্‌হল্‌-মীটিং অনাবশ্যক—সমাজের সমস্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেম্‌নি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে—তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে, সে যদি একদিন সে গ্রামকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বত্থকে প্রশ্রয় দিয়া পেচকবাদুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিষ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল—এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙ্গালীর চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়—সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দূষিত—পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত—সেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্ত্তা সরকারবাহাদুর, বিদ্যাদানের ব্যবস্থার জন্যও সরকার-

বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ-কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?

ইংরাজিতে যাহাকে ষ্টেট্ বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজশক্তি-আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের ষ্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্ম্মের ভার ষ্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিক-ভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা, পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্ত্তব্য ছিল না, তাহা নহে—কিন্তু কেবল আংশিকভাবে বস্তুত সাধারণত সে কর্ত্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আসে, তথাপি সমাজের বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্য দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে—কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন—তাহারা কর্ত্তব্যভারে আক্রান্ত নহে—তাহাদের সমস্ত

বড় বড় কর্ত্তব্যতার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজন্য ধর্ম্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন,—কিন্তু জনসাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্য্যরূপে, বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থ-সংযম ও আত্ম-ত্যাগ চর্চ্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্ম্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্য্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়—এইজন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স্ এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্য আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে বাঁচাইয়া আসিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্ম্মশিক্ষাদান, এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে ষ্টেটের উপর নির্ভর—আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্ম্মব্যবস্থার

উপরে প্রতিষ্ঠিত—এইজন্য ইংরাজ ষ্টেট্‌কে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্ম্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই ষ্টেট্‌কে জাগ্রত রাখিতে, সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্ব্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানির্ব্বিচারে গবর্মেণ্টকে খোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেস্ত্রা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে যে, সাধারণের কর্ম্মভার সাধারণের সর্ব্বাঙ্গেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভাল, না তাহা বিশেষভাবে সরকার নামক একটা জায়গায় নির্দ্দিষ্ট হওয়া ভাল। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিদ্যালয়ের ডিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ কথা আমাদিগকে বুঝিতেই হইবে—বিলাতরাজ্যের ষ্টেট্ সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত—তাহা সেখানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দ্বারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না—অত্যন্ত ভাল হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য!

আমাদের দেশে সরকারবাহাদুর সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্ম্মণ্যতা

আমাদের দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায়গ্রহণ করেন নাই, সেইজন্যই আজও আমাদের মাথা একেবারে মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পায় নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহির্ভূত ষ্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরাজের আইনের দ্বারাই আমরা অপরিবর্ত্তনীয়রূপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি—কোনো আপত্তি করি নাই। এ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমস্তই ইংরাজের আইনে বাঁধিয়া গেছে,—পরিবর্ত্তনমাত্রই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্ম্মস্থান—যে মর্ম্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আসিয়াছি, সেই আমাদের অন্তরতম মর্ম্মস্থান আজ অনাবৃত-অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ্, জলকষ্ট বিপদ্ নহে।

পূর্ব্বে যাঁহারা বাদ্শাহের দরবারে রায়রায়াঁ হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন,

তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চে ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তি-লাভের জন্য নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশ্বরের রাজধানী দিল্লী তাঁহাদিগকে যে সম্মান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্ম-পল্লীর কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইঁহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন—রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইঁহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্য দেশের গণ্ডগ্রামেও কোনো দিন জলের কষ্ট হয় নাই, এবং মনুষ্যত্বচর্চ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্য বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই, কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে। সুস্থ অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক অব্যবহিত উত্তেজনা শরীরের মধ্যেই থাকে—যখন মৃগনাভি, অ্যামোনিয়া, সাপের বিষ দিয়া শরীরকে সক্রিয় করিতে হয়, তখন অবস্থাটা নিতান্ত সংশয়াপন্ন। আজকাল আমাদের সমাজ-শরীরের আভ্যন্তরিক উত্তেজনা ইহাকে কোনো কাজেই প্রবৃত্ত করিতে পারিতেছে না—বৈদ্যমহাশয়ের বড়ি না হইলে একেবারে অচল। এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন দেশের জলকষ্টনিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব

বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের রুচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল!

কে বলে, জলকষ্টনিবারণের সামর্থ্য আমাদের নাই? একদা দেশের যে অর্থ দেশের কল্যাণকর্ম্ম সাধন করিয়া চরম সার্থকতা লাভ করিত, আজ সেই অর্থ অজস্রধারায় মিল্‌টনের আড়্‌গড়া, ডাইকের গাড়িখানা, ল্যাজারসের আস্‌বাব্‌শালা, হার্ম্মান্‌কোম্পানির দর্জ্জির দোকানকে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। স্বদেশের শুষ্ক তালুতে জলবিন্দু দিবার বেলায় টানাটানি না পড়িবে কেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেচেন তাঁরা দেখেচেন সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এককালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুল সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে-দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে-রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়চে না, কেননা বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি, গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলা দেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েচে নেমে, তীরের মাটি গিয়েচে ফেটে, বেরিয়ে পড়েচে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধূ ধূ করচে তপ্ত বালু। মেয়েরা

বহু দূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনচে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্ত্তনের কোনো একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হোত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে; তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জানত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে

একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে সহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

একদিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল, অন্যদিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হোলো তারো প্রবাহ বইল না সর্ব্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্ত্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজূটের মধ্যে বিশেষ ভাবে, তবুও দেব-ললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েচেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারদিকের

আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়; সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচার বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্য্যন্ত হোলো না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ীর অন্তঃপুরে, শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয় তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েচে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনচে না। যে-বিদ্যা বর্ত্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করচে, উদ্‌ঘাটন করচে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে-মন, যে-মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব্ব-যুগান্তরে, আর যে-মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেচে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিকটাতে যে-দিকে চলেচে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েচে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্ত্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল-বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে-বা পোকায় ছিদ্র করেচে, কোনো বৎসর-বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেচে আপন স্বাস্থ্য আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেচে তার বিদ্যা তার শিক্ষা তার সাহিত্য সমস্ত মিলে, তার কর্ম্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েচে এই সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার, অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের, বলি এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে, সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চ্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েচে। তাতে ধর্ম্মের

প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেচি এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে সহর পর্য্যন্ত গোপনে শিয়ে প্রশিয়ে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্ম্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এ জন্যে অন্তত বাঙালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে এ'কে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে এ'কে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ওদিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা হোক কোনো একটা আস্বাদন পায়। আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ, তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারী পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায়নি, অন্তত তারা আনাড়ি-পাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে-বিদ্যা মননের, সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করচে প্রত্যহ, পণ্যের আদানপ্রদান চলচে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দ্দিন এসেচে চারদিক্ থেকে ঘন ঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্ম্মে পেয়েচে খ্যাতি, শিক্ষা-প্রসারণে হয়েচে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েচে, পেয়েচে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সঙ্কুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এলো।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্দ্ধে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য সকলকে খর্ব্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দুমুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করচে তার মূলেও আছে সর্ব্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েচে, আত্মীয়কে তুলচে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করচে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্ব্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্য্যন্ত আজ এগোলো যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও এক-রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে

ধিকার নেই কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর ক'রে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না, তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্ব্বত্র সুগম হয়েচে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব, বন্ধু যে আজ দুর্লভ হোলো। তাই বাংলা দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করচি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্ব্বদেহে। প্রশ্ন এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করচে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়,

এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখিনে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে, তবেই বাংলা ভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয়, তবে সেই অকিঞ্চ-নতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালী যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিত সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে। এমনো এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা বাংলা জানিনে বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েচে। সেদিন আজ আর নেই বটে কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলাতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল

তখন সেই মহলে স্ত্রীকে সাড়ি পরালে প্রেষ্টিজ হানি হোত। শিক্ষাসরস্বতীকে সাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, সাড়িপরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেচেন ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েচে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপূর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলচি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী!

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্চি—তোমার অভ্রভেদী শিখর চূড়া বেষ্টন ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মণ

বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের "প্রাণ ইবাপরঃ"—অপর প্রাণের ন্যায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি সীতা ছাড়া রামচরিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি কতকটা মৌন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী! লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়া দুই এক স্থলে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভরত, সীতা এবং রামচন্দ্রও মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহসম্বন্ধে সংযমী—যে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ যাহা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই; এই মৌন স্নেহ-চিত্র আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথা জানাইতেছে।

লক্ষ্মণ আজন্ম ছায়ার ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগামী।

> "ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।
> মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা॥"

—রামের কাছে না শুইলে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

"যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ।
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্॥"

—রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুর্হস্তে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার অনুগমন করেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছিলেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামের অভিষেক-সংবাদে সকলেই কত সন্তোষ প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক-সংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন,—

"জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে।"

—আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি। ভ্রাতার এইরূপ দুই একটী কথাই লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের এই স্নিগ্ধ আদরে "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই মৌন স্বল্পভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেক-ব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, ইনি ঋষিবৎ নির্লিপ্তভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল; সেই দিন সেই সংকট মুহূর্ত্তেও তাঁহার আর কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরসুহৃৎ ভক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বাল্মীকি দুইটী ছত্রে সেই মৌন চিত্রটী আঁকিয়াছেন—

> "তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
> লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥"

—লক্ষ্মণ অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গর্হিত আদেশপালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই তেজস্বী যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব কোমলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া

বসিল, তিনি বালকের ন্যায় রামের পদযুগ্মে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।"

—অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি তোমাভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না। রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক—উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধূটীর ন্যায় সেই ক্ষাত্রতেজোদীপিত মূর্ত্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহ-গভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, "প্রাণসম প্রিয়," "বৎস," "সখা" প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ দুই একটী দৃঢ় কথায় তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, "আপনি শৈশব হইতে আমার নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন?"

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। যে দিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে দিন—

"ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।"

বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটী রাজীবলোচন যে দুরন্তরাক্ষসবধকল্পে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইয়া

চলিলেন, তজ্জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম, লক্ষ্মণ, সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নয়নাশ্রু রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণের জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই; এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"রামং দশরথং বিদ্ধি, মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি, গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

—যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও। মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন—

"সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্।"

—সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "যাও যাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদ্‌বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আরণ্য জীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ

লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ-সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরি-সানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজী হইতে কুসুমচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইয়া দিতেন; গৈরিকরেণু-দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনী-তীরে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এ দিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র-দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেন।

একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নালশেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্য একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটী চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। কখনও বা তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ-দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্ত বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক ও বন্য বেতসলতা-দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জম্বুশাখা-দ্বারা সীতার উপবেশন-জন্ত সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজ

সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এই সুন্দর তরুরাজীপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্য একটী স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটী ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য,—এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন? রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিম্নে শুইয়া আছেন, সীতার সুন্দর মুখখানি অনশন ও পর্য্যটনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইল,—তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও; শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" লক্ষ্মণ স্বীয় স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা কহিতে জানিতেন না, রামের এবংবিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
দ্রষ্টুমিচ্ছয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা॥"

—আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ

নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সংকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ভ্রাতৃসেবাই তাঁহার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—

"ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ॥"

—দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরি-সানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বার বার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

"শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা॥"

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন—

"কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।"

—কোন্ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।—

"নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু, ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।"

—গোদাবরীর অবতরণ-স্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।

"লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্॥"

—লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা অননুভবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না; লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বার বার বলিতেছেন—

"হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসি ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ।"

—লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ? এই শোকাকুল কণ্ঠের আর্ত্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত।

দনু নামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথ পর্য্যটন করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন, কখনও "সীতা সীতা" বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও "হা দেবি, একবার এস, তোমার শূন্য পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাও" - এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্ত্তি-পদ্মকোষ-নিষ্ক্রান্ত পবনস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন,—

"নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।"

সজলনেত্রে চিরসুহৃৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহার্দ্র হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দনুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত।

ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রামচন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।”—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য-দুঃখসহায় ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, “ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে দিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপ রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজল চক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমল-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—“তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী খুঁজিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার

মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এরূপ নীরব হইয়া আছ ?”

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোন কালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসঙ্ঘের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখনও লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি স্বীয় অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ভরতের, এমন কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়—তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় ; ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে,

উহা সর্ব্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময়ে ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিত্র-দ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ধরাবাসিগণ সেই স্বর্গভ্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ,—কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রেম আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ,—এই বিশাল অপরিসীম স্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ প্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন—"জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আমি আপনাকে ছাড়িয়া এক মূহুর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ,—ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুকৃচ্ছ্র সাধনে অবসন্ন লক্ষ্মণকে রাম একটী স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের নেত্রপ্রান্তে

একটী পুলকাশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

লক্ষ্মণের চরিত্রের এক দিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হয়ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্য্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইত, এই জন্যই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। এ কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্ব্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসাজ্ঞা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসঙ্কল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভালবাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার

জন্ত ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার-দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্য্যাতন প্রাপ্ত হন— 'মৃদুর্হি পরিভূয়তে।' ধর্ম্ম ও সত্যের ভান করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?" সাশ্রুনেত্র লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর—

"হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্।"

বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গর্হিত আদেশ-পালন যে

ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোন ক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতার মস্তক-দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—"হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ,—এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।" এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু স্নেহগুণেই একান্ত রূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন!

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্ত্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই, কিন্তু সময়-বিশেষে রাম দুর্ব্বল ও মৃদুভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আত্যন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণ রসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্য্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাট্ রাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ

করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এইরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসা-ব্যঞ্জক,—অপরদিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না," "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্য-প্রদর্শন উচিত নহে," "পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা বিপদে পড়িয়া সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে করিবে?"

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে

পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা সকলই রামচন্দ্র।”—

“অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে।
ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ॥”

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল,—কেবল রামের ভৎর্সনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য-প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশ-কলাপ অনশনক্লশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ স্নেহ-পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি রামকে বলিলেন—“এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন!” এই লক্ষ্মণই পূর্ব্বে—

“ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন”

বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে দিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার

মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ সাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই; রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন—"দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্ত্বেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন, আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকে বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।" এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎসর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

ক্ষাত্রতেজের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ ভারতে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। "রাম-সীতা" এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় "রাম-লক্ষ্মণ" এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে "লক্ষ্মণ" অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত

ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন,—জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে; যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না! হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পাঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণ-থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,—লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্র হিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্বরূপ তুমি এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস,—সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ-মুখরিত একগৃহে একত্র বসিয়া আহার করি, স্বর্গ হইতে আমাদের মাতারা সেই দৃশ্য দেখিয়া আশিস্ বর্ষণ করিবেন। আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনব-বলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব!

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

লাঠিয়াল আকবর

বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপা-গলায় আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ কতকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া একজন ভীষণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরনের বস্ত্র রক্তে রাঙা; কিন্তু সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলায় অনুনয় করিতেছে,—"কথা শোন্ আক্‌বর, থানায় চল্। সাত বচ্ছর যদি না তাকে দিতে পারি, ত ঘোষালবংশের ছেলে নই আমি।" পিছনে চাহিয়া কহিল,—"রমা, তুমি একবার বল না, চুপ ক'রে রইলে কেন?" কিন্তু রমা তেমনি কাঠের মত বসিয়া রহিল। আক্‌বর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—"সাবাস্! হাঁ, —মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে ছোটবাবু! লাঠি ধর্‌লে বটে!" বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—"সেই কথা বল্‌তেই ত বল্‌চি আক্‌বর কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?" আক্‌বরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল; কহিল,—"সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?" আক্‌বরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর

মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আক্‌বর কহিতে লাগিল, "আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচ্‌ত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ' ক'রে ব'সে পড়্‌ল বড়বাবু!" রমা উঠিয়া আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইল। আক্‌বর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পরে ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বাঁধ পাহারা দিবার জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে! সে নিজেই যে কত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আক্‌বর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"তখন ছোটবাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক ক'রে দাঁড়াল দিদি-ঠাক্‌রাণ, তিন বাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নার্‌লাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বল্‌তি লাগ্‌ল। কইলেন, 'আক্‌বর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারাগাঁয়ের লোক মারা পড়্‌বে, তাই কাট্‌তেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সম্‌ঝে দেখ্‌ রে, সব বরবাদ হ'য়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে?' মুই সেলাম ক'রে কইলাম, 'আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দেঁড়িয়ে ঐ যে ক' সমুন্দি মুয়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্‌ কোদাল মার্‌চে, ওদের মুণ্ডু ক'টা ফাঁক ক'রে দিয়ে যাই!'" বেণী রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল,—"বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্চে—"

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আক্‌বর কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"খবরদার বড়বাবু, বেইমান কোয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি,—ও পারি না।" কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"কারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি ব'সে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখলি জান্‌তি পার্‌তে ছোটবাবু কি!" বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ছোট-বাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হ'য়ে তোরে মেরেচে!" আক্‌বর জিভ কাটিয়া বলিল,—"তোবা তোবা, দিনকে রাত কর্‌তি বল, বড়বাবু?" বেণী কহিল, "না হয় আর কিছু বল্‌বি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেণ্ট বার ক'রে একেবারে হাজতে পূর্‌ব। রমা, তুমি ভাল ক'রে আর একবার বুঝিয়ে বল না।—এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।" রমা কথা কহিল না, শুধু আক্‌বরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আক্‌বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না দিদিঠাক্‌রাণ, ও পার্‌ব না।" বেণী ধমক্‌ দিয়া কহিল,—"পার্‌বিনে কেন?" এবার আক্‌বরও চেঁচাইয়া কহিল,—"কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দ্দার কয় না? দিদিঠাক্‌রাণ, তুমি হুকুম কর্‌লে আসামী হ'য়ে জ্যাল খাট্‌তি পারি, ফৈরিদি হব কোন্‌ কালামুয়ে?" রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল,— "পার্‌বে না আক্‌বর?" আক্‌বর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,— "না দিদিঠাক্‌রাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি।—ওঠ্‌রে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা

নালিশ কর্‌তি পার্‌ব না;” বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তুঁষের আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার অনুনয় বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, তখন রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া, অকারণে তাহার দুই চক্ষু অশ্রু-প্লাবিত হইয়া উঠিল, এবং আজিকার এত বড় অপমান তাহার সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিষ্ফল হওয়া সত্ত্বেও কেন যে, কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল, তাহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। সারা-রাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তারকেশ্বরে সুমুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল, নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বৃন্দাবনের পাঠশালা

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ, যাহারা কোনো অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি, সে দিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলা নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই, পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে, এবং হয় ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্য্য-কুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসঙ্কটই হোক, কোন-না-কোনো উপায়ে তিনি সব দিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়াছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুর বেলা গাড়ী একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিত মশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে সুরু করিয়াছিল, এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল—শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ-ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তি-বশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্য্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ এক দিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয় দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পোনের মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুরদালান ছাইয়া না ফেলে, সে দিকেও খর দৃষ্টি রাখিল।

দিন দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া, তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তাহারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া চিন্‌তে পার্‌লে না?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাষ আছে তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখ্‌তে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব্ব ইংরাজীশিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্য বন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব ৫।৬ বৎসর হইল, এম. এ. পাস করিয়া কলেজে শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশে যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু, তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কি না তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছি।

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ, এই স্তুতি, তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া

প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, যাক্, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বল্‌ব না, শুধু আমার মতটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাযের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বইটই কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে জোগাড় করলে কি করে বলত ভায়া ?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত মুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বল্‌চি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কায থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ, আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাব্‌বে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হলে তবে গাড়ী চলে, নইলে, এত বড় জড় পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোক মিলে গায়ের জোরে ঠেলা-ঠেলি করে একচুলও নাড়তে পারবে না। যাক্, তুমি এ সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুল্‌তে না। আমি এই জন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই, তাই, প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চল্‌ল না—ছেলে জুট্‌ল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এম্‌নি সয়তান যে, কোনো মতেই ছেলেদের

পড়্‌তে দিতে চায় না! নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিনকতক ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত ঘুরেছিলাম,—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু, তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—না হে, না,—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোর-গোড়ায় যেতে পারিনে, কাযেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাযেও আমাদের বাড়ীতে ঢুক্‌লে তোমার মত উচ্চ-শিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেচি। যদি জান্‌তাম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কক্ষণো এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ

এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে রয়েচে! আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এই জন্যেই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেচে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করতে পারিনে, তোমরা ছোট লোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না,—তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান্ না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি হাতুড়ে পণ্ডিতই পসার-প্রতিপত্তি লাভ করে,—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় বড় ডাক্তার প্রোফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান্।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল-কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভালো হয় না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশী বুঝি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্চ আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল—দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান্, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু, তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই, তোমাদের পোনের আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, যাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংশ্রবে লেখাপড়া শিখ্‌লে চাষার ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না,—বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ দেশের এই ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা কোরো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙ্‌বে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাযকর্ম্ম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, পৃথক্ হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠ্‌বে না। এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ, জন্মজন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুন্‌বে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি, তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তাহলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাযে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বল্লুম আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোলো আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জ্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তাহলে কোন দিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থ ই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না?

প্রেজুডিস নেই। খেতে পারি।

তাহলে আমিও বল্‌তে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা,—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বল্‌লে তুমি রাগ করবে।

ধৃষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাক্‌লেই পরের ভালো এবং দেশের কায করা যায় না। যাদের ভালো করবে

তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধিবিবেচনায় ধর্ম্মেকর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু, আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হইলেও কেশব সহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই, পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্য বন্ধুকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি, বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থ ই একটা মানুষ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেচে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চি,—এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে, যেখানে 'ক' 'খ' শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কায কি গভর্মেণ্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল; বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বল্‌বে—পণ্ডিত মশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশ-জোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে, দেখা যাবে গভর্‌মেণ্ট তাঁর কর্ত্তব্য করেন কি না। নিজের কর্ত্তব্য করার আগে, পরের কর্ত্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু, তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হ'ল না ভাই; আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয় ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব, বরং আশীর্ব্বাদ করো, যেন এই অতি ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্ব্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালার একটি সর্ত্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখ্‌তে পেতে, প্রত্যহ বাড়ী যাবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা ক[illegible] বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি একটি ছেলেকেও লেখা-পড়া শে[illegible]। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে [illegible]র ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব[illegible]রে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙলা দেশে [illegible]কটি [illegible]লাকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বল্‌তে পার বটে। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু, সবল মুহূর্ত্তে মনে হয়, ভগবান্ মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ?

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান্ জানেন। চিঠি লিখ্‌লে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশী কথা কি, কেশব?

বেশী কথাও আছে, বল্‌চি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও কোরব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

———

ক্ষমার আদর্শ

চন্দ্র ধীর গতিতে মেঘের কোলের ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নীচে নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর মিশাইয়া নাচিতে নাচিতে বহিয়া যাইতেছিল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। চারিদিকে ঋষির আশ্রম। এক একটী আশ্রম নন্দনবনকে ধিক্কার প্রদান করিতেছিল। এক একখানি ঋষির কুটির তরু, পুষ্প ও বৃক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। একদিন এইরূপ জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব সহধর্ম্মিণী অরুন্ধতী দেবীকে বলিতেছিলেন, "দেবি, ঋষি বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা করিয়া আন।" এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যে আমায় শত পুত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে—" এই কথা বলিতে বলিতে দেবীর সুর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, সে অপূর্ব্ব শান্তির আলয় গভীর হৃদয় ব্যথিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন— "আমার শত পুত্র এই জোছনা-শোভিত রাত্রে বেদ গান করিয়া বেড়াইত, শত পুত্রই আমার বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, আমার এইরূপ শত পুত্রই সে বিনষ্ট করিয়াছে; তাহার আশ্রম হইতে লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিতেছেন? আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি।"

ধীরে ধীরে ঋষির মুখ জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সাগরোপম হৃদয় হইতে এই কয়টী বাক্য নিঃসৃত হইল,—"দেবি, আমি তাহাকে যে ভালবাসি।" অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল; তিনি বলিলেন, "আপনি যদি তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 'ব্রহ্মর্ষি' বলিয়া সম্বোধন করিলেই ত জঞ্জাল মিটিয়া যাইত, আমাকেও শত পুত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত না।" ঋষির মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; তিনি বলিলেন, "তাহাকে ভালবাসি বলিয়াই ত তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই; আমি তাহাকে ব্রহ্মর্ষি বলি নাই বলিয়াই তাহার ব্রহ্মর্ষি হইবার আশা আছে।"

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনোনিবেশ হইতেছে না। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, আজ যদি বশিষ্ঠ তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণসংহার করিবেন। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি তরবারি-হস্তে কুটির হইতে বহির্গত হইলেন। ধীরে ধীরে বশিষ্ঠদেবের কুটির-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বশিষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মুষ্টিবদ্ধ তরবারি হস্তে শিথিল হইয়া পড়িল; ভাবিলেন, "কি করিয়াছি, না জানিয়া কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, না জানিয়া কাহার নির্ব্বিকার চিত্তে ব্যথা দিতে চেষ্টা করিয়াছি!" হৃদয়ে শত-বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দৌড়িয়া গিয়া বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ক্ষণপরে বলিলেন,—"ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য।" গর্ব্বিত হৃদয় অন্য কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বশিষ্ঠ কি করিলেন? বশিষ্ঠ দুই হাত দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বলিলেন, "উঠ,

ব্রহ্মর্ষি, উঠ।” দ্বিগুণ লজ্জায় বিশ্বামিত্র বলিলেন, “প্রভু, কেন লজ্জা দেন।” বশিষ্ঠদেব উত্তর করিলেন, “আমি কখনও মিথ্যা বলি না—আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্মর্ষি-পদ লাভ করিয়াছ।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আমাকে আপনি ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন।” বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, “অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।”

অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধরিয়া আছেন, বিশ্বামিত্র সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তদেব বলিলেন, “আমি তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি, যদি তুমি এই পৃথিবী মস্তকে ধারণ করিতে পার।” তপোবলে গর্ব্বিত বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আপনি পৃথিবী ত্যাগ করুন, আমি মস্তকে ধারণ করিতেছি।” অনন্তদেব বলিলেন, “ধারণ কর, আমি ত্যাগ করিলাম।” শূন্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িতে লাগিল।

বিশ্বামিত্র ডাকিয়া বলিতেছেন, “আমি সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ করিতেছি, পৃথিবী ধৃত হউক—।” তথাপি পৃথিবী স্থির হইল না। উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বলিলেন, “বিশ্বামিত্র, এত তপস্যা কর নাই যে পৃথিবী ধারণ করিবে, কখনও কি সাধুসঙ্গ করিয়াছ? তাহার ফল অর্পণ কর।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “এক মুহূর্ত্ত বশিষ্ঠের সঙ্গ করিয়াছি।” অনন্তদেব বলিলেন, “তবে সেই ফল অর্পণ কর।” বিশ্বামিত্র বলিলেন, “আমি সেই ফল অর্পণ করিতেছি।” ধীরে ধীরে পৃথিবী স্থির হইল। তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন, “এখন আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিন।” অনন্তদেব বলিলেন, “মূর্খ বিশ্বামিত্র, যাঁর এক মুহূর্ত্ত সঙ্গফলে পৃথিবী ধৃত হইল, তাঁহাকে

ছাড়িয়া আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান চাহিতেছ?" বিশ্বামিত্রের ক্রোধ হইল; ভাবিলেন, বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে তবে প্রতারণা করিয়াছেন। দ্রুত তাঁহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "আপনি আমায় কেন প্রতারণা করিলেন?" বশিষ্ঠদেব অতি ধীর-গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি যদি তখন তোমায় ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার বিশ্বাস হইবে।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করিলেন।

ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছিল, যাহার দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাঁহাদের প্রভায় পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাঁহারা আবার ভারতকে পূর্ব্বগৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণিভুক্ত। দুই একখানি মাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পদার্থবিদ্যা-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় লর্ড হার্ডিঞ্জের আনুকূল্যে Encyclopædia Bengalensis অথবা 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানাভাষাভিজ্ঞ ছিলেন।

যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায়-বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না; ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিতে হইবে।

১৮২৫ খৃঃ অব্দে উইলিয়ম ইয়েট্স্ প্রথমে 'সার পদার্থ-বিদ্যা' বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্‌ভিন্ন 'কিমিয়া বিদ্যাসার' নামক রসায়নবিদ্যা-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার-দর্পণ' নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার 'দিগ্‌দর্শন' নামক নানাতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞান-চর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে 'বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি' * নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রোফেসার উইল্‌সন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সমিতির চেষ্টায় 'বিজ্ঞান-সেবধি' নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে 'বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতি' † নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন্ প্র্যাট্ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠ-লিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্প মূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে।

* Society for translating European Sciences.

† Vernacular Literary Society.

সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। * * * * এই সকল প্রয়োজন-সাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য-প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"*

বিজ্ঞান প্রচার-সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। সতেরখানি পুস্তক প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক-সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা—এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্যাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ও রসায়নবিদ্যা-বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা-ঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল প্রচারিত হইতেছে,

* বিশ্বকোষ।

কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান-বিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা 'পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন কমিটি'র * নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপান-স্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক-দিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই, বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে?—উহার যে তৃষ্ণা নাই। পরীক্ষাপাসই যেখানকার ছাত্রজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়-মূলক কার্য্যের সাফল্য-সম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুতঃ পরীক্ষা পাস করিবার নিমিত্ত এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাস করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি

* Text-Book Committee.

আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞানমন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় দশজন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাস হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবকগণকে দুইএক বৎসর পর আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এইত পরিণাম! জাপানের জ্ঞানতৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি সঞ্জীবনীতে কোন বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোন জাতির সেরূপ আছে কিনা সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান্, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী-বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা বাক্‌ল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জ[illegible] দুই চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেক্‌চার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক [illegible] উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞানপিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাংলার দয়েল বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাংলার মশা, বাংলার সাপ, বাংলার মাছ, বাংলার

কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোঁদাল, বেল, বাবূলা ও শ্যেওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট্ যন্ত্রাগারের অভাবে কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়? এদেশের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতি-বিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার-নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। ভোগলালসা কখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্‌নিচয়-আহরণের জন্য সার জোসেফ্ হুকার ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ্ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলারোহণ এখনকার

মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যান্‌সেন (Nansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয়-বিভব হারাইয়া নিঃস্ব ভাবে কালাতিপাত করেন অথচ পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইউরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়; প্রায় সেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থ ই বলিয়াছেন ভাস্করাচার্য্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা নব্য-স্মৃতি ও নব্য-ন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালী-মস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা-টিপ্পনি রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে

নৈর্ঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সে দিন কি প্রকার যাইবে ইত্যাদি বিষয় নির্ণয়-পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময় এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ "তাল, পড়িয়া টিপ করে, কি টিপ করিয়া পড়ে" ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তি-ভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইউরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদীয়মান হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন ও মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিলেন।

তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙে সত্য সত্যই বান ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে

কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইউরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইউরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয় আমাদের এই অধোগতির কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহৈতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্যজাতিগণের আচার-পদ্ধতি হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সে সমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্য জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে, অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।

এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি শঙ্কিত হইতেছি পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি-সঞ্চার করিয়া ফেলি, কিন্তু যদি স্বাধীন চিন্তা মানব মাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান-বিষয়ে বর্ত্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া আজ

কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে; নচেৎ ভয় হয় ভারতভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দুঃখ

দুঃখের কাহিনী লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি, আপনারা ভিখারী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন না ত? দুঃখের প্রকৃতি এই যে, সে হৃদয়ের অতি নিভৃততম প্রদেশকে স্পন্দিত করিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে নয়নোপান্তে সমবেদনার অশ্রুবিন্দু বহিয়া আনে। দুঃখকে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা দূরে রাখিতে পারি না। সৃষ্টির আদি হইতে যে দুঃখের করুণ গীতি ধ্বনিত হইতেছে, তাহারই বিচিত্র তান-মূর্চ্ছনা মানবের কাব্য-দর্শন-ইতিহাসকে আচ্ছন্ন, বিপ্লুত ও মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

সূর্য্যাস্তের স্নিগ্ধ করজাল যেমন সান্ধ্য মেঘমালাকে বিদ্ধ, বিদীর্ণ ও পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহাকে নানাবর্ণ-সমাবেশে বিচিত্র করিয়া তুলে, দুঃখ তেমনি মানবজীবনকে অসংখ্যভাবে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও করুণ করিয়া দেয়। তাহার চেতনা, তাহার কর্ম্ম-প্রবণতা, তাহার বেদনা, তাহার প্রযত্ন, তাহার মহিমা, তাহার উদারতা, তাহার আশাভরসা, তাহার হাহাকার—শতদিকে শতভাবে এই দুঃখের চিরপুরাতন অথচ চিরনূতন কাহিনী বহন করিতেছে।

তাই মানবের ভাষা এই এক দুঃখেরই অনন্ত অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। না হইবে কেন? দুঃখ হইতেই যে ভাষার জন্ম। শিশুর ক্রন্দন যে তাহার পরিস্ফুট ভাষার অগ্রদূত। ক্রৌঞ্চ-মিথুনের দুঃখে মুহ্যমান হৃদয় হইতে যে শোক বা শ্লোকের জন্ম

হইয়াছিল, সেই বিশ্বব্যাপিনী সমবেদনাই কবিতার আদি জননী। সেই জন্যই বোধ হয় ভাষা তাহার জননীকে প্রায় ভুলিয়া থাকে না। সহস্র কণ্ঠে সহস্র রাগিণীতে ভাষা ও কাব্য দুঃখের গীতি গাহিয়া সমস্ত চরাচর বিশ্বকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই দুঃখ লইয়াই মানবের কাব্য। নির্ব্বাসিত যক্ষের বিলাপ, শ্রীরাধিকার বিরহ, হ্যামলেটের জীবনে বিস্পৃহা, নিষ্কলঙ্ক ডেস্‌ডিমনার শোকাবহ পরিণাম, পতিব্রতা ভ্রমরের লাঞ্ছনা—এ সকলই সেই বিশ্ব-বেদনার এক একটি মূর্চ্ছনা। সমস্ত মানবের জীবনের মধ্য দিয়া দুঃখ যে অবারিত স্রোতটি বহাইয়া দিয়াছে, তাহারই এক একটি ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ কবিতার ছন্দে ফুটিয়া উঠে, আর সেই বিশ্বব্যাপিনী বেদনায় ঝঙ্কারে সমস্ত মানবজীবন পূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, তেমনই অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন মানব-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্ব-চরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বিন্দুমেয় মনুষ্য-জীবন আধ্যাত্মিক বলে সমগ্র বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে। সমগ্র ইহলোক ও পরলোক মানববুদ্ধির বিষয়ীভূত হইয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানবের প্রয়োজন-সাধন করিতেছে। জড়বস্তু জড়ের কোনও প্রয়োজন-সাধন করে কি না সন্দেহস্থল, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের যাবতীয় বস্তু মানবের ভাগ্যের সহিত কোনও না কোনও প্রকারে জড়িত আছেই আছে।

এই যে এক বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। মানব

এই বহুধা বিভিন্ন শক্তি-সঙ্ঘের অবিশ্রাম ঘাতপ্রতিঘাতে সর্ব্বদা স্পন্দিত, জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা, অজানা, বিপুল ব্রহ্মাণ্ড-শক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তিসঞ্চয়-পূর্ব্বক অন্য সকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও বা পড়িতেছে, ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থা-বিপর্য্যয়। কখনও সুখরবির খরকিরণে সে ভাগ্য প্রসন্ন, নির্ম্মল, জাজ্বল্যমান ; আবার কখনও সে সুখ কেন্দ্রীয় ঊষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের তমিস্র কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয় !

ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবন এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত চক্ষুর সমক্ষে উন্মুক্ত করে। একদিকে যেমন যীশুর নিষ্ঠুর পরিণাম, সক্রেতিসের অপ্রত্যাশিত বিষপান, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের সংসার-ত্যাগ, সিজারের হত্যা, নেপোলিয়নের নির্ব্বাসন, অপরদিকে তেমনি পারস্যের পতন, উল্কার ন্যায় গ্রীসের উত্থান ও বিলয়, রোমের গৌরবদীপ্ত মধ্যাহ্নে সূর্য্যাস্ত— চিরাভিশাপগ্রস্ত ভারতের কথা আর তুলিয়া কাজ নাই—এ সকল ব্যক্তিগত ও জাতীয় দুঃখের কাহিনী বহন করিয়া ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরিয়া শোকাশ্রুপূত ব্রতচারিণী বিধবার ন্যায় চলিয়াছে। তাহার প্রতিপত্র দুঃখের তপ্তশ্বাসে ম্রিয়মাণ। যেখানে কোনও ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের আকস্মিক উন্নতি চক্ষু ঝলসিয়া দিতেছে, সেইখানেই এক বিরাট্ অধঃপতনের বিপুল আয়োজনের আভাসও অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। যেখানে চরিত্রের মহিমায়, শৌর্য্যের গৌরবে হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠে,

সেইখানে আবার কলঙ্ককালিমায়, ভগ্নহৃদয়ের হাহাকারে দিক্ আচ্ছন্ন হয়।

মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দুঃখের বিশাল ছায়ায় শিহরিয়া উঠিতে হয়। মনে হয়, যেন দুঃখের বিরাট্‌মূর্ত্তি মহাকায় কলোসাসের মত পদদ্বয়ের দ্বারা মানবের ভূত ও ভবিষ্যৎকে অধিকৃত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যতই আমরা উজ্জ্বলতর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করি না কেন, দুঃখের ছায়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে মলিন করিয়া দেয়। সুখবাদের (optimism) একটি প্রবল বাধা এই যে, সুখ বড় অনিশ্চিত, দুঃখের ন্যায় নিশ্চিত সংসারে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। সুখের সমষ্টি ও দুঃখের সমষ্টি মিলাইয়া দেখিলে সুখসমষ্টিরই আধিক্য দৃষ্ট হয়—এই ধারণাই সুখবাদের স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু সুখ ও দুঃখের "সমষ্টি" আদৌ করা যায় কি না, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অতীত সুখ এবং বর্ত্তমান সুখ যখন একই মাপকাঠির দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে না, অবস্থা ও কালভেদে যখন সুখ-দুঃখের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তখন তাহাদের যোগফল তুলনা করা অসম্ভব বলিয়াই ত মনে হয়। আর একটি অতি গুরুতর কথা এই যে, সুখের অনুভূতি অপেক্ষা দুঃখের অনুভূতি বোধ হয় মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত প্রবল। দুঃখ আমাদিগকে যত পীড়িত, ব্যথিত ও অভিভূত করে, সুখ তেমন আনন্দ দান করিতে সমর্থ নহে। সুখের মাদকতা অপেক্ষা দুঃখের তীব্রতা আমরা সমধিক অনুভব করিয়া থাকি। সেই জন্য এক দিনের, এমন কি এক দণ্ডের দুঃখ সারাজীবনের হাসিরাশিকে ম্লান ও

অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিতে পারে। সুখ বড় দুর্ম্মূল্য, বিলাসের সামগ্রী; অনেক সাধনা করিয়া অল্প পরিমাণে সুখ লাভ করা যায়,—সে সুখও আবার অনেক সময়ে দুঃখের সংমিশ্রণে বিস্বাদ হইয়া যায়। দুঃখ কিন্তু চিরস্থির, অনায়াসলব্ধ এবং অকৃত্রিম।

"The still sad music of humanity"—কবির এই মর্ম্মস্পর্শী বাক্যটি একটি অতি নিষ্ঠুর সত্যের আভাসমাত্র। মানুষের জীবনের সহিত দুঃখ যে কি এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা আছে, তাহা, যে বিধাতার বিধানে উহা নিয়ন্ত্রিত, সেই বিধাতাই কেবল বলিতে পারেন। কোন্ অনাদি অনির্ব্বচনীয় দুঃখে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, আর কোন্ দুঃখে সমগ্র জীবের ললাটে দুঃখ লিখিত হইয়াছিল, তাহা মানবের পক্ষে চিরান্ধ যবনিকায় আবৃত। ক্ষণিকের জন্যও যদি সে রহস্যময়ী যবনিকা অপসারিত হইত! কিন্তু তাহা হয় না। দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া যখন মানব অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুঃখের নবীন মূর্ত্তি মৃত্যু আসিয়া ক্লান্ত অক্ষিপঙ্ক্তি চিরমুদিত করিয়া দেয়। জীবনের প্রভাতে দিগ্‌বলয়ের পার্শ্বে যে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড সঞ্চিত ছিল, যেন তাহাই প্রসারিত হইয়া দিনমানের দীপ্তিকে চিরান্ধকারে পরিণত করিল!

দুঃখের সহিত সংগ্রামে পরাভূত হইয়া মানুষ কখনও বিচলিত, ক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, আবার কখনও সংসারের এই ক্রূর নির্ম্মম উপহাস দেখিয়া চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করে। চিন্তা মানবের স্বাধীন বৃত্তি—সেখানে সে অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারে। সেইজন্য যখন বিশ্বের সহিত কোনও

রূপে মানবের বনিয়া উঠে না, চারিদিকেই যখন লাঞ্ছনা, বেদনা, অপমান আসিয়া হৃদয়কে মথিত ও প্রপীড়িত করিয়া তুলে, তখন মানব আপনার মধ্যে সংহত হইয়া একটুখানি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। মানুষের যদি কোথাও কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে, তবে তাহা এইখানে। অবশ্য চিন্তার দ্বারা দুঃখের অবসান হইতে পারে কিনা এবং স্মরণাতীত কাল হইতে চিন্তা করিয়া মানব দুঃখের লাঘব করিতে পারিয়াছে কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, যতদিন হইতে মানুষ দুঃখভোগ করিতেছে, সেই সুদূর অতীত হইতেই মানুষের চিন্তা দুঃখের স্বরূপ ও প্রতীকার-নিরূপণে নিযুক্ত রহিয়াছে। দুঃখের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা কঠিন। কেননা দুঃখের ন্যায় আর একটি জিনিষও পৃথিবীতে নাই। দুঃখকে চিনাইয়া দিবার দরকারও হয় না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

বাংলা সাহিত্যে দেবেন্দ্রনাথের স্থান

আমাদের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত, এই দুজনেই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যের ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করিয়া গিয়াছেন। গদ্যরচনারীতির ইঁহারাই প্রথম প্রবর্ত্তক।

এ ধারণার মূল আমাদের মনের মধ্যে যতই গভীর হোক না কেন, ধারণাটি যে ভুল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কেন নাই, তাহা বলিতেছি।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত হইলেও তাহার গঠন এবং প্রকৃতি যে সংস্কৃতভাষা হইতে ভিন্ন, এ কথাটা চল্লিশ বছর পূর্ব্বে যাঁহারা বাংলা লিখিতেন তাঁহারা স্বীকার না করিলেও, এখন সকলেই স্বীকার করেন। করেন না কেবল তাহারাই, যাঁহারা বাংলা ভাষা লেখেন না।

অবশ্য বাংলার আধুনিক সভ্যতার ভাগীরথীর যিনি ভগীরথ, সেই রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্য লিখিবার বেলায় এ ভাষার গঠন যে সংস্কৃতের মত নয়, তাহা মানিয়া গিয়াছেন। ভাষার স্বাতন্ত্র্য তার গঠনের উপর নির্ভর করে জানিয়াই রামমোহন রায় যেমন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূচনা করিলেন, তেমনি গৌড়ীয় ব্যাকরণ লিখিতেও প্রবৃত্ত হইলেন। রামমোহন রায়ের বাংলা-রচনায় সন্ধি বা সমাসের শিকলগুলি রীতিমত খুলিয়া ফেলা হইয়াছে, দেখিতে পাই। সমাস সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার বাংলাভাষার গঠনের এই স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত সচেতন ছিলেন না। তাঁহারা সংস্কৃতের অলঙ্কারের বোঝা বাংলার গায়ে চাপাইলেন ; সংস্কৃত রচনারীতির পোষাক বাংলাভাষাকে পরাইলেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা যে তখনকার শিক্ষিতসাধারণের পছন্দসই হয় নাই, তাহার প্রধান প্রমাণ তাঁহাদের রচনাপ্রকাশের সমকালেই টেকচাঁদ্ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল" এবং কালীসিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা," এ দুখানি বই একেবারে চলিত সহজ সরস বাংলায় লিখিত হইয়াছিল। বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতি ও গম্ভীর সাধু ভাষার প্রতিক্রিয়ায় এই রূঢ় গ্রাম্যরীতি ও লঘু অসাধু ভাষা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল। অক্ষয় বাবু যখন "বাহ্যবস্তু ও তাহার সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" লিখিবার সময়ে "জিগীষা" "জুগোপিষা" "জিজীবিষা" প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন, তখন শুনা যায় যে, কলিকাতার শিক্ষিত লোকদের বাড়ীতে ঐ সব শব্দের সঙ্গে 'চিচ্টীমিষা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইত। প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মিলিয়া "মাসিক পত্রিকা" নাম দিয়া সহজ বাংলায় লিখিত একখানি কাগজও বাহির করেন।

অতএব, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রতিক্রিয়াতেই এই আলালী ভাষা দাঁড়ায়, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কোন প্রতিক্রিয়ারই লক্ষণ আপোষে হইতে পারে না। সেই কারণে আলালী ভাষা সংস্কৃতের কোন ধার

ধারে নাই। সংস্কৃতকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

আলালী ভাষার সৃষ্টি হইবার পর পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমই কলাসৌষ্ঠবপূর্ণ বাংলা গদ্য রচনারীতির যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিলেন। তিনি সংস্কৃত-রীতি বা গ্রাম্যরীতি কোনটাকেই অবলম্বন না করিয়া দুই রীতিকে মিশাইয়া দিলেন। সংস্কৃত শব্দ প্রচুর পরিমাণে লইলেন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠন অনুসারে বাংলাকে গড়িতে গেলেন না। বাংলার নিজস্ব গঠনটি বজায় রাখিয়া সকল রকমের ভাব অবাধে প্রকাশের জন্য এবং ভাষার মধ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণার জন্য, সংস্কৃত শব্দ ও পদ বাংলা শব্দ ও পদের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া তিনি বাংলাভাষাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিলেন। এই জন্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ "সোমপ্রকাশ" কাগজে এই নূতন সাহিত্যিক দলকে "শবপোড়া মড়াদাহের দল" নাম দিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকে বলে শবদাহ কিংবা মড়াপোড়া,—শবপোড়া এবং মড়াদাহ কেহই বলে না। এই বিদ্রূপ হইতেই বঙ্কিমী রীতির দিব্য পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু বঙ্কিম এই নূতন রচনারীতির উৎকর্ষ সাধন করিলেও, তাঁহাকে ইহার প্রবর্ত্তক বলা যায় না। এই রচনাপদ্ধতি প্রথম কবে কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা দেখিলেই এই মত খাড়া করা শক্ত হইয়া ওঠে যে, সাধু ও অসাধু ভাষার রচনাপদ্ধতি বহুকাল ধরিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। অবশ্য সাধুভাষার রচনারীতির নমুনা যদি কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমারের লেখা এবং অসাধুভাষার রচনারীতির নমুনা "হুতোম

প্যাঁচার নক্সা”র মত বই হইতে গ্রহণ করা হয়, তবেই ঐ মত দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু এটা ভুলিলে চলিবে না যে, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমারের সংস্কৃত-বহুল ভাষা ও আলালী ভাষার মাঝামাঝি একটা ভাষা ও রচনাপদ্ধতি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়-কুমারের বাংলা সাহিত্যে অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই মধ্যবর্ত্তী ভাষা ও রচনাপদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক। রামমোহন রায়ের গদ্য কোনমতেই আধুনিক গদ্য হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাকে প্রবর্ত্তক বলিলাম না; যদিচ তিনিই সর্ব্বাগ্রে সংস্কৃতভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষার গঠনের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। রামমোহন রায় তাঁহার রচনায় সন্ধি বা সমাসের শিকল খুলিয়া ফেলিলেও প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার রচনারীতি সাহিত্যে অচল। তাঁহাকে ভাষার শিল্পী বলা যায় না। বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী দেবেন্দ্রনাথ।

* * * * *

রামমোহন রায়ের পর দেবেন্দ্রনাথ নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা ও বিচার বাংলাভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন—“আত্মতত্ত্ববিদ্যা” “ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস” “ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান” পড়িলেই তাহা দেখা যায়। “জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি” বইটিতে বিজ্ঞানের অনেক কথা তাঁহাকে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। পশ্চিম মহাদেশের কত তত্ত্বকে তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন, অথচ ইংরাজী কোন শব্দকে গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। ইংরাজী দুরূহ কথাগুলির পরিভাষা এমন সহজে তিনি

করিয়া গিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার যে কোন রকমের কৃতিত্ব আছে তাহা মনে করাই শক্ত।

ক্রম-অভিব্যক্তি (Evolution), আপেক্ষিক সত্য (Relative Truth) প্রভৃতি কত কথা আমরা এখন ব্যবহার করিতেছি, অথচ এগুলি প্রথম তাঁহার দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়। সংস্কৃতভাষা খুব ভাল রকম জানার দরুণ, নূতন নূতন শব্দ তৈরি করিতে গিয়া ইংরাজী শব্দের কষ্টকল্পিত যো-শো-গোচের তর্জ্জমা করিয়া তাঁহাকে কাজ সারিতে হয় নাই। অক্ষয় বাবুর যে সকল রচনা তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইত, তাহা আগাগোড়া দেবেন্দ্রনাথ সংশোধন করিয়া সরল করিয়া দিতেন। তবু যথেষ্ট সরল করিয়াও তিনি শেষ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না শুনিয়াছি। রাজনারায়ণ বাবু যে সংস্কৃতের বন্ধন হইতে বাংলাকে মুক্ত করিয়া সহজ সরল বাংলায় সব ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহার মূলেও দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টই রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার লেখাও রীতিমত সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে বাংলায় দর্শনের আলোচনা করিয়া যে মনীষী বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রবীণ সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক "তত্ত্ববিদ্যা" যখন বাহির হয়, তখন তাঁহার পিতা দেবেন্দ্রনাথ সে বই আগাগোড়া দেখিয়া শুনিয়া সংশোধন করিয়া দেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যে উৎকৃষ্ট রচনারীতির তিনি যেমন প্রবর্ত্তক, তেমনি পথপ্রদর্শক।

তাঁহার সমস্ত রচনাবলীর মধ্যে ভাষা ও ষ্টাইলের উৎকর্ষের দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহার "আত্মজীবনী" ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আত্মজীবনীতে তাঁহার নানা জায়গায়

ভ্রমণের যে সকল চমৎকার ছবি আছে, তাহাতে দুচারিটি রেখায় ছবি আঁকিবার প্রতিভা যেমন স্ফুটিয়াছে, সমস্ত আশপাশ খুঁটিনাটি-গুলাকে চিত্রপটে পরিষ্কার দেখিয়া ঠিকমত সাজাইয়া তুলিবার নৈপুণ্যও কম প্রকাশ পায় নাই! ছবির রস এক "জীবনস্মৃতি" এবং "পালামৌ" ছাড়া অন্য কোন বাংলা বইয়ে এমন করিয়া জমিয়া ওঠে নাই। যেমন বাহিরের দৃশ্যছবি, তেমনি অন্তরের অদৃশ্য অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার ছবি, দুই ছবিরই রস তুল্যমাত্রায় আত্মজীবনীতে পূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে" ব্যাখ্যান অংশই সব চেয়ে কম—উপলব্ধির কথাই বেশি। সেই উপলব্ধির পিছনে সুদীর্ঘকালের জ্ঞানের সাধনা ও তপস্যা আছে, নানা সঞ্চয় আছে। সেই পলিতা, তেল, দীপাধার, প্রভৃতি সঞ্চয় ও সংগ্রহের ঠিক মুখে জ্বলিতেছে একটি শিখা, অধ্যাত্ম উপলব্ধির শিখা। সুতরাং তাহার আলোকে সমস্ত লেখা এমন অপূর্ব্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে যে, ষ্টাইল কোথাও টিম্‌টিমে বা নিষ্প্রভ বা দুর্ব্বল হইতে পারে নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধি কোথাও নূতন তত্ত্বের আকারে, কোথাও সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির আকারে, কোথাও ভক্তির মধুর উচ্ছ্বাসের আকারে, কোথাও দেশপ্রীতি-উদ্বেলিত স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থনার আকারে—নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

বাঙ্গলার রূপ

নমো নমো বঙ্গভূমি ;—কানন-কুন্তলা, নদীমেখলা, শস্যাঞ্চলা তুমি। তুষারধবল গিরিশৃঙ্গে তুমি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছ। মহাসমুদ্র তোমার চরণতল ধৌত করিয়া দিতেছে। অসংখ্য নরকঙ্কালকে বুকে লইয়া তুমি আজ কি স্বপ্ন দেখিতেছ ?

দিক্ দিগন্ত হইতে নানা স্রোত তোমার বুকে আসিয়া পড়িতেছে। আঘাতের পর আঘাতে যেন তুমি এক একবার চক্ষু মেলিতেছ, আবার তন্দ্রালসে চক্ষের পাতা মুদিয়া আসিতেছে।

সূর্য্যে তুমি দীপ্তি পাও, চন্দ্রে তুমি হাস, অন্ধকারে তুমি মুখ লুকাও। সৃষ্টি স্রোতের মত চলিয়াছে। এই স্রোতাবর্ত্তে তুমি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছ ? বিশ্বের এ অনন্ত রূপে, এই অনন্ত মূর্ত্তি-স্রোতে, কি তোমার বিশেষ রূপ, কি তোমার বিশিষ্ট মূর্ত্তি ? আমরা তোমার সেই রূপ দেখিতে চাই। সেই রূপে আমাদের প্রাণ মন ডুবাইতে চাই। তোমার সেই অপরূপ রূপের বালাই লইয়া আমরা মরিতে চাই। আমরা যে তোমার সন্তান।

বাঙ্গলার একটা রূপ ছিল। সে রূপ কোথায় লুকাইল ? চক্ষু মুদিলে অন্ধকার দেখি। নিরাকার—আর সমস্ত একাকার। কেন এমন হইল ? বাঙ্গালীর এ সর্ব্বনাশ কে করিল ? বাঙ্গালীর ধ্যানে বাঙ্গলার রূপ জাগে না কেন ?

বাঙ্গালীর মনে বাঙ্গলার মূর্ত্তি ফুটে না কেন ? কিসে এমন হইল ?

প্রাণের পরতে পরতে তোমার যে মূর্ত্তি খোদা ছিল, সে মূর্ত্তি ঢাকা পড়িল কিসের আবরণে? এই কুহেলিকা কোথা হইতে আসিল? এই কুজ্ঝটিকা কে সৃষ্টি করিল? তুমি কোথায় ডুবিলে? কোন্ পাপের এ শাস্তি? প্রস্তর-স্তম্ভে, গিরিগাত্রে তোমার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছ, আর বাঙ্গালীর অন্তর কি পাষাণ হইতেও পাষাণ? কোন্ পথে গেলে তোমার দেখা পাইব? তোমাকে না পাইলে আমরা কি লইয়া বাঁচিব? তোমাকে না পাইলে বাঁচিয়া লাভ কি?

এ যে বাঁচা মরার সন্ধিক্ষণ। এ ত লুকাইয়া থাকিবার সময় নয়। জাগ মা চৈতন্যময়ী, তুমি জাগ। বাঙ্গালীকে জাগাও। দিকে দিকে তোমার রূপ ছড়াইয়া দাও। আমরা বহুদিন পরে আর একবার সেই রূপ নয়ন মন ভরিয়া দেখি। আমাদের মানব জন্ম সফল হউক।

বর্ণরূপা তুমি। বর্ণে বর্ণে তোমার রূপ ফুটাইয়া তুল। বিচিত্র, অনন্ত রূপে তুমি আপনাকে প্রকট কর। বিশ্বের এই দুর্ব্বার স্রোতে তুমি আর একবার তোমার রূপের তরঙ্গ তুলিয়া দেখাও।

সর্ব্বাঙ্গে এ কি শ্মশান চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছ? দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত—একি মূর্ত্তি? কেন এ মূর্ত্তি? অমাবস্যার ঘনান্ধকারে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ হুঙ্কারে এই ঘন ঘোর দুর্য্যোগে দুর্ভাগা বাঙ্গালীর অদৃষ্ট লইয়া একি নিষ্ঠুর পরিহাস?

শিবে, সর্ব্বার্থসাধিকে, মা মঙ্গলময়ী, বাঙ্গালী এত কি অপরাধ করিয়াছে, মা?

এই কি তোমার রূপ? অন্ধকারকে ঘিরিয়া অন্ধকার, ব্যোম

—মহাব্যোমে তোমার তাণ্ডব নর্ত্তন, অণু পরমাণুতে প্রতি পলে তোমার উদ্দাম পদবিক্ষেপ, চক্র হ'তে চক্রান্তরে তোমার অশ্রান্ত ভ্রমণ।

কঙ্কালের উপর কেন এ খড়্গাঘাত? ভীমা প্রলয়ঙ্করী, কঙ্কালবাসিনী, এমনি করিয়াই কি একটা জাতির অদৃষ্টকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবি, মা?

নমস্তস্যৈ নমো নমঃ; সংবরণ কর, এ রূপ সংবরণ কর। বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে বাঙ্গালী তোমার আর এক রূপ ধ্যান করিতে চায়।

কি সে রূপ? একদিন বাঙ্গলার সেই রূপ বাঙ্গালীরই ধ্যানে মূর্ত্তি পাইয়াছিল। আজ বাঙ্গালী তাহা ভুলিয়াছে। তুমি বাঙ্গালীকে আজ সেই রূপ দেখাও। 'জ্বলচ্চিতামধ্যগতাং'—সমগ্র দেশব্যাপী এই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে দাঁড়াইয়া—'ঘোরদংষ্ট্রা করালিনী' মা,—তোমার মহা ভয়ঙ্করা লোলজিহ্বাকে সংযত কর। তুমি আয়ুঃ দাও, যশ দাও, সৌভাগ্য দাও, পুত্র দাও, ধন দাও, বাঙ্গলার সকল দুঃখ দূর কর, বাঙ্গালীর সকল অভীষ্ট পূর্ণ কর। মুক্তকেশী,—এই অন্ধকারে তোমার দক্ষিণ অঙ্গ ব্যাপিয়া আলুলায়িত কেশরাশি লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গলার ভাগ্যে এ অন্ধকার কে ঢালিয়া দিয়াছে? সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া এক মহাপ্রলয় দুলিয়া উঠিয়াছে। উদ্বেলিত প্রলয় পয়োধি হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা কর। সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি লইয়া তুমি বাঙ্গলার আকাশে উদিত হও। আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন,—"বিচিত্রবসনে দেবি অন্নদান-রতেঽনঘে"—হে বিচিত্রবসনপরিধানে, অন্নদাননিরতে, তুমি ভবদুঃখ-বিনাশিনী,—বাঙ্গালীর দুঃখ দূর কর। হে দেবি অন্নপূর্ণে,

তুমি চন্দ্রকে শিরোভূষণ করিয়াছ, হে সর্ব্বানন্দবিধায়িনি, হে সর্ব্ব-সাম্রাজ্যদায়িনি,—বাঙ্গালীকে একটা সাম্রাজ্য দাও।

ছিল একদিন,—বাঙ্গালী এমন একটা সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছে, যাহা কোন দেশের কোন সাম্রাজ্যের চেয়ে হীন নয়। অথচ,—অন্যে দূরের কথা—বাঙ্গালী-প্রধানদের মধ্যেই বা কয়জন তা জানে। বাঙ্গলার সৌভাগ্যসূর্য্য সেদিন মধ্যগগনে,—সেদিন বাঙ্গালী যে ভাষায় কথা বলিত,—ষড়্‌দর্শন খণ্ডন করিত,—নব নব ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিত,—সে ভাষা আমরা জানি না। সে বিরাট্ বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানি ছিন্ন পত্র আজ নিতান্ত অপরিচিতের মত আমাদের সম্মুখে বাতাসে উড়িয়া আসিয়াছে, আমাদের বুদ্ধিমানেরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না,—এ সাহিত্য কার?

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতির সাম্রাজ্য ছিল, সাহিত্য ছিল, স্বাধীনতা ছিল, তার ছিল না কি? তার শিল্প ছিল, কৃষি ছিল, বাণিজ্য ছিল, অর্ণবপোত ছিল। তার অস্ত্র ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধ ছিল, দিগ্বিজয় ছিল। তার সিংহাসন ছিল, তপোবন ছিল,—মন্দির ছিল, মঠ ছিল, নগর ছিল, গ্রাম ছিল। তার জাতি ছিল—গণ ছিল, শ্রেণী ছিল, সংঘ ছিল। তার আচার ছিল—ব্যবহার ছিল—প্রায়শ্চিত্ত ছিল। তার নিশান ছিল, ডঙ্কা ছিল, হুঙ্কার ছিল। একটা শক্তিমান্ মহান্ জাতি এই দেশে সহস্রবৎসরব্যাপী কি বিরাট ইতিহাস পশ্চাতে রাখিয়া আজ এক মুষ্টি অন্নের জন্য 'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে' বাঙ্গলার সুদূর পল্লীর পথে ঘাটে মাঠে আধমরার মত পড়িয়া ধুঁকিতেছে! কোন্ পাপের এই পরিণাম? কত বড় পাপ করিলে পৃথিবীর

এক অতি গৌরবশালী জাতিকে এই অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়? সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সাম্রাজ্য ছিল, স্বাধীনতা ছিল যে জাতির, আমরা কি সেই জাতি? এই বিশ্বের বিচিত্র স্রোতোধারার মধ্যে বাঙ্গালীর সভ্যতার কি একটা বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছিল! যুগে যুগে সেই রূপের কি বিভিন্ন রূপান্তর দেখা দিয়াছিল! সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গলার হিন্দু, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, একের পর আর ধর্ম্মকে গড়িয়াছে—ভাঙ্গিয়াছে—আবার গড়িয়াছে। সেই বিশিষ্ট রূপকে আশ্রয় করিয়াই বাঙ্গালী স্মৃতির আদেশ দিয়াছে,—নব্য দর্শনের উদ্ভাবন করিয়াছে,—গার্হস্থ্য, সমাজ ও সন্ন্যাসকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছে;—রাজদণ্ডকে নিয়মিত করিয়াছে, প্রজাশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়াছে, 'মাৎস্যন্যায়' দূরীভূত করিয়াছে, সমগ্র ভূভারতে বাঙ্গলার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আর এক অতি অপূর্ব্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা কি সেই জাতি? আমরা সেই জাতি। তবে বাঙ্গলার রূপ আবার আমাদের চক্ষের সম্মুখে কে তুলিয়া ধরিবে? কোথায় সে জ্ঞানী গুণী, কোথায় সে চিত্রকর ভাস্কর, কোথায় সে শিল্পী কবি, কোথায় সে বাঙ্গলার রূপের জীবন্ত বিগ্রহ?

সত্যই যিনি বলিয়াছেন বাঙ্গালীর মত একটা "আত্মবিস্মৃত জাতি" পৃথিবীতে আর দুইটি নাই, তিনি একেবারেই মিথ্যা কথা বলেন নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

পঞ্চাংশ

পূর্ব্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান-তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি[1]।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে
কি কহে দুহাত তুলি॥
একদিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ[2] করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া-বঁধুর সনে॥

চণ্ডীদাস।

১। চুল
২। শ্রীকৃষ্ণের সহিত বর্ণসাদৃশ্য-হেতু

বিরহ

হরি গেও [১] মধুপুর [২] হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥
নয়নক নিন্দ [৩] গেও বয়ানক হাস [৪]।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ মঝু [৫] পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥

বিদ্যাপতি

১। গিয়াছেন
২। মথুরা
৩। চোখের নিদ্রা
৪। মুখের হাসি
৫। আমার

গৌরচন্দ্রিকা[১]

বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম[২] রে
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব-কেশর জিনি একটী পুলক[৩] রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥
চলিতে না পারে গোরা চাঁদ গোসাঞি রে
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া হরি হরি বোলাইয়া
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি জিনি মদমত্ত হাতী
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ-বসন-ছবি জিনি প্রভাতের রবি
গোরা-অঙ্গে লহরী খেলায়॥
এ হেন সম্পদ্ কালে গোরা না ভজিনু হেলে
তছু[৪] পদে না করিনু আশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবনদাস॥

বৃন্দাবনদাস।

১। গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধীয় ২। অনুপম
৩। রোমাঞ্চ ৪। তাহার

সমুদ্রমন্থনে শিব

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সভে মথিলেক সিন্ধু না জানে শঙ্কর॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
কৈলাস-শিখরে গিয়া হৈল উপনীত॥
প্রণমিলা শিবদুর্গা দু'হার চরণে।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী দিলেন আসনে॥
নারদ বলিলা আছিলাম সুরপুরে।
শুনিল মথিলা সিন্ধু যত সুরাসুরে॥
বিষ্ণু পাইলা কমলা কৌস্তুভ মণি আদি।
হয় উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি॥
দেবে নানা রত্ন পাইল মেঘে পাইল জল।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুবর॥
নানা ধাতু মহৌষধি পাইল নরলোকে।
এই হেতু হৃদয়ে জন্মিল বহু শোকে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে নিবসে যতজনে।
সভে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে॥
তে কারণে তত্ত্ব লইতে আইলাম হেথা।
সভার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা॥
তোমারে না দিয়া ভাগ বাঁটি সভে নিল
এই হেতু মোর মন ধৈর্য্য না হইল॥

এতেক নারদ মুনি বলিলা বচন।
শুনিয়া উত্তর না করিল ত্রিলোচন॥
দেখি ক্রোধে কম্পিতা কহেন ত্রিলোচনা
নারদেরে কহে দেবী করি অভ্যর্থনা॥
কাহারে এতেক বাক্য কহিলে মুনিবর।
বৃক্ষেরে কহিলে যেন না পায় উত্তর॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভের মণিরত্ন কিবা কাজ তার॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিমূলী॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুস্তুর ভূষণ॥
সকল চিন্তিয়া মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর॥
জানিয়া ইহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে আমি শরীর ত্যজিল
দেবীর বচনে হাসি বলেন ভগবান্।
যে বলিলা হৈমবতী কিছু নহে আন
বাহন ভূষণ মোর কোন্ প্রয়োজন।
আমি লই যাহা নাহি লয় অন্তজন॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগি নিল দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তেঞি মোর বাঘাম্বর পরিতে হইল॥

অগুরু চন্দন লইল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয় তেঁই বিভূষণ করি॥
মণিরত্ন সভে লইল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল॥
বিল্বপত্র ধুস্তূরা-কুসুম ঘনঘসি।
কেহ না লইল তেঁই অঙ্গেতে বিভূষি॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ না লইল তেঁই আছয়ে বলদ॥
কহিলা যে দক্ষ মোরে পূজা না করিল।
অজ্ঞান-তিমিরে দক্ষ মোহিত আছিল॥
তেঁই মোকে না জানিয়া পূজা না করিল।
তাহার উচিত ফল তৎক্ষণে পাইল॥
দেবী বলে দারাপুত্র গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্ত এসব বচন॥
বিভব বিভূতি আদি সঞ্চে যত জনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে॥
সংসারেতে বিমুখ যেজন এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রে তুমি যেমত পূজিত।
সাক্ষাতেতে সে সকল হৈতেছে বিদিত॥
রত্নাকর মথিয়া লভিল রত্নগণ।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর এই বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥

কাশীরাম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজিতে আজ্ঞা করিলা নন্দীকে॥

পার্ব্বতীর কটুভাষ শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস
টানিয়া আনিল বাঘবাস।
বাসুকি নাগের দড়ি কাঁকালি বাঁধিল বেড়ি
তুলিয়া লৈল যুগপাশ॥
কপালে কলঙ্কি-কলা কণ্ঠেতে হাড়ের মালা
করযুগে কঙ্কুকি কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী ত্রিবিধ প্রকার ভূষি
ক্রোধে যেন প্রলয়-কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে আকাশে লহরী উঠে
উথে মধ্যে গঙ্গা জটাজটে।
রজত-পর্ব্বত-আভা কোটি চন্দ্র-মুখ-শোভা
ফণি-মণি বিরাজে মুকুটে॥
গলে দিল হার সাপ টঙ্কারি ফেলিল চাপ
ত্রিশূল, ভ্রূকুটি লইলা করে।
পদভরে ক্ষিতি টলে চিৎকার ছাড়িয়া চলে
অতিশয় বেগে ভয়ঙ্করে॥
ডম্বুরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভূমি
কম্প হইল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে।
অমর ঈশ্বর ভীত আর সবে সচিন্তিত
এ কোন্ প্রলয় হৈল বলে॥

বৃষভ সাজিয়া বেগে নন্দী আনি দিল আগে
নানা রত্ন করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ যেন কদলীর পাত
অতি শীঘ্র কৈলা আরোহণ॥

আগু-দলে সেনাপতি ময়ূর বাহনে গতি
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ করে ধরি পাশাঙ্কুশ
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধ-মন॥

বামে নন্দী মহাকাল করে শূল গলে মাল
পাছে জ্বরাসুর ষট্ পদে।
চলিলা দেবের রাজ দেখিয়া শিবের কাজ
তিন লোকে গণেন প্রমাদে॥

ক্ষণেকে ক্ষীরোদ-কূলে উত্তরিলা সহ দলে
যথায় মথনে সুরাসুর।
কাশীরাম দাস কয় শীঘ্রগতি প্রণময়
সর্ব্ব দেবে দেখিয়া ঠাকুর॥

করজোড়ে দাণ্ডাইলা সর্ব্ব দেবগণ।
শিব বলে মথ সিন্ধু রহাইলে কেন॥
ইন্দ্র বলে মথন হৈল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনে গেলেন হৃষীকেশ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর।
দ্বিতীয় ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥

শিব বলে এত গর্ব্ব তোমা সভাকার।
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার॥
রত্নাকর মথি সভে রত্ন লৈলে বাঁটি।
হেন চিত্তে না করিলে আছয়ে ধূর্জ্জটি॥
যে করিলে তাহা কিছু না করিয়ে মনে।
আমি মন্থিবারে কৈন্থ করহ হেলনে॥
এতেক বলিলা যদি দেব মহেশ্বর।
ভয়েতে দেবতা সব না করে উত্তর॥
নিঃশব্দে রহিলা সব দেবের সমাজ।
করজোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত॥
পারিজাত-মালা দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহেতে সেই পুষ্পমালা ইন্দ্র গলে দিল॥
গজরাজ আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি না জানিল মালার মহত্ত্ব॥
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিলা ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত মাল্য ইন্দ্র ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
সম্পদে হইয়া মত্ত গর্ব্ব কৈল মোরে।
দিল শাপ হতলক্ষ্মী হও পুরন্দরে॥

ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্য মণ্ডলে॥
লোকের কারণ ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আগে নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল মহেশ্বর।
শেষ মথনের দড়ি মন্থন মন্দর॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তুতি কৈল দেব বিশ্বেশ্বরে॥
নিবারি মথন তেঁই গেলা নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ॥
বিষ্ণু-বলে বলবান্ আছিল অমর।
ইবে বিষ্ণু বিনা শ্রমযুক্ত কলেবর॥
দ্বিতীয় মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনে প্রভু দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গের যতেক হাড় সব হৈল চুর।
সহস্র মুখেতে লাল বহয়ে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না যায় কথন।
আর আজ্ঞা নহে দেব মথন কারণ॥
শিব বলে আমা হেতু মথ একবার।
আসিবার অকারণ না হয় আমার॥
হরবাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মন্দর ধরিল দেবাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥

অত্যন্ত ঘর্ষণে পুনঃ মন্দর পর্ব্বত।
তপত হইল যেন জলদগ্নিবৎ॥
ছি ড়ি খণ্ড খণ্ড হইল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ সাগরে সব বহিল রুধির॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্র মুখের পথে গরল স্রবিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি সর্পের গরল :
দেবের নিশ্বাস আর মন্দর-অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সমুদ্র হৈতে আচম্বিতে বাহিরিল॥
প্রাতঃ হৈতে যেন দিনকর তেজ বাড়ে
দাবানল বাড়ে যে শুষ্ক বন পোড়ে॥
যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সংসার সকল॥
দহিল সভার অঙ্গ বিষম জ্বলনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্রচক্ষু কুবের বরুণ।
পবন শমন অগ্নি পলায় অরুণ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
অসুর কিন্নর যক্ষ যত ছিল আর॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন
বিষণ্ণ বদনে চাহে দেব ত্রিলোচন॥
দূর হৈতে সব দেবগণ করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভূতনাথ অনাথের গতি

আপন অর্জ্জিত সৃষ্টি বিষে করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হৈলা কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জুড়িয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর করিল গণ্ড‚ষে॥
দূর হৈতে সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিল গরল পান একই চুম্বকে॥
অঙ্গীকৃত কারণ লৈল ধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখিলা বিষ না লৈলা উদরে॥
নীলবর্ণকণ্ঠ অদ্যাপিহ বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম সেই হৈতে হৈল খ্যাত॥

কাশীরাম দাস।



স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, যার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমায় জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥

সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর-দান,
তরণি ধরণীবাসি-করে॥
বরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ, নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাস-ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রান্ত ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর বিভুগুণগান॥
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভাল বাসা, সে হোল না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভাল বাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে,
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কে বা আর পায় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি' কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি',—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি' কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি ;
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে, ফিরি, ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রমীলার চিতারোহণ

খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণ-দণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে!
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি!
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে, পূরে দেশ গম্ভীর আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজিরাজী সহ গজ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে!
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণ বর্ম্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকর-তেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমাসমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণ-বেশে—কৃষ্ণ হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি শশিকলাভাবে
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে!

উচ্ছ্বাসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্তপানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে !
হায় রে কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা !

চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম-বিহনে
বৃন্ত যথা ! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী, চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে।
প্রমীলার বীর-বেশ শোভে ঝলমলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট-মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে।
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে—মলিন দোঁহে।

ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা-আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী,
পেশল উরস্ হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।

বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজচূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমাবিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে ! কাঁদে ঘোর কোলাহলে

রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীমধনুঃ,
তূণীর, ফলক, খড়্গা, শঙ্খ, চক্র, গদা-
আদি অস্ত্র; সু-কবচ; গৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট; আর বীর-ভূষা যত।
সকরুণ গীতে গীতি গাইছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা নড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।

সুবর্ণ শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্ত্যে রতি মৃত-কাম সহ সহগামী!
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা;
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি
চামরিণী সু-চামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহা রবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে? কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকরকররাশি তোর বিম্বাধরে,

পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও-বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুকাইলে তরুরাজ, শুকায় রে লতা,
স্বয়ংবরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুকবিভা নয়ন ঝলসে!
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্ব্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারিদিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী:
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ
রাবণ;—বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,

নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল-বনিতা-
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে!
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে,
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে!

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে;—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও মহাবলী
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে! সাবধানে যাও হে সু-রথী!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাই ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণশূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্ব কথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি যুবরাজ! রাজচূড়ামণি,
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে,
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে!"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সু-রথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল:—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা,
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী;

মৃগে বায়ুকুলরাজ ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত ; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি ;—
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে ; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।
উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ ; বহিল বাহকে
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সু-কৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ, বিতরিলা সবে
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাবে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা ;—"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীব-লীলা জীবলীলা-স্থলে
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,

বাসন্তি ! মায়েরে মোর—" হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ! নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে !
মুহূর্ত্তে সংবরি শোক কহিলা সুন্দরী ;—
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এত দিনে ! যাঁহার হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব, সখি ! ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে ।"
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদ-তলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে ।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য ; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব ! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে ।
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম-আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি ; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণশরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারিদিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে !

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে ;—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!
ছিল আশা, রক্ষঃকুলরাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি ক'য়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি ক'য়ে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে !
নড়িল মস্তকে জটা ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক ধক ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে !
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে !
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব ; সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী ! তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায় ।” চরণযুগ ধরিলা জননী ।
সাদরে সতীরে তুলি কহিল ধূর্জ্জটি ;—
“বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে । জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি ! তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ।”
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;—
“পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে
আন শীঘ্র এ সু-ধামে রাক্ষস-দম্পতী ।”
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে !
সহসা জ্বলিল চিতা । সচকিতে সবে

দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ! বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে
চিরসুখহাসিরাশি মধুর-অধরে !
উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে !
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইলা সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

বসন্তে

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে;

চল লো জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।

সখি রে,—

উদয়-অচলে উষা দেখ আসি হাসিছে।

এ বিরহ বিভাবরী, কাটানু ধৈরয ধরি

এবে লো রব কি করি? প্রাণ কাঁদিছে।

চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে।

সখি রে,—

পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী।

ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,

বিহঙ্গমকুল-কল, মঙ্গলধ্বনি।

চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজ, সজনি!

সখি রে,—

পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।

দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে,

শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।

কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

* * * *

সখি রে,—

বন অতি রমিত হইল ফুল-ফুটনে।

পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,

উছলে সু-রবে জল, চল লো বনে।

চল লো জুড়াব আঁখি দেখি মধুসূদনে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সীতা ও সরমা

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফল-ফুলে;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী।

রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর-প্রার্থনে! —"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল সদৃশ
বৈরি-দলে সিন্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে।"—আশা, মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃপুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে?

একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার-কুটীরে
নীরবে! দুরন্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর-বনে।
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত-মণি;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে!

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও-অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময়-ধামে যেন! হেনকালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ তলে; সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে,—"দুরন্ত চেড়ীরা
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা-দু'খানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে

এ বেশ ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি !
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও-বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ।"
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা ! তারা-রত্ন যথা !
দিয়া ফোঁটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা ।
"ক্ষম, লক্ষ্মি, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু ; কিন্তু চির-দাসী, দাসী-ও-চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটী
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশ দিশ ! মৃদু-স্বরে কহিলা মৈথিলী,—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে । ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু । সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে ?"
কহিলা সরমা,—"দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ংবর-কথা তব সুধা-মুখে ;
কেন বা আইলা বনে রঘুকুল-মণি ।

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি ? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে।
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল ; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী,
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর ? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি করিল চুরি এ হেন রতনে ?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুর-ভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি ! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার ? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—

দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ ! রাজার নন্দিনী,
রঘুকুলবধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি !
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিকরাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক-নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত । সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে ।
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে
(অতুল রতন-সম), পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,

বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা-দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়ন-মণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?”
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে,—
“স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?-
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।”
উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি
মধু-স্বরা)—“এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে !
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
“পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে

ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে;
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুরবালা-কেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি! দিতাম বিবাহ
তরু-সহ; চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বন্দিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব-তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি; কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে। কত যে আদরে

তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র-কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা! এখনও, এ বিজন-বনে,
ভাবি আমি, শুনি যেন সে মধুর-বাণী!
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী,—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বনবাসে!
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে!
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা?
জগৎ-আনন্দ তুমি ভুবনমোহিনী!
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে

রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব-পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা বাণী কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্যসুধা, দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে ।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া ।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

ভারতসঙ্গীত *

"আর ঘুমাইও না দেখ চক্ষু মেলি
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী,
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতূহলী,
বিবিধ-মানব-জাতিরে ল'য়ে।
মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।

হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,

* ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবাজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতসঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।

ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে,
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।
মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্ত-যৌবনা য়ুনানী-মণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগৎ উজলি
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, নবীন জাপান,
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয়জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!
বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী,
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা

আয়তলোচন উন্নতললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়নজ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটী মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাধা ?

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে
সোণার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি
মস্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার !

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ,
যখন তাহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে,
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাহারা ক'জন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটী তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমেরু হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়া করিলে পণ।

তবে ভিন্নজাতি শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনও উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনও ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু বীরদর্প বুদ্ধি পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?
সকলি ত আছে সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা !

হয়েছে শ্মশান্ এ ভারতভূমি,
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—
আর কি ভারত সজীব আছে ?
সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীরপদভরে মেদিনী দুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে।"

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে,—
"এখনও জাগিয়া উঠ রে সবে,
এখনও সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবি-কর সম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক'রে।

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।
জপ তপ আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তূণীর-কৃপাণে কর রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর-শিখরে
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে,
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।
এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না—হবে না—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ্
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।
কিসের লাগিয়া হ'লি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞানবুদ্ধিজ্যোতি তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে প'ড়ে লুটাও।

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,

ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনও বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনও উন্নত,
সে জাহ্নবী-বারি এখনও ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃত্র-সংহার

রুদ্রপীড়ের যাত্রা

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।

দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল
অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
ভীম দর্পে ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ম্মে বর্ম্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি!
অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি-অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।
অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখে:—

সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।
সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জ্জন করি বচন কর্কশ—
" যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে ?
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে ?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন ?
ধিক্ আজি দৈত্য নামে ! হে সৈনিকগণ !
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে !
কোথা সে সাহস বীর্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী ?
সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঙ্ঘিয়া ;

খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে !
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে ;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ ! নামে কলঙ্কিলা !
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে ;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ ।”
বলিয়া গর্জ্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রম ।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে ।
“আন্ রে সে শিবশূল—আন্ রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর ।”
মিরথে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া ।
তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হ’য়ে কৃতাঞ্জলি ;-

কহিলা—"হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর !
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান পিতঃ, পূরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অস্ত্র যাই এ সংগ্রামে
যশস্বিন্। যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী ?
কোন্ কালে আমরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
কীর্ত্তি যাহা বীরলব্ধ বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জ্জন,
কি রাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে ?
ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে ?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে তব অঙ্গজগণ অতঃপরে ?
জন্ম বৃথা। কর্ম্ম বৃথা। বৃথা বংশখ্যাতি।
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা।
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয় !
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলি সে বৃথা !
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে,
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়।

বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব সম্পদ্ তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত !
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুর(ও) অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্ !—
বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন ;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ অই পদরেণু।
জানিবে অসুর সুর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।'

চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি ;—
"রুদ্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে ;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-তিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া!
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!—
তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখবিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,

নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা ;
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর !
যাও যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হ'ল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা, "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ।
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি ?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী কোথা বা ভীষণ ?"
আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,
বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা, "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে,
স্বর্গ হ'তে বহুদূর হিমাচলপথে
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শৃঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী-সহ।

নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী,
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ়প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভুমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে :
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত।"

শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর ;—
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত ?"

দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আসে শচী-সহ
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"
নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্নমতি,
কহিলা,—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস—ভীষণ নিহত।"
"ভীষণ নিহত?"—গর্জ্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস;
"রুদ্রপীড় পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিত্তে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি;
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাহ ধরাধামে;
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

কৃতাঞ্জলি হ'য়ে মন্ত্রী সুমিত্র তখন
কহিলা,—''দৈত্যেন্দ্র, এবে দেব-পরিবৃত
বিস্তীর্ণ এ স্বর্গপুরী, কি প্রকারে কহ
কুমার ভেদি এ ব্যূহ হবেন নির্গত ?
যুদ্ধে পরাজয়ি যদি দেব-অনীকিনী,
নির্গত হইতে হয় আনিতে শচীরে,
না বুঝি তবে বা সিদ্ধ সত্বর কিরূপে
করিবে কুমার কহ, তব অভিপ্রেত।
অসংখ্য এ দেব-সেনা দুর্জ্জয় সংগ্রামে,
অমর তাহাতে সবে সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ,
শঙ্কিত নহেক কেহ অস্ত্র-অস্ত্রাঘাতে,
মূর্চ্ছিত না হবে শিব-ত্রিশূল-বিহনে।
তবে কি আপনি যুদ্ধে করিবেন গতি
কুমার-সংহতি অস্ত্র, দানব-ঈশ্বর ?
বিমুক্ত করিয়া পথ পাঠান যদ্যপি,
কি প্রকারে পুনঃ হেথা হবে বা নিবেশ ?''
দৈত্যেশ কহিলা ;—''মন্ত্রি, সেনাপতি-পদে
বরণ করেছি পুত্রে, না যাব আপনি,
রুদ্রপীড়ে দিব এই ত্রিশূল আমার,
যাইবে আসিবে শূলহস্তে অবারিত।''
নিষেধ করিলা মন্ত্রী ত্যেয়াগিতে শূল,—
''পুরী-রক্ষা না হইবে অভাবে তাহার,
উপস্থিত হয় যদি সঙ্কট তাদৃশ
সমূহ দৈত্যের বল হবে নিঃসহায়।''

ভ্রূকুটি করিয়া তবে ললাট-প্রদেশে
স্থাপিয়া অঙ্গুলিদ্বয়, গর্ব্ব প্রকাশিয়া
কহিলা দানবপতি ;—"সুমিত্র হে, এই—
এই ভাগ্য যত দিন থাকিবে বৃত্রের,
জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায়
সমরে পরাস্ত করে—কিংবা অকুশল ;
অনুকূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার—
ধর রে ত্রিশূল, পুত্র, বীর রুদ্রপীড় ।"

রুদ্রপীড় কহে, "মন্ত্রি, কেন ত্রস্ত এত ?
জান না কি অভেদ্য এ আমার শরীর ?
বাসবের অস্ত্র ভিন্ন বিদীর্ণ কখন
না হইবে এই দেহ অন্য প্রহরণে ।
ইন্দ্র নাহি উপস্থিত, চিন্তা কর দূর,
যাইব অমর-ব্যূহ ভেদিয়া সত্বর,
আসিব আবার ব্যূহ ভেদিয়া তেমতি
শচীরে লইয়া সঙ্গে এ স্বরগপুরে ।
হে তাত, ত্রিশূল রাখ, নাহি রুদ্রতেজ
দেহেতে আমার, উহা নারিব তুলিতে ;
বীর কভু নাহি রাখে নিষ্ফল আয়ুধ
বিব্রত হইতে পশি সংগ্রামের স্থলে ।"

এইরূপে করি ক্ষান্ত মন্ত্রী, বৃত্রাসুরে,
শত সুসৈনিক দৈত্য সংহতি লইয়া
অসুর-কুমার শীঘ্র প্রাচীর-সন্নিধি
উপনীত হৈলা সুখে সুসজ্জিত বেশে ।

অনুসঙ্গী বীরগণ সহিত মন্ত্রণা
করিতে, কহিলা কেহ যুদ্ধ অবিধেয়,
কহিলা বা অন্য কেহ সমর উচিত—
রুদ্রপীড় নিপতিত উভয়-সঙ্কটে।
নিজ ইচ্ছা বলবতী, যশোলিপ্সা গাঢ়,
ঘটনা দুর্ঘট আর সুযোগ ঈদৃশ;
যুদ্ধই তাঁহার ইচ্ছা একান্ত প্রবল,
ছল কি কৌশল তাঁর নহে অভিপ্রেত।
নিরুপায় কোন মতে সমরে সম্মত
না পারি করিতে অন্য সঙ্গিগণে সবে,
অগত্যা সম্মতি দিলা অবশেষে তবে
অন্য কোন সদুপায় করিতে সুস্থির।
স্থির হৈল অবশেষে কাহার বচনে,
ভীষণের সহচর দূত যে কৌশলে
পশিলা নগরীমধ্যে, অবলম্বি তাহা,
নির্গত হইয়া গতি কর্ত্তব্য নৈমিষে।
কল্পনা করিয়া স্থির, দ্বারদেশে কোন,
আসি উপনীত দ্রুত— আসিয়া সেখানে
তুলিলা প্রাচীর-শিরে সুশুভ্র পতাকা,
দানবের যুদ্ধ-চিহ্ন শূল-বিরহিত।
উড়িল কেতন শুভ্র শূন্যে বিস্তারিত;
প্রকাণ্ড অর্ণবপোত ছিঁড়িয়া বন্ধন,
বাদাম উড়িল যেন আকাশমার্গেতে,
সমরকেতন অন্য হৈল সঙ্কুচিত।

বাজিল সম্ভাষ-শঙ্খ, দূত কোন জন
বার্ত্তা ল'য়ে প্রবেশিলা অমর-শিবিরে ;
কহিলা সেনানীবর্গে উচ্চসম্ভাষণে,—
"বৃত্রাসুর দৈত্যপতি যে হেতু প্রেরিলা
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হিমালয়পারে,
গন্ধর্ব্ব-সমরে তাঁর বিপন্ন জনক
দৈত্যেশ বৃত্রের ইচ্ছা প্রেরিতে সহায়
শত যোদ্ধা সেই স্থানে শীঘ্র অবিরোধে ;
দেবকুল তাহে যদি থাকহ সম্মত,
সংগ্রামে বিশ্রাম তবে দেহ কিছু কাল,
বহির্গত হৈতে তবে দেহ শত যোধে,
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্যে করিতে প্রস্থান।"

বার্ত্তা শুনি দেবপক্ষ-সেনাধ্যক্ষগণ—
বরুণ, পবন, অগ্নি, ভাস্কর, কুমার—
মিলিত হইয়া সবে করিলা মন্ত্রণা,
কি কর্ত্তব্য দানবের এ-বিধ প্রস্তাবে।
নিষেধ করিলা পাশী—প্রচেতা সুধীর,—
"উচিত না হয় পথ দিতে দৈত্যযোধে,
কপট, বঞ্চক, ক্রূর, দিতিসুত অতি,
নহেক উচিত বাক্যে প্রত্যয় তাদের !
ঐন্দ্রিলার পিতৃরাজ্য হৈতে দূত কেহ
যদিও আসিয়া থাকে অজ্ঞাতে আমার,
বিশ্বাস কি তথাপি সে দূতের বচনে ?
সেথানে থাকিলে পাশী না ছাড়িত তায়।

সূর্য্য-অভিপ্রায়—"দৈত্য-যোদ্ধা শত জন
ঐন্দ্রিলার পিত্রালয়ে যাক অবিরোধে,
দেব-যোদ্ধা কিন্তু কেহ পশ্চাতে তাদের
গমন করুক যেন না পারে ফিরিতে।"
অগ্নি কহে—"দুই তুল্য আমার নিকটে,
নিষেধ নাহিক তার নাহি অনিষেধ
অমর দৈত্যের সনে যেইখানে যাক্,
সম্মুখে পশ্চাতে শক্র কি তাহে প্রভেদ ?"
সতত অস্থিরচিত্ত পবন চঞ্চল,
কভু অভিমতে এর, কভু অন্যমতে,
অভিমত দিলা তার—সদা অনিশ্চিত—
যে কহে যখন মিলে তাহারই সহিত।
মহাসেন, সেনাপতি সকলের শেষে
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র—"বিপক্ষে দুর্ব্বল
করাই কর্ত্তব্য কার্য্য যুদ্ধের বিধানে ;
দৈত্যের প্রস্তাব দেবপক্ষে শ্রেয়স্কর।
স্বর্গ ছাড়ি মহাযোদ্ধা বীর শত জন
ধরাতে করিলে গতি দেবেরই মঙ্গল,
হীনবল হবে পুরী রক্ষক-বিহনে,
শ্রেয়ঃকর ছাড়িবারে অভিপ্রেত তাঁর।"
সেনাপতি-বাক্যে অন্য দেবতা সকলে
সম্মত হইলা—ধীর প্রচেতা ব্যতীত ;
বার্ত্তা ল'য়ে বার্ত্তাবহ প্রবেশি নগরে
রুদ্রপীড়-সন্নিধানে নিবেদিলা দ্রুত ;

মহাহর্ষ হৈল সবে ; দৈত্য-যোধ শত
নিষ্ক্রান্ত হইলা শীঘ্র ছাড়িয়া অমরা,
আহ্লাদে করিলা গতি পৃথিবী-উদ্দেশে
নৈমিষ অরণ্যে যথা শচী-নিবসতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিমালয়

(১)

অসীম নীরদ নয়,
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি !

(২)

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

(৩)

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে !

সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে!

(৪)

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে!
জ্বলন্ত অনল ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন জ্বালা মালা শোভে গলে।

(৫)

ও-ই কিবা ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
উর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর।
দাঁড়াইয়া পাদ-দেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর!

(৬)

ও-ই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক ঘটা ছটা রক্তময়!

তৃণ তরু লতা-জাল,
অপরূপ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় ।

(৭)

কিবা ও-ই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি,
দেদার চলিয়া গেছে কান্তারে কান্তার ।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতায় মন্দির গাঁথা মাথায় সবার ।

(৮)

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা,
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায় ।
কেমন পেখম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় ।

(৯)

ফেনিল সলিল-রাশি,
বেগভরে পড়ে আসি,
চন্দ্রলোক ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে ।

সুধাংশু-প্রবাহ-পারা
শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে।

(১০)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝোঁকে ঝোঁকে,
জেলের জালের মত হয়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ফেনার আরসি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার।

(১১)

নেমে নেমে ধারাগুলি,
করি করি কোলাকুলি,
একবেণী হয়ে হয়ে নদী বয়ে যায় ;
ঝরঝর কলকল
ঘোর রবে ভাঙ্গে জল
পশু পক্ষী কোলাহল করিয়া বেড়ায়।

(১২)

কিবা ভৃগু-পাদ-মূলে
উথুলে উথুলে দুলে
ট'লে ট'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ;

কবির, যোগীর ধ্যান,
ভোলা মহেশ্বর-প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী, পতিতপাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা!
জুড়াও প্রাণের জ্বালা!
জুড়াও ত্রিতাপ-জ্বালা মা তোমার জলে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

যমুনা-লহরী

নির্ম্মল-সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ! ও।

কত শত সুন্দর নগরী তীরে
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঞ্জন ও।

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা,
পরকাশিল, লয় পাইল ও।

কল কল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী,
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।

তব জল-কল্লোল সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও।

শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু,
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ-ভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও।
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও।
তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম-তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।

এ জল-ধারে ধীরে বহিল কভু,
প্রেম-বিরহ-আঁখিনীর ও।
নাচিল গাইল, কত সুখ সম্পদ,
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।

এ তনু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী,
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে,
প্লাবিত চিত্ত সুধা-উৎসে ও।

সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সে,
তবু সব মগন বিষাদে ও।
নাহিক সে সব প্রমোদ উৎসব,
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

যে মুরলী-রবে নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রজবালা ও।
আকুল প্রাণে তব তট-পানে,
ধাইত রব-সন্ধানে ও।

বর্দ্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত,
বিরচিত বলি তব হৃদয়ে ও।
সুহৃদ্-সমাগমে পুন এই দর্পণে,
প্রতিবিম্বিত সিত হাসি ও।

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি,
লেশ না রাখিলে শেষ ও।
কই সেই গৌরব, নিকুঞ্জ-সৌরভ,
হ'ল পরিণত শত কাহিনী ও।

কভু শত ধারে, এ উভ পারে,
পাঠান, আফ্গান, মোগল ও।
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী,
বাঁধিল ভারতে বন্ধনে ও।

অহো! কি কু-দিবসে, গ্রাসিল রাহু,
মোচন হইল না আর ও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি,
লুটি নিল যা ছিল সার ও।

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগৃহ,
পরবল-অর্গল-পাতে ও।
সে দিন হইতে, শ্মশান ভারত,
পর অসিঘাত-নিপাতে ও।

সে দিন হইতে, তব জল তরলে,
পরশে না কুলবালা ও।
সে দিন হইতে, ভারত-নারী,
অবরোধে অবরোধিত ও।

সে দিন হইতে, তব তট-গগনে,
নূপুর-নাদ বিনীরব ও।
সে দিন হইতে, সব প্রতিকূলে,
যে দিন ভারত-বন্ধন ও।

এ পয়ঃ-পারে কত কত জাতীয়,
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল, স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটী ও।

কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তট-দেশে ও।
নগর-প্রাচীরে ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ-সম্ভোগ আশে ও।

উপহসি সর্ব্বে, মানব-গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে,
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।

ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও।
দেখিছি যে সব, উজ্জ্বল লেখা
সে গত-যৌবন-রেখা ও।

এর অলিন্দে, সুন্দরীবৃন্দে,
মোগল নরপতি-কেশরী ও।
বসি ও-মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে,
তৌলিত মোহন রূপে ও।

কভু এ গবাক্ষে কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।

এ-ঘর মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কভু খেলিত চৌসর ও।
রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফর-কণ্ঠ-বিদারী ও।

কৈ ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'ল না নিবারিত,
নিস্ত্রপ মনুজ-পিপাসা ও।

সে গৃহ-পাশে কাঁপিত ত্রাসে,
ভূপতি-পদবিক্ষেপে ও।
সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পূরিছে মূত্র পুরীষে ও।

যে ঘর-মধ্যে, সুরভি-সমৃদ্ধে,
সম্মোহিত-চিত কালে ও।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পূতিগন্ধ বিকিরণ ও।

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হরি এক কালে
ঢাকিল লূতা-জালে ও।

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিক্‌দিক্‌ হইতে,
কর্ষে মনুজ-সমাজে ও।

কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল ইহারে,
শোষি' শোণিত কোষে ও।
দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও।

অহো! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটিনি! তট তব শোভি' ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যাপ্তিতে মন-অভিলাষে ও।

হবে কোন কালে, হন্ত ঘোর কালে
পরিমিত সুর-পরমায়ু ও।
রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে শুধু বায়ু ও।

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন প্রভাতে ও।
তবু মন ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে,
চরিছে লোক কি আশে ও।

গোবিন্দচন্দ্র রায়।

সিন্ধুতট

নির্ম্মল আনন্দরাশি, নির্ম্মল আনন্দ-হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু! আনন্দ নির্ম্মল,—
জলরাশি; হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল;
অপরাহ্ণ,—বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর!
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর!
নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে—মহা আলিঙ্গন!
মহাদৃশ্য!—অনন্তের অনন্ত মিলন!
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা; বেলায় তরঙ্গ-খেলা—
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেতপুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দগীত, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধু-বক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণু-বক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরাণী।
বিচিত্র শিবিরশ্রেণী, শত সংখ্যাতীত,
বিচিত্র কেতন শিরে, শোভিতেছে সিন্ধুতীরে,
সিন্ধু মত সিন্ধুপ্রিয়া করি তরঙ্গিত।

আসিছে যাদবগণ—আসিয়াছে কত,—
গজপৃষ্ঠে, অশ্বে, রথে, নানা দিকে, নানা পথে,
কল্লোলিত সিন্ধুপ্রিয়া করি সিন্ধু মত।
কিছু দূর মনোহর বঙ্কিম বেলায়,
নীল গগনের পটে অমল বিভায়,
কৃষ্ণের শিবিরশ্রেণী তুলি উর্দ্ধে শির
শোভিতেছে যেন দেব-পবিত্রমন্দির।
শিবির-চূড়ায় স্বর্ণ-ধ্বজে নিরুপম,
নীল কেতনের বক্ষে, পীত সুদর্শন,
কি লীলা সমুদ্রতীরে, সমুদ্র-অনিলে ধীরে
করিছে মহিমময়! সিন্ধু অবিরাম
অসংখ্য তরঙ্গ-করে করিছে প্রণাম।

নবীনচন্দ্র সেন

পাণ্ডব-গৌরব

দ্বারকার কক্ষ

(শ্রীকৃষ্ণ ও ভীম)

কৃষ্ণ। এস ভাই, এস বৃকোদর ;
দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে ?

ভীম। না জানি কি গুরু অপরাধে,
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি !
ত্রিভুবন অযশ গাহিবে,
দুর্য্যোধন সহায় হইলে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয় সাধ।
হে মুরারি, তব পদ স্মরি করিয়াছি পণ,
রণে দুর্য্যোধনে করিব নিধন,—
গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু।
মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে,
পাঞ্চালী খুলেছে বেণী ;—
যা'ক মম প্রতিজ্ঞা অতলে,
রহুক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন,
কুশলে কৌরব রহুক হস্তিনাপুরে,
খেদ নাহি করি।
কিন্তু আশ্রিতে ত্যজিব,

এ কলঙ্ক অর্পিতে মাথায়,
ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?
সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী।

কৃষ্ণ। কহ বীর কিবা প্রয়োজন ?
কহ তব কিবা হেতু আগমন ?

ভীম। মিনতি দাসের এই রাখ যদুপতি,
উপস্থিত রণ, আমার কারণ—
আমি তব অরি,
নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব ;
বধিয়া আমায়—বিবাদ ঘুচাও প্রভু।
আসিয়াছি দ্বৈরথ-সমর-আকিঞ্চনে,
অকিঞ্চনে করো না বঞ্চনা,
বাঞ্ছাকল্পতরু তব নাম।

কৃষ্ণ। বুঝিয়াছি বৃকোদর তব অহঙ্কার ;
তুমি বলবান্,
বাহুবলে নাহিক সমান তব,
তাই চাও যুদ্ধ মম সনে।
বুঝেছি কৌশল,
কিন্তু তুমি যদধিক ছল,
তা হ'তে অধিক ছল আমি।
বুঝাও আমায়,—
শত্রু নহে আর চারি ভ্রাতা তব !
বুদ্ধিহীন হেন কি ভেবেছ মোরে ?
প্রশ্রয় তোমায় নাহি দিলে যুধিষ্ঠির,

বল না কেমনে,
দণ্ডী-সহ কর বাস বিরাটনগরে ?
কেন বা অর্জ্জুন ভ্রমিয়া ভুবন,
সহায় করিবে যত ক্ষত্র রাজগণে ?
সহদেব নকুল দু'জনে,
প্রাণপণে যুদ্ধ-আয়োজন কেন করে ?
কহি আমি শুনেছি যেমন ।

ভীম । গিরিধারী,
নাহি বাহুবল তব,
চাহ বুঝাইতে,
তোমা হ'তে আমি বলাধিক !
ক্ষত্রিয়সমাজে,
কথা বটে সম্মানসূচক !
ছল নাহি আমি—অতি ছল তুমি,
মুক্তকণ্ঠে করি হে স্বীকার ।
ছলে চাহ ভুলাইতে,
ছলে কহ আশ্রিতে ত্যজিতে,
চতুরের চুড়ামণি তুমি !
কিন্তু শুন চিন্তামণি,
কল্পতরু ধর নাম,—
মিথ্যাবাদী নহে যুধিষ্ঠির !—
অনল সমান হৃদি দগ্ধ হয় অপমানে,
সে অনল নির্ব্বাণ-কারণে,—
স্থান চাই তোমার চরণে ।

সূতপুত্র কৌরবের ক্রীতদাস,
তাহারে সাধিল মাতা সাহায্য-কারণ ;
স্বচক্ষে নেহারি—তবু প্রাণ ধরি,
করি নাই আঁখি উৎপাটন !
দেহ রণ—লজ্জা রাখ লজ্জানিবারণ !
কণ্ঠে প্রাণ থাকিতে আমার,
দুর্য্যোধন-মৃত্যু নাহি হয়।
গদাধর, বধিয়া আমায়,
অপমানে কর ত্রাণ !

কৃষ্ণ। সমবল-সহ রণ ক্ষত্রিয়-নিয়ম।
যেই জরাসন্ধ-সহ রণে
ভঙ্গ দিছি কত বার,
তৃণবৎ ছিঁড়িলে তাহারে !
ধরেছিনু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন—
কিন্তু তব চরণের ঘায়,
গিরিশির চূর্ণ শত শত !
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায়,
লব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আমার,
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ।
পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,
কিন্তু কোন মতে
স্থান মম নাহি পায় চিতে।
জানিতাম সরল তোমায়,—
দেখি, তুমি আমা হতে অধিক চতুর।

ভাল,
বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?
ভীম। বুঝেও না বুঝে যেই জন,
কথার শকতি নাহি বুঝাতে তাহায়।
রাধার নন্দন কর্ণ শত্রু বাল্যাবধি,
করিল পাণ্ডব-মাতা তাহারে মিনতি।
পাণ্ডবের কুলনারী আনি কেশে ধরি,
যেই অরি উরু দেখাইল,
সভামাঝে বসন-হরণ—
করেছিল আকিঞ্চন,—
তারে পাণ্ডব-প্রধান, করিয়ে সম্মান,
আবাহন করিল সমরে হ'তে সাথী ;
হা কৃষ্ণ, এ হ'তে কিবা
হবে হে দুর্গতি ?
জানা'ব কাহায় ? দীর্ঘশ্বাস ঢালি তব পায়,
সেই তপ্ত শ্বাসে—
দগ্ধ হোক চরণ তোমার !
কৃষ্ণ। ভাল ভাল শঠ বৃকোদর,
ঘুচাইলে চতুরালী-অহঙ্কার।
কর্ণ-সহ কুন্তীদেবী কি কথা কহিল,
জানি আমি সে গুহ্য বারতা ;
শত্রু তুমি, কি হেতু তোমারে কব ?
মাতৃজ্ঞান করে কর্ণ তাঁরে,
আসন্ন-সমরে, পদ বন্দিবারে,

করেছিল আকিঞ্চন,
দরশন পেয়েছিল সে কারণে তাঁর।
কৌরব-পাণ্ডবে যদি মিলে এ আহবে,
তাহে তব কিবা অপমান?
বাড়িবে কেবল ভারতবংশের মান;
তোমার সম্মান অধিক বাড়িবে তাহে।
মম ভয়ে দণ্ডীরে ত্যজিল দুর্য্যোধন,
কিন্তু যথা—
অনল-সদনে উত্তাপিত হয় কায়,
সেইরূপ তোমার প্রভায়,
প্রভান্বিত দুর্য্যোধন।
অতুল বীরত্ব তব ক্ষত্রিয়-ব্যাভার—
পশিয়াছে হৃদয়ে তাহার;
ক্ষত্রধর্ম্ম শিখিয়াছে ক্ষত্রিয়-সমাজ,
তব উচ্চ আদর্শ হেরিয়ে।
তাই ভয়ে যারে করিল বর্জ্জন,
তাহার রক্ষণে পুনঃ প্রবেশিল রণে।
যাও যাও— কি বুঝাও ভীমসেন?
চাহ বধিয়া আমায় বিপদ্ করিতে দূরে,
চাহ ভ্রাতৃগণের কল্যাণ?
ভাব মনে ত্রিভুবন আমার সহায়,
পাছে হয় অকল্যাণ ভ্রাতার কাহারো;
তাই ছল করি আসি দ্বারকায়
পূরাইবে অভিলাষ।

যাও যাও—
দ্বন্দ্বযুদ্ধ তোমা সহ কভু না করিব।
ভীম। অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল!
তুমি লজ্জাহীন,
তোমারে কি লজ্জা দিব?
সম তব মান-অপমান,
নহে ক্ষত্র হ'য়ে কহ, কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয়-সদনে,
পরাজয়-ভয়ে রণে হও পরাঙ্মুখ।
নিন্দা-স্তুতি সমান তোমার,
কি হইবে রুষ্ট কথা ক'য়ে।
কিন্তু নাম ধর ভক্তাধীন,
কায় মন প্রাণ অর্পণ করেছি রাঙ্গা পায়,
তথাপি যন্তপি তুমি না বুঝ বেদনা—
রণস্থলে দেবতামণ্ডলে,
উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার—
নহ তুমি লজ্জানিবারণ,
নহ কভু ভক্তাধীন?
নহে কেন কর হতমান?
হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

———

সিদ্ধার্থের বৈরাগ্য

রাজপথ

(বৃদ্ধের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থ। এ কি ভীষণ আকার সম্মুখে আমার !
নরাকার কিন্তু নহে নর !
শুষ্ক চর্ম্ম অঙ্গে আবরণ ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির।
কহ হে সারথি, কোন্ জাতি জীব এই ?

সারথি। নর-জাতি শুন হে কুমার,
অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে,
অসহায় ভ্রমে ধরা'পরে,
জরাজীর্ণ শোচনীয় দশা।

সিদ্ধা। এ দশা কি হয় সবাকার ?
অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহারি ?
নর-জাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন

সার। হায় প্রভু, কাল বলবান্।
কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম,
বার্দ্ধক্যে তেমতি, মতিমান,
এ দশা সবার,

নিস্তার নাহিক এতে কার,—
দেহিমাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।

সিদ্ধা। আমি—গোপা—ফুল্লহাস্তি সহচরী সবে—
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে?

সার। যুবরাজ, সবে সমনিয়ম-অধীন;
রাজা কিংবা প্রজা—সমভাবে স্পর্শ করে কালে!

সিদ্ধা। এই সুখ ধরে কি সংসার?
জরায় নিস্তার নাহি কার!
এই হেতু জীবন-ধারণ!
সুখের যৌবন—এইমাত্র পরিণাম!
হায়, হেন কারাগারে,
কোন্ সুখে বাস করে নরে?
কি কারণ শাসন-আলয়ে
উঠে জয়-জয়-ধ্বনি?

(জনৈক রুগ্নের প্রবেশ)

রুগ্ন। আমায় ধর, আমার প্রাণ যায়, আমার চারদিকে আগুন জ্বলছে—আমার অস্থিগ্রন্থি সব শিথিল হচ্ছে—আমায় ধর!

সিদ্ধা। জীর্ণ-শীর্ণ হের চমৎকার!
দেহ-ভার চরণ না বহে;
কহে—অনল চৌদিকে,
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জর-জর তনু যেন!—
বার্দ্ধক্য কি স্পর্শিল ইহারে?

সার। মহারোগে শীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রন্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেহে ঘোর তাপ
বল-ক্ষয় রোগের প্রভাবে!

সিদ্ধা। কহ বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম?
এ দশা কি হয় সবাকার?

সার চলে দেহ যন্ত্রের সমান,
হে ধীমান্,
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার!
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার,
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন।

সিদ্ধা। এই ছার দেহের গৌরব?
এই হেতু বৈভব-লালসা?
কলেবর রোগের আগার,
যত্ন এত তার, পীড়ার পোষণ-হেতু?
কুসুম-সৌরভ, তপন-গৌরব,
চন্দ্রমার হাসি,
চিত্তফুল্লকর কহে যাহা ভ্রান্ত নরে,
ব্যঙ্গ করে রুগ্ন জনে
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস,
ক্ষণস্থায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে।

(অদূরে মৃত দেহ দেখিয়া)

স্পন্দহীন, হের পথমাঝে,
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি!
রুক্ষকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি করিছে রোদন!
কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি?
দেখ—দেখ, বস্ত্রে করি আচ্ছাদন
কাষ্ঠ-সম ল'য়ে যায় স্পন্দহীন দেহ!

সার। বিচিত্র কালের গতি, শুন যুবরাজ!
আছিল চেতন,
এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে।
মহানিদ্রাগত!
এ অভাগা আর না জাগিবে!

সিদ্ধা। কহ সত্য, ছন্দক, আমায়,
এ কি এই অভাগার কুলরীতি,
কিংবা সবাকার ও-ই পরিণাম?
মহানিদ্রা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন?

সার। কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, মরণ—
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে, যুবরাজ!
এই মানবের পরিণাম—
মৃত্যু ফেরে সাথে,
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন।

সিদ্ধা। বুঝিলাম—জলবিম্ব-সম এ শরীর!
গৌরব ইহার কিবা?

অম্বুবিম্ব-প্রায় নর উঠে,
অম্বুবিম্ব-প্রায় পুনঃ টুটে।
পাছে মৃত্যু ফিরে, লক্ষ্য নাহি করে;
ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ-আশা!
জেনে-শুনে অন্ধ রহে চিরদিন!
না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে
ভুলায় মানবে,
দেখেও না দেখে,
জেনেও না জানে;
আচরণে হয় অনুমান,
যেন অনন্ত সময়ে
ক্ষয় না হইবে কায়!
ধিক্—ধিক্ সংসার-প্রয়াস,
ধিক্ সুখ-আশ,
ধিক্ এ জীবন, ধিক্ এ চেতন!
শত ধিক্ ভঙ্গুর এ দেহে!
ভাবি মনে আমার—আমার!
কেবা কার মৃত্যু-পরে?
ও-ই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী—
কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,
ধরায় সম্বন্ধ নাহি আর!

(ভিক্ষুর প্রবেশ)

দেখ—দেখ,
গৈরিক বসন, প্রশান্ত বদন,

কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন !
কহ মোরে এ রহস্য কিবা ?

সার। বাসনা করিয়ে পরিহার,
ভ্রমে দ্বার-দ্বার,
ভিক্ষাজীবী সংসার-সম্বন্ধ-হীন ;
সুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,
নির্জ্জনে ঈশ্বরে পূজে ;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা।

সিদ্ধা। কোথা ব্রহ্ম ? কোথা তাঁর স্থান ?
শুনি ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা,
দুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?
জীবকুল কিবা অপরাধী,
নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে !
এ সংসার সন্তাপ-সাগর
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা,
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ-শোকে করে আর্ত্তনাদ,
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?
কিংবা ব্রহ্ম
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?

তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার ;
শাস্ত্রব্যাখ্যা সকলি অসার,
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে !
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
দয়াবান্ কভু সে ত নয় !
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে ;
লইব বিদায়, ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক-অন্বেষণে ।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ ;
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,
আর গৃহে রহিতে না পারি ;
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব !
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,
অলসে না হরিব জীবন ।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথাসাধ্য করেছি উদ্যম ।

[সকলের প্রস্থান ।]

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কাদম্বিনী

১

বল কাদম্বিনী, দামিনীহাসিনী,
কে তুমি কামিনী,
বিমানচারী।
ভুবন ভ্রমণ কর কি কারণ,
কি ভাবে কখন্,
বুঝিতে নারি॥

২

কভু ঘোরাননা, আঁধার-বরণা,
সাজ বিভীষণা,
সমর-সাজে।
দশনে দশন, কঠোর ঘর্ষণ,
ত্রাহি ত্রিভুবন
উগার বাজে॥

৩

তখন ভামিনী সরস মেদিনী,
জীবনদায়িনী,
বরষি বারি।

নাহি বুঝি গতি, নাহি বুঝি মতি,
কিবা রসবতী,
ভাব তোমারি ॥

৪

কভু ভয়ঙ্করী, কভু শুভঙ্করী,
তুমি কৃপা করি
বাঁচাও জীবে ।
নাই ডর বুকে, অনলের মুখে,
থাক বা কি সুখে,
এ খেলা কিবে ॥

৫

লতা-নবাঙ্গিনী, তরু-সোহাগিনী,
সাজাও রঙ্গিণী,
হাসাও ফুলে ।
দুকূল-বসনে, সোণার ভূষণে,
হাস ঊষা সনে,
মানস ভুলে ॥

৬

পাগলিনী-প্রায়, ধূলা-মাখা গায়,
ছিন্ন-ভিন্ন কায়,
শুইয়ে থাক।
কখন উতলা, গমন চপলা,
ধরি বায়ু-গলা,
সলিলে ডাক ॥

৭

সদা সুখ মনে, থাক গিরি-সনে,
প্রেম-আলিঙ্গনে,
বেড়িয়ে কটি।
তরল সলিলে, গড় তুমি শিলে,
এ কি নাট-লীলে,
দেখাও নটী ॥

৮

লোক-অগোচরে, তিমির-গহ্বরে,
স্নেহে কোলে ক'রে,
পাল গো নদী।
সাগরে শয়ন, বিমানে ভ্রমণ,
মজে ত্রিভুবন,
লুকাও যদি ॥

৯

খচিত রতনে, ইন্দ্র-শরাসনে,
পর সযতনে,
নিবিড় কেশে।
রবি শশধরে ঘেরিলে আদরে,
হেরে, সভা করে
দেবতা এসে॥

১০

কেন চাতকিনী হয় কুতুকিনী,
মিহিরমোহিনী,
তোমায় দেখে?
ছুটে তারা ত্রাসে, পড়ে তব গ্রাসে,
উঠিলে আকাশে,
সাগর থেকে?

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

দেবতা-ভিখারী

ও কে, গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায় !
ও কে, নেচে নেচে চলে, মুখে 'হরি' বলে
চ'লে চ'লে পাগলেরই প্রায় ।

ও কে, যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে, দেবতা-ভিখারী মানব-দুয়ারে
দেখে যা রে তোরা দেখে যা ।

(ও সে) বলে 'কৈ ত কেউ পর নাই',
(ও সে) বলে 'সবাই যে নিজ ভাই,
(ও সে) বলে 'শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে
(আমি) ভ্রমি দেশে দেশে—এই চাই ।,

ও কে, প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,
কেঁদে কেঁদে সারা, কেন ভাই ?
সব দ্বেষ-হিংসা ছুটি' আসি পড়ে লুটি'
(ও তার) ধূলি-মাখা দু'টি রাঙ্গা পায় ।

বলে, 'ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চ'লে যাই!
নৈলে প্রভু, তোমার প্রেমে গ'লে যাই!
এ যে, নূতন মধুর প্রণয়েরই পুর
হেথা আমাদের কোথা ঠাঁই?'

(ঐ যে) নরনারী সব পিছে ধায়,
(ওই) প্রতিধ্বনি ওঠে নীলিমায়;
(তোরা) আয় সবে চ'লে, মুখে 'হরি' ব'লে,
(তোদের) ছেঁড়াপুথি ফেলে চ'লে আয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রতিমা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে—এ বিশ্ব নিখিল
তোমারি প্রতিমা;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো! মন্দির যাঁহার
দিগন্ত নীলিমা!
তোমার প্রতিমা—শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্ত-পবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা!

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরী—তোমারি মহিমা ;

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—
শতরূপে মা গো ! বিরাজিত তুমি,
বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব-গরিমা !

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি',
তোমারে পূজিতে চাই মা ঈশ্বরি !
অমর কবির হৃদয় গভীর
ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা ;

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ! ধরা,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,
ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার! নাহি করি দরশন
তোমা-সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিৎ ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসায় নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তোষে প্রাণ-মন।

প্রভাতে অরুণ-ছটা, সায়াহ্ন-অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা কান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুকর, তারা-মাখা নীলাম্বর,
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন!

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জ-উপবনে
কোথা এত, কোথা এত বিমোহে নয়ন?

বাসন্ত কুসুমরাজি বিবিধ বরণ
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বহে সমীরণ?
তরুরাজি তব-সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম,
পাইব না, পাইব না খুঁজিয়া ভুবন!

কোথাকার দৃশ্যাবলী সুচারু এমন?
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি,
ভুলিব না, ভুলিব না জীবনে কখন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অন্তর্য্যামী

যখনি দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারি পাশে !
কোথা হ'তে আল দীপ, সম্মুখে তাহার ?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার ।

যখনি হৃদয়-যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার,
সুরহীন হ'য়ে আসে সঙ্গীতের ধার—
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর ?
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপূর !

চিত্তরঞ্জন দাশ ।

সেথা আমি কি গাহিব গান

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণ গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান্।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

রজনীকান্ত সেন।

সৃষ্টির বিশালতা

লক্ষ লক্ষ সৌর জগত
নীল-গগন-গর্ভে,
তীব্রবেগ, ভীমমূর্ত্তি
ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটি কোটি, তীক্ষ্ণ-উগ্র
অনল-পিণ্ড-তারা
দৃপ্তনাদে, ঝলকে ঝলকে,
উগরে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর
প্রকটে শক্তি-বিন্দু—
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান্,
চির-কারণ-সিন্ধু!

রজনীকান্ত সেন।

অতুল

১

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির !
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয় !
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,
উপবনে হাসে যত কুসুম-বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিশ্ব-অধিবাস !

বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক-ঢোল,
পাড়া পাড়া, বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল ;
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই !
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব বিশ্ব শিশু শোভা পায় !

খেলিতেছে নব বেশে বালক-বালিকা,
স্বস্তিক-মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা !
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী-স্নেহের আজ মহা-উদ্বোধন !

২

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে !
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয়-স্থল !
জগত উজ্জ্বল যার রজত-কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো-নিবারণে !
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার !
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার-খণ্ড জ্বলে ধবক্ ধবক্ !
জগত-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ !
ডাকিছে নিশার কাক—সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল !
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খালি !
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে 'অতুল ! অতুল !'

৩

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর ;
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে !

তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল !
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ !
নিরাশার নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে !
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল !
দিগ্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত-অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী !
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটী মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই !
চিরদাহ-জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া !

দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী
ভাবিতেছে শূন্যপানে চেয়ে একাকিনী,

আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন-উৎসব নীরব !
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাবান !
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?

অরুণের অগ্র জ্যোতি মৃদু পরকাশ
প্লাবিয়া রজত-স্বর্ণে পূরব আকাশ !
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া !
চাৎকারে, 'অতুল মোর আসিতেছে অই',
খুঁজিতে উড়িল কাক—'ক—ই, ক—ই, ক—ই ?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি !
শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিখিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল !

দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া দশমী !

গোবিন্দচন্দ্র দাস ।

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি'
এলোকেশী কে ঐ রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ করি'
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।
শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি'
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল ;
শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা অপরাজিতার মালা,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুম্‌কার ফুল !

নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি'
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধ'রেছে সুন্দরী !
স্রস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;
কালো রূপ ফাটিয়া পড়িছে ! যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন ।

ভক্তবৎসল ভগবান্

দ্বেষ নাহি কোন জনে, বাঁধে মৈত্রীর বন্ধনে,
সর্ব্বজীবে সকরুণ প্রাণ,
নির্ম্মম নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখ সম যার,
শত্রুতেও যেই ক্ষমাবান্।

সতত সন্তুষ্ট যতী, আমা'পরে স্থিরমতি,
সংযতাত্মা যেই জিতেন্দ্রিয়,
আমাতেই বুদ্ধি মন সপয়ে জীবন ধন,
সেই ভক্ত—আমার সে প্রিয়।

অন্যে নাহি দেয় ব্যথা, অব্যথ আপনি তথা,
নাহি জানে চিত্তের বিকার,
হর্ষ রাগ ভয়োদ্বেগ, ক্রোধের নাহি আবেগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।

নাহি কোন অভিরুচি, যিনি দক্ষ, যিনি শুচি,
উদাসীন রহে নিরাধার,
কর্ম্মে নাহি অনুরাগ, বিষয়েতে বীতরাগ,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।

নাহি শোক হর্ষ দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার নাহি লেশ,
শুভাশুভ না করে বিচার,
আমাতে অচলা ভক্তি, আমায় অনন্যাসক্তি,
সেই ভক্ত—প্রিয় সে আমার।

শত্রু মিত্র সম জ্ঞান, তথা মান অপমান,

অনাসক্ত ভকত উদার,

শীত উষ্ণ হর্ষ খেদ, সুখ দুঃখে নাহি ভেদ,

সর্ব্ব ভূতে সম দৃষ্টি যার,

স্তুতি নিন্দা তুল্য দেখে, বাক্যেতে সংযম শেখে,

যাহা পায় সন্তুষ্ট আপন ;

গেহহীন ভ্রমে যতী, অভ্রান্ত সরল গতি,

প্রিয় বড় আমার সে জন।

কহিনু যে ধর্ম্মামৃত, রহে তাহে চিরাশ্রিত,

উপাসয়ে যথা যে নিয়ম,

শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্, আমায় তদগত প্রাণ,

সব হ'তে মম প্রিয়তম।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ

ফোটে ফুল ঝরে যায়, লুটায় ধূলায়,
ভ'রে যায় বনতল পাটল পাতায় ;
আকাশে হারায়ে যায় পুরাণ দিবস,
স্মৃতিতে জড়ায়ে থাকে সুরভি-পরশ।
অর্পি নবীনের শিরে মুকুট-রতন
ফিরে যায় কুণ্ঠাহীন চিরপুরাতন ;—
আদি সে সফল হয় আসে যবে শেষ,
রূপে রাগে ধরাদেয় মূর্ত্ত নিরুদ্দেশ !
আসা যাওয়া, ফিরে চাওয়া,—মিছে অভিনয় ?
প্রাণপণ আকিঞ্চন, একি কিছু নয় ?
যুগ যুগ রহস্যের নিভৃত নির্ঝর,
জলধনু-তোরণের বর্ণ-রেণু-শর
কোথা ধায় ? কে শুধায় ? মূক নিরুত্তর—
কাঞ্চন-শৃঙ্গের মত কি মন্ত্রে নিথর !—
হায় ধ্রুব কোথা খুঁজি ! মুছি অশ্রুধারা—
অতল স্পর্শের তলে কোথা হই হারা !

এ কি রঙ্গ ! অফুরন্ত জন্ম মৃত্যু খেলা—
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতঙ্গের মেলা !
মুক্ত দ্বার,—অবারিত প্রাণের ভাঁড়ার—
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার !—

কবে বল' কোথা কোন্ নেপথ্য-আড়ালে,
কোন্ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে,
ফুরাইবে এ বিরহ ? পারাবার-শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে !

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

বিজয়া *

বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ ইন্দ্রপাত,
বিনাবাতে নিভে গেল মঙ্গল-প্রদীপ।
শমন পাইত শঙ্কা,
সম্মুখে শোনাতে ডঙ্কা,
প্রবাসে তস্করবেশে হইল প্রতীপ॥

দুর্দ্দম প্রতাপে পুষ্ট,
স্পষ্টবাদে স্তব্ধ দুষ্ট,
অশিষ্ট-শাসনপটু শিষ্টের সহায়।
বিদ্যাপীঠে গোষ্ঠিপতি,
একচেষ্ট হৃষ্টমতি,
জয়পত্র-লিপ্ত ভালে সর্ব্বত্র সভায়॥

দ্বিজবুদ্ধি, তেজে ক্ষত্র,
কর্ম্মক্ষেত্রে যত্র তত্র,
অধিপতি একচ্ছত্র জন্ম অধিকার।
প্রতিভার পূর্ণদৃষ্টি,
করিত নূতন সৃষ্টি,
ধ্বংসমুখী নহে মাত্র চিত্ত অবিকার॥

* সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-উপলক্ষে।

কেশাগ্র নখাস্তে দীপ্ত
জাগ্রত জীবন লিপ্ত,
সুস্থ দেহ দীপ্ত মন সুবিরাট কায় !
মরণের হলো বশ্য,
মুহূর্ত্তে হইল ভস্ম,
অধরের চিরহাস্য নিশেষে শুখায় ॥

বঙ্গ-কণ্ঠ শূন্য ক'রে,
বিহার কি হার হয়ে,
অগ্নি জ্বেলে দিলি দ্বেষে ভগ্নীর অন্তরে।
অহিংসার জন্মভূমি,
বুদ্ধের জননী তুমি,
বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জিলি গৌতম-মন্তরে ॥

ধ্যানে যাঁর ছিল দৃষ্টি,
নবীন নালন্দা-সৃষ্টি,
ভারতের ভারতীরে জাগাতে আবার।
আলো দিতে এ জগতে,
জ্ঞান-জ্যোতি প্রাচ্য হ'তে,
পুনরায় যায় যাতে বারিতে আঁধার ॥

না হইতে কর্ম্ম-সাঙ্গ,
মধ্যপথে ব্রত-ভঙ্গ,
বঙ্গের বরাঙ্গ বীর লুকাল কোথায়

তন্দ্রাহীন কর্ম্ম-রঙ্গে
বিরোধ বিশ্রাম সঙ্গে,
আলস্য উপাস্য চির হলো ছলনায় ॥

সার্থক পুরুষ নাম,
পৌরুষের পূর্ণধাম,
ক্ষমবান্ দম্ভি-দর্প করিবারে চূর্ণ।
দীনজনে আশুতোষ,
বিদ্রোহীরে রুদ্ররোষ,
বিদ্বানে বন্ধুত্ব-বাঁধে বেঁধে নিতে তূর্ণ ॥

এ বঙ্গের যত ছাত্র,
ছিল তব স্নেহপাত্র,
তারাই তো পুত্র মিত্র স্বাগত অতিথি।
অনর্গল গৃহদ্বার,
ঢল ঢল হৃদাধার,
কত অশ্রুজল দেব মুছায়েছ নিতি ॥

মাতৃ-গোত্রে প্রীতি অতি,
আশুতোষ সরস্বতী—
উপাধি-ভূষণ তব বিজয়-নিশান।
দেখিতে দেখিতে হায়,
সরস্বতীপূজা সায়,
বিষাদের বিজয়ায় প্রতিমা-ভাসান ॥

এ নগরী নিরানন্দে,
সাজাইয়া পুষ্প-গন্ধে
দেব-দেহ লয়ে স্কন্ধে করিল বহন ;
জগত জাগায়ে নামে,
ফিরে গেলে নিজ ধামে,
আদিগঙ্গা-তীর্থ-তীরে দেহের দাহন ॥

অমৃতলাল বসু।

অতিথি

১

সন্ধ্যা-তারকা উঠেছে তখন
গগন-পারে,
আসিল সে একা— অজানা অতিথি
আমার দ্বারে।

চাহিনু যেমনি মুখপানে তার,
মনে হ'ল—সে যে চির আপনার,
বরণ করিয়া মন্দিরে মোর
লইনু তারে।
আসিল সে যবে অজানা অতিথি
আমার দ্বারে!
রতন-প্রদীপ জ্বালিয়া অমনি
যতন-ভরে
কুসুম-আসন করিনু রচনা
তাহার তরে।

ভুলি' দুরাশায় ভাবিলাম মনে—
প্রবাসীর শত স্নেহের বাঁধনে
চিরদিন তরে এই গৃহ-মাঝে
রাখিব ধরে'।
কুসুম-আসন করিনু রচনা
যতন-ভরে।

২

তখনো প্রাচীতে আসেনি অরুণ,
জাগেনি পাখী,
তখনো নিদ্রা- আবেশে অবশ
আমার আঁখি।

ঘর ছাড়ি আসি অতিথি আমার
বাহিরিল পথে একাকী আবার,
নিবায়ে প্রদীপ, গৃহখানি মোর
আঁধারে ঢাকি'।
তখনো প্রাচীতে আসে নাই উষা
জাগেনি পাখী।
জানি না কোথায় কতদূর তার
আপন দেশ,
কবে হবে তার এই নিদারুণ
যাত্রা শেষ!

দিয়াছিনু মোর যত উপহার,
ফেলে গেছে সব, তবু মনে তার
জাগিবে কি কভু ক্ষণিক নিশার
স্মৃতির লেশ।
এই নিদারুণ যাত্রা তাহার
কোথায় শেষ!

৩

কণ্ঠে তাহার ছিল অমূল্য
রতন-হার,
ছিন্ন করিয়া ফেলে গেছে যত
মুকুতা তার!
তার সেই ধন কোথা আমি রাখি?
হারাই হারাই ভয়ে সদা থাকি,
অতিথি আমার ফিরিয়া কি কভু
আসিবে আর?
হার ছিঁড়ে সে যে ফেলে গেছে যত
মুকুতা তার!

রমণীমোহন ঘোষ

মানব-বন্দনা

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর,
নেত্র মেলি ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে ?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি'
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে ?
সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুত-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন !

২

আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে শিশিরে।

শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল ;
সম্মুখে শ্বাপদ-সঙ্ঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙ্গুল ;
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে ;—
কে তাহারে উদ্ধারিল ? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে ?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির ;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর ?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু ? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে ?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে ?
দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র স্বরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুন্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি দুগ্ধ ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ-সাথে
নিবিদ্ উচ্চারি' ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?

কে দিল ঔষধি রোগে, ক্ষতে প্রলেপন,
স্নেহে অনুরাগে ?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র অগ্নি বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে ?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ ?
কার ঋক্ সাম যজুঃ, চরক সুশ্রুত,
সংহিতা, পুরাণ ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ ? জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট ?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে ?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা কোশলে ?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
যুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ! বিদ্যুৎ-মোহন,
বজ্রমুষ্টিধর !

চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও
দলি' নীহারিকা
উদ্দীপ্ত তেজস্‌নেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা !
গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে !
দোলে মহাকাল-কোলে অণু পরমাণু—
বুঝিছ স্পর্শনে !

৮

নমি, হে সার্থক-কাম ! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব !
মর দেহে নহ মর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য ধৈর্য্য তব !
ল'য়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে !
গঠিলে আপন মূর্ত্তি—দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায় !
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে,
আপন স্রষ্টায় !

৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম চঞ্চল,
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!
নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি ভয়
কোথায়—কোথায়!
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণতায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে:
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্গাথ
গগনে পবনে।

হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় ;
ভ্রূভঙ্গে—ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম ব্যতিক্রম,
উদয় বিলয় !

৩

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস !
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ !
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার !
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার !
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয় !
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয় !

অক্ষয়কুমার বড়াল।

নমস্কার

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বার বার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

শ্রী-রূপে কমলা ছায়া-সম যার
আদরে ও অনাদরে,—
মালা দিল যারে সরস্বতী সে
আপনি স্বয়ম্বরে,—
কৌস্তুভ আর বন-ফুল-হার
সমতুল প্রেমে যার,—
যার বরে তনু পেয়েছে অতনু
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে,
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশিরূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—

জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

সৃজন-ধারার সোনার কমল
ধরেছে যে জন বুকে,—
শমীতরু-সম রুদ্র অনল
বহিছে শান্তমুখে,—
অনুখন যেই করিছে মথন
অতীতের পারাবার,—
অনাগত কোন অমৃতের লাগি',—
তাহারে নমস্কার।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

মৈত্র-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্। মরতে মহিমায়;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।

নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়,
হে বোধিসত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির নব
বিরাজে বাণীরূপে অমর দ্যুতিমান্;
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।

জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড়-করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল,
চিত যে বিচলিত,—চরণে রাখ তায়;

নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়;
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥

চাঁদের করে গড়া করন্ত সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মুরতি চারুতার ;
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ার।

তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে,
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ বার বার,
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধার॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী।
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল-আঁখি ছায়?

মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল এরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায়॥

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বৈকালী

১

অকূল আকাশে
অগাধ আলোক হাসে,
আমারি নয়নে
সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে!
পরাণ ভরিছে ত্রাসে

২

নিষ্প্রভ আঁখি
নিখিলে নিরখে কালি,
মন রে আমার
সাজা তুই বৈকালী,—
সন্ধ্যামণির ডালি।

৩

দিন দু'পহরে
সৃষ্টি যেতেছে মুছি';
দৃষ্টির সাথে
অশ্রু কি যায় ঘুচি'?
হায় গো কাহারে পুছি!

৪

একা একা আছি
রুধিয়া জানালা দ্বার,—
কাজের মানুষ
সবাই যে দুনিয়ার,—
সঙ্গ কে দিবে আর ?

৫

স্মরি একা একা
পুরাণো দিনের কথা
কত হারা হাসি
কত সুখ কত ব্যথা
বুক-ভরা ব্যাকুলতা।

৬

দিনেক দু' দিনে
মোহনিয়া হ'ল বুড়া!
অভ্রের ছবি
ছুঁতে ছুঁতে হ'ল গুঁড়া—
ডাঁটা-সার শিখিচূড়া।

৭

স্মৃতি-যাদুঘরে
যতগুলি ছিল দ্বার
উঘাড়ি উঘাড়ি
দেখিনু বারংবার,
ভাল নাহি লাগে আর।

৮

দিন কত পরে
পুরাণো না দিল রস,
শুকায়ে উঠিনু,—
শূন্য সুধা-কলস
চিত্ত না মানে বশ!

৯

চিত্ত না মানে
বুক-ভরা হাহাকার,
মৃত্যু-অধিক
নিবিড় অন্ধকার
সম্মুখে যে আমার!

১০

ফাগুনের দিনে
এ কি গো শ্রাবণী মসী!
বিনা মেঘে বুঝি
বজ্র পড়িবে খসি,
নিরালায় নিঃশ্বসি।

১১

সহসা আঁধারে
পেলাম পরশ কার?—
কে এলে দোসর
দুঃখে করিতে পার?
ঘুচাতে অন্ধকার!

১২

কার এ মধুর
পরশ সান্ত্বনায় ?
এত দিন যারে
করেছি অস্বীকার !—
আত্মীয় আত্মার !

১৩

এলে কি গো তুমি
এলে কি আমার চিত্তে ?
পূজা যে করেনি
বৈকালী তার নিতে ?
এলে কি গো এ নিভৃতে ?

১৪

দুঃখ-মথিত
চিত্ত-সাগর-জলে
আমার চিন্তা-
মণির জ্যোতি কি জ্বলে !
অতল অশ্রু-তলে !

১৫

দুঃখ-সাগর
মন্থন-করা মণি,
অভয়-শরণ
এসেছ চিন্তামণি !
জনম ধন্য গণি।

১৬

বাহিরে তিমির
ঘনাক্ এখন তবে,
আজ হ'তে তুমি
রবে মোর প্রাণে রবে,—
হবে গো দোসর হবে ।

১৭

বাহিরে যা' খুসী
হোক্ গো অতঃপর,
মনের ভুবনে
তুমি ভুবনেশ্বর
নির্ভয়-নির্ভর ।

১৮

এমনি যদি গো
কাছে কাছে তুমি থাক,
অভয় হস্ত
মস্তকে যদি রাখ—
কিছু আমি ভাবিনাক

১৯

আঁখি নিয়ে যদি
ফুটাও মনের আঁখি,
তাই হোক্ ওগো
কিছুই রেখ না বাকী,
উদ্বেল চিত্তে ডাকি ।

২০

দুটি হাত দিয়ে
ঢাক যদি দু' নয়ন,
তবুও তোমায়
চিনে নেবে মোর মন ;
জীবন-সাধন-ধন !

২১

পদ্মের মত
নয় গো এ আঁখি নয়,
তবু যদি নাও—
নিতে যদি সাধ হয়,
দিতে করিব না ভয় !

২২

আজি আমি জানি
দিয়েও সে হব ধনী—
চোখের বদলে
পাব চক্ষের মণি—
দৃষ্টি চিরন্তনী।

২৩

জয় ! জয় ! জয় !
তব জয় প্রেমময় !
তোমার অভয়
হোক প্রাণে অক্ষয় !
জয় ! জয় ! তব জয় !

২৪

প্রাণের তরাস
মরে যেন নিঃশেষে,
দাঁড়াও চিত্তে
মৃত্যু-হরণ বেশে,
দাঁড়াও মধুর হেসে।

২৫

আমি ভুলে যাই—
তুমি ভোলো নাকো কভু,
করুণা-নিরাশ-
জনে কৃপা কর তবু!
জয়! জয়! জয় প্রভু!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আজমীর

বিপুল সাগর-বারি বিদারি' যেমন
সিন্ধুচর মহানাগ জাগায় শরীর,
তেমনি বালুকাসিন্ধু করি' বিদারিত
বিরাজে অর্ব্বলিগিরি রাজোয়ারাদেশে,
ব্যাপি' শতক্রোশাধিক। কোথা বক্রদেহ,
ঋজু কোথা, কোন স্থলে কুণ্ডলিতপ্রায়,
কোথা মগ্ন, অবিদূরে ভাসমান পুনঃ।
শিরোমণি রূপে তার শোভে আজমীর,
শৈল-কিরীটিনী পুরী ; যুগ যুগাবধি
একাধারে ধর্ম্মে, কর্ম্মে অতুল ভারতে।

এই আজমীর বক্ষে ভাক্তসরোরূপী
বিরাজিছে তীর্থরাজ সুধন্য পুষ্কর ;
দেশ-দেশান্তর হ'তে, ব্যাকুলহৃদয়,
আসে যথা নর, নারী প্রক্ষালন তরে
কায়মনোগত পাপ। এই তীর্থতটে
আচরিলা মহাতপ, ব্রহ্মজ্ঞান-আশে,
প্রত্যক্ষ পুরুষকার বিশ্বামিত্র ঋষি ;
পুণ্যে, পাপে, জীবনের উত্থানে, পতনে
শিক্ষা দিয়া নরকুলে ইন্দ্রিয়-বিজয়,
ইষ্টসিদ্ধি সাধ্য, যদি রহে দৃঢ়পণ।

এই আজমীর-মাঝে, নাগশৈল 'পরে,
আচরিলা তপ সেই মহাপ্রাণ ঋষি

অগস্ত্য, স্বেচ্ছায় যিনি ত্যজি' চিরতরে
স্বদেশ, স্বজাতি, প্রাণ করিলা অর্পণ
উদ্ধারিতে উপেক্ষিত অনার্য্য-সন্তানে ;
রচি' শাস্ত্র, সৃজি' বিধি, নবীন জীবন
সঞ্চারিলা দাক্ষিণাত্যে। প্রশান্ত, সুন্দর
এখনও আশ্রম তাঁর বিরাজিছে হেথা।
এই আজমীর-মাঝে রাজা ভর্তৃহরি,
জর্জ্জরিত মনস্তাপে, করি' বিসর্জ্জন
সাম্রাজ্য, সম্ভ্রম, সুখ, কাটাইলা কাল
চীর-কমণ্ডলু লয়ে। "শতক" তাঁহার
এখনও মধুর রসে তৃপ্ত করে নরে।
এই আজমীর-মাঝে দয়ানন্দস্বামী,
কর্ম্মিষ্ঠ, নির্ভীক ঋষি, ব্যথিত হৃদয়,
নিরখিয়া আর্য্যসুতে বেদমার্গ হ'তে
পরিভ্রষ্ট, দৃঢ়পণে ভ্রমি' দেশে দেশে,
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, স্তুতি তুল্য উপেক্ষিয়া,
প্রচারিয়া বেদধর্ম্ম, লভিলা বিশ্রাম।
কিন্তু তপঃক্ষেত্র মাত্র নহে আজমীর,
প্রকৃতির রম্যোদ্যান ; ভূধরে, নির্ঝরে
নিরন্তর চিত্তহারী। পার্শ্বে নগরীর
দাঁড়াইয়া নাগশৈল ; শ্যাম শোভাময়,
মুখরিত বিহগের মধুর সঙ্গীতে ;
সুমন্দ সমীরে স্নিগ্ধ ; বরষা-সঞ্চারে
ঝঙ্কৃত নির্ঝর-রবে। অদূরে পুরীর

নীলগিরি, রত্নগিরি, গিরি স্বর্ণচূড়
প্রাচীর আকারে বেড়ি' রক্ষিছে পুষ্করে।
মাতৃবক্ষে স্তন-সম অমৃত-পূরিত
নগরীর মধ্যে শোভে রম্য হ্রদদ্বয়,
আনাসরোবর তথা বিশাল সাগর,
চৌহানের পুণ্যকীর্ত্তি। শিরে নগরীর
বিরাজিত তারাগিরি ; দুর্ভেদ্য প্রাকারে
পরিবৃত দুর্গ যার উচ্চে তুলি' শির,
করে উপহাস দর্পী অরাতি-সৈনিকে।
এই আজমীর তরে মহাযুদ্ধ কত
হিন্দু-মুসলমানে, তথা মোগল-পাঠানে,
রাজপুতে-রাজপুতে, মারহাঠা-ইংরাজে,
ঘটিয়াছে যুগে যুগে। প্রতি গিরি, নদী,
প্রতি শিলা, প্রতি রেণু কহিছে ইহার
গৌরব-কাহিনী কত মর্ম্মবিঘাতিনী
পাপ-পুণ্যময়ী কথা। রাজ-নিকেতন
হইয়াছে পান্থশালা ; হিন্দু দেবালয়
ধরেছে মস্‌জিদ-মূর্ত্তি। সর্ব্বধ্বংসী কাল
অতীতের চিহ্নগুলি মুছি' একে একে
জানাইছে আধিপত্য। হে পাঠক! যদি
তপঃক্ষেত্রে রণক্ষেত্র চাহ দেখিবারে,
এস, মোর সাথে, যাই আজমীর মাঝে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু।

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী !
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক-জননী-জননী !

নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনী !

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী !

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষ স্তন্যবাহিনী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন,
কেবল একটী দীর্ঘশ্বাস
নিত্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ—
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় রে মানবহৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই।
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য ক'রে দাও অন্য হাটে।

দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেইক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায় গোধূলি-আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলে নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়

হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ

রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ;
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারোমাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।

জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে
সেই কানে-কানে-ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা'
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে,
হে সম্রাট্-কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে

তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চ'লে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে ;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান ;

তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।

তবুও তোমার দূত অমলিন
শ্রান্তি-ক্লান্তহীন.
তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙাগড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চির বিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলে নাই?
কে বলে রে খোলে নাই
স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?

বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধিমন্দির

এই ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি',
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।

জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তা'র লাগি নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।

স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধন-বিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনো দিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট্, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ

পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারংবার !
তাই
চিহ্ন তব প'ড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছে তা' ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি 'পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।

তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র-পর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি প'ড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শত বর্ষ পরে

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি' আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ—
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি' পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে।

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ-দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি' কল্পনায় অবগাহি'
ভেবে দেখো মনে—
এক দিন শত বর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হ'তে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি' লাগে,—

নবীন ফাল্গুন-দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু-গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শত বর্ষ আগে।

সে দিন উতলা প্রাণে, হৃদয়-মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্প-প্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
এক দিন শত বর্ষ আগে।

আজি হ'তে শত বর্ষ পরে
এখন করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে ?
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে।
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে,
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,
পল্লবমর্ম্মরে
আজি হ'তে শত বর্ষ পরে ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার্থক বেদনা

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল ক'রে সুগন্ধ-ধন লুটবে॥

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মত ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তা'রে ক'রবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তা'র লুটবে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জন্মান্তর

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হ'তে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি নাই বা গেলাম বিলাত,
নাই বা পেলাম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাই রে হ'তে
ব্রজের রাখাল-বালক।
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক॥

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে,
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশীবটের তলে॥

ওরে বিহান্ হ'ল জাগো রে ভাই,
ডাকে পরস্পরে।
ওরে ঐ দধি-মন্থন-ধ্বনি
উঠ্‌ল ঘরে ঘরে।
হের মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর-রেণু,
হের আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ দোহন করে।
ওরে বিহান হ'ল জাগো রে ভাই,
ডাকে পরস্পরে॥

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে,
ওরে এ-পার ও-পার আঁধার হ'ল
কালিন্দীরি কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া-তরীর 'পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে।
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল-মূলে॥

মোরা নব-নবীন ফাগুন-রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি' অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে।
যবে দোলার ফুল-রসি
দিবে নীপশাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে ক'র্‌ব মেলা
নীল নদীর তীরে॥

আমি হব না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি ননী-ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোনো জন্মে পারি হ'তে
ব্রজের গোপ-বালক
তবে চাই না হ'তে নববঙ্গে
নবযুগের চালক॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাধনা

দেবি, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি',
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস-নিশি।
মনে যাহা ছিল হ'য়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি'।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি' পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি'
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধনখানি॥

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।

তুমি যদি দেবি, পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি'
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি ॥

দেবি, আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি'।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্র নীরব ম্লান
এই দীন বীণাখানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি' সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি খন,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্নতন্ত্র বীণা।

ওগো, ছিন্নতন্ত্র বীণা

দেখিয়া তোমার গুণিজন সবে

হাসিছে করিয়া ঘৃণা।

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি',

তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি'

সকল অগীত সঙ্গীতগুলি,

হৃদয়াসীনা।

ছিল যা' আশায় ফুটাবে ভাষায়

ছিন্নতন্ত্র বীণা॥

দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি' অনেক গান,

পেয়েছি অনেক ফল,

সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,

ভরেছি ধরণীতল।

যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,

যত দিন থাকে তত দিন থাক্.

যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্

ধূলার মাঝে।

বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ

আমার সে নয়, সবার সে আজ,

ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসারমাঝ

বিবিধ সাজে।

যা' কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আসি',
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।
ওগো বিফল বাসনা-রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি, লহ কর পাতি',
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি',
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি',
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা-রাশি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পদ্মা

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
এক দিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি' পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।

অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সে দিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন ;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়েছিল তোমাপানে হাসিভরা মুখে।
সে দিনের পর হ'তে, হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।

নানা কর্ম্মে মোর কাছে আসে নানা জন,
নাহি জানে আমাদের পরাণবন্ধন,
নাহি জানে কেন আসি সন্ধ্যা-অভিসারে
বালুকা-শয়ন পাতা নির্জ্জন এ পারে।
যখন মুখর তব চক্রবাকদল
সুপ্ত থাকে জলাশয়ে ছাড়ি' কোলাহল ;
যখন নিস্তব্ধ গ্রামে তব পূর্ব্বতীরে
রুদ্ধ হ'য়ে যায় দ্বার কুটীরে কুটীরে,
তুমি কোন্ গান করো আমি কোন্ গান
দুই তীরে কেহ তা'র পায়নি সন্ধান।
নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কত বার দেখাশুনা তোমায় আমায়।

কত দিন ভাবিয়াছি বসি' তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হ'তে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খর স্রোতে,—

কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙে-পড়া পাড়
পার হ'য়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শত বার যে নির্জ্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে না কি দেখাশুনা তোমায় আমায় ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গানভঙ্গ

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি স্বর
সাতটি যেন পোষা পাখী।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন
নাচিয়া ফিরে দশ দিকে,
কখন কোথা যায় না-পাই দিশা,
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।

আপনি গড়ি' তোলে বিপদ্‌জাল
আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে' অবাক্ মানে
সঘনে বলে "বাহা বাহা॥"

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
কাঠের মতো বসি' আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান
ভাল না লাগে তা'র কাছে।
বালক-বেলা হ'তে তাহারি গীতে
দিল সে এত কাল যাপি',
বাদল দিনে কতো মেঘের গান,
হোলির দিনে কতো কাফি।
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
ভাসিয়া গেছে দু' নয়ান।
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
সভার গৃহ গেছে পূরে',
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ভূপালী মূলতানী সুরে॥

ঘরেতে বারবার এসেছে কতো
বিবাহ-উৎসব-রাতি,
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস
জ্বলেছে শত শত বাতি।

বসেছে নব বর সলাজ মুখে
পরিয়া মণি-আভরণ,
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সমবয়সী প্রিয়জন,
সাম্‌নে বসি' তা'র বরজলাল
ধরেছে সাহানার সুর,
সে-সব দিন আর সে-সব গান
হৃদয়ে আছে পরিপূর।
সে-ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
কাশীর বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া॥

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে
বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায়
হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কানের কাছে তা'র রাখিয়া মুখ,
কহিল, "ওস্তাদ জি,
গানের মতো গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!

এ যেন পাখী ল'য়ে বিবিধ ছলে
শিকারী বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিলো, একালে হায়
গানের বড়ো অবহেলা॥"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে
আসন নিলো ধীরে ধীরে।
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
তুলিয়া নিলো তানপুরা,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি'
ইমনকল্যাণ সুর।
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
বৃহৎ সভাগৃহকোণে
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে
উড়িতে নারে প্রাণপণে।
বসিয়া বামপাশে প্রতাপ রায়
দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা, বাহা বাহা," কহিছে কানে
"গলা ছাড়িয়া গান গাহ॥"

সভার লোকে সবে অন্যমনা,
কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
কেহ বা চ'লে যায় ঘরে।
"ওরে রে আয় ল'য়ে তামাকু পান,"
ভৃত্যে ডাকি' কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে,
"গরম আজি অতিশয়।"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ,
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী,
কেবল দেখা যায় তানপূরায়
আঙুল কাঁপে থরথরি'।
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর
উছসি' উঠে নিজ সুখে,
হেলার কলরব শিলার মতো
চাপে সে উৎসের মুখে।
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ,
দু'দিকে ধায় দুই জনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
বরজ গায় প্রাণপণে॥

গানের এক পদ মনের ভ্রমে
হারায়ে গেলো কী করিয়া।
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে
লইতে চাহে শুধরিয়া।
আবার ভুলে' যায় পড়ে না মনে,
সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হ'তে ধরিল গান
আবার ভুলি' দিল ছাড়ি'।
দ্বিগুণ থরথরি' কাঁপিছে হাত,
স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।
গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া
রাখিল সুরটুকু ধরি',
সহসা হাহা রবে উঠিল কাঁদি'
গাহিতে গিয়ে হা হা করি'।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা,
কোথায় তাল গেল ভাসি',
গানের সূতা ছিঁড়ি' পড়িল খসি'
অশ্রু-মুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপূরার 'পরে
রাখিল লজ্জিত মাথা,
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে
বাল্য-ক্রন্দন-গাথা।

নয়ন ছলছল প্রতাপ রায়
কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হতে আমরা যাই,"
কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক দীপজ্বালা নয়নভরা
ছাড়ি' সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা
ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর।
বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু,
মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক—
ধরায় নব নব রঙ্গ।
জগতে আমাদের বিজন সভা
কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা,
মিনতি তব পদে স্বামী।
একাকী গায়কের নহে ত গান,
মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা,
আর জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ
তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে
তবে সে মর্ম্মর ফুটে।

জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি
যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা,
সেখানে গান নাহি জাগে॥"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্লভ জন্ম

এক দিন এই দেখা হ'য়ে যাবে শেষ,
পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।
পর দিনে এই মতো পোহাইবে রাত,
জাগ্রত জগৎ 'পরে জাগিবে প্রভাত।
কলরবে চলিবেক সংসারের খেলা,
সুখে দুঃখে ঘরে ঘরে বহি' যাবে বেলা
সে কথা স্মরণ করি' নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে
যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।

দুর্লভ জন্ম

দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাইনি তাও থাক্ যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ ব'লে যা চাইনি তাই মোরে দাও ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলোকে

আমরা তো আলোকের শিশু।
আলোকেতে কি অনন্ত খেলা!
আলোকেতে স্বপ্ন-জাগরণ,
জীবন ও মরণের খেলা।

জীবনের অসংখ্য প্রদীপ
এক মহা-চন্দ্রাতপ-তলে,
এক মহা-দিবাকর-করে,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে জ্বলে।

অনন্ত এ আলোকের মাঝে
আপনারে হারাইয়া যাই,
দুঃসহ এ জ্যোতির মাঝার
অন্ধবৎ ঘুরিয়া বেড়াই।

আমরা যে আলোকের শিশু,
আলো দেখি ভয় কেন পাই?
এস, চেয়ে দেখি দশ দিক্‌,
হেথা কারও ভয় কিছু নাই।

অসীম এ আলোক-সাগরে
ক্ষুদ্র দীপ নিবে' যদি যায়,
নিবুক না, কে বলিতে পারে
জ্বলিবে না সে যে পুনরায় ?

শ্রীকামিনী রায়।

সুখ

১

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল ;
সকলি গিয়াছে—কি আছে আর ?

নিবিল অকালে আশার প্রদীপ,
ভেঙ্গে-চুরে গেল বাসনা যত,
ছুটিল অকালে সুখের স্বপন,
জীবন-মরণ একই মত !

জীবন-মরণ একই মতন,—
ধরি এ জীবন কিসের তরে ?
ভগন হৃদয়ে ভগন পরাণ
কত কাল আর রাখিব ধরে' ?

বুঝিতাম যদি কেমন সংসার,
জানিতাম যদি জীবন-জ্বালা,
সাধের বীণাটি লয়ে' থাকিতাম
সংসার-আহ্বানে হইয়ে কালা।

সাধের বীণাটি করিয়া দোসর
যাইতাম চলি বিজন বনে,
নীরব নিস্তব্ধ কানন-হৃদয়ে
থাকিতাম পড়ি আপন মনে।

আপনার মনে থাকিতাম পড়ে',
কল্পনা-আরামে ঢালিয়া প্রাণ,
কে ধারিত পাপ সংসার-ধার ?
সংসারের ডাকে কে দিত কান ?

না বুঝিয়া হায় পশিনু সংসারে,
ভীষণ-দর্শন হেরিনু সব,
কল্পনার মম সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত
হইল শ্মশান, পিশাচরব।

হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে',
বাসনা-পিয়াসে উন্মত্ত মানব
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে'।

লক্ষ্য তারা ভূমে খসিয়া পড়িল,
আঁধারে আলোক ডুবিয়া গেল,
তমস হেরিতে ফুটিল নয়ন,
ভাঙ্গিয়ে হৃদয় শতধা হ'ল

সেই হৃদয়ের এই পরিণাম,
সে আশার ফল ফলিল এই !
সেই জীবনের কি কাজ জীবনে ?—
তিলমাত্র সুখ জীবনে নেই।

যাক্ যাক্ প্রাণ, নিবুক্ এ জ্বালা,
আয় ভাঙ্গা বীণে আবার গাই—
যাতনা—যাতনা—যাতনাই সার,
নরভাগ্যে সুখ কখনো নাই।

বিষাদ, বিষাদ, সর্ব্বত্র বিষাদ,
নরভাগ্যে সুখ লিখিত নাই,
কাঁদিবার তরে মানব-জীবন,
যত দিন বাঁচি কাঁদিয়া যাই।

২

নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া, কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?

কাঁদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন করে' ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মানব-জীবন অবনী'পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উচ্চৈঃস্বরে,—
না,—না,—না, মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।

কার্য্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ,
‘সুখ’, ‘সুখ’ করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে,
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস, আর ঘুর’ না পাঁকে।

যাতনা! যাতনা! কিসেরি যাতনা?
বিষাদ এতই কিসেরি তরে?
যদিই বা থাকে, যখন তখন
কি কাজ জানায়ে জগৎ ভরে’?

লুকান’ বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।

লুকান’ বিষাদ মানব-হৃদয়ে
গম্ভীর নিশীথ-শান্তির প্রায়,
দুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার,
আকাঙ্ক্ষার রব ভাঙ্গে না তায়।

বিষাদ—বিষাদ—বিষাদ বলিয়ে
　কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে' ?
মানবের মন এত কি অসার ?
　এতই সহজে নুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
　পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিতব্রতে পার না রাখিতে
　চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?

আপনারে লয়ে' বিব্রত রহিতে
　আসে নাই কেহ অবনী'পরে,—
সকলের তরে সকলে আমরা,
　প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

শ্রীকামিনী রায়।

অন্ধ বধূ

পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি !
আস্তে একটু চল্‌না ঠাকুর-ঝি—
ওমা, এ যে ঝরা-বকুল ! নয় ?
তাইত' বলি, বসে' দোরের পাশে,
রাত্তিরে কাল—মধু-মদির বাসে
আকাশ-পাতাল—কতই মনে হয় !
জ্যৈষ্ঠ আস্‌তে ক'দিন দেরী ভাই—
আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?
—অনেক দেরী ? কেমন করে' হবে ?
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,
দখিন হাওয়া—বন্ধ কবে ভাই ;
দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে—
শেওলা-পিছল—এম্‌নি শঙ্কা লাগে,
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই !
মন্দ নেহাৎ হয় না কিন্তু তায়—
অন্ধ চোখের দ্বন্দ্ব চুকে' যায় !

দুঃখ নাইক সত্যি কথা শোন্,
অন্ধ গেলে কি আর হবে, বোন?
বাঁচ্‌বি তোরা—দাদা ত' তোর আগে;
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ী আসার পথ খুঁজে' না পাবে—
দেখ্‌বি তখন—প্রবাস কেমন লাগে!
—কি বল্লি ভাই, কাঁদবে সন্ধ্যা-সকাল?
হা অদৃষ্ট, হায় রে আমার কপাল!
কত লোকেই যায় ত' পরবাসে—
কালবোশেখে কে না বাড়ী আসে?
চৈতালি কাজ, কবে যে সেই শেষ!
পাড়ার মানুষ ফিরল সবাই ঘর,
তোমার ভায়ের সবই স্বতন্তর—
ফিরে' আসার নাই কোন উদ্দেশ!
—ঐ যে হেথায় ঘরের কাঁটা আছে—
ফিরে' আস্‌তে হবে ত' তার কাছে!
এইখানেতে একটু ধরিস্ ভাই,
পিছল ভারি—ফস্‌কে যদি যাই—
এ অক্ষমার রক্ষা কি আর আছে!
আসুন ফিরে'—অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক্ ভালবাসা—
তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে!
জন্মশোধের বিদায় নিয়ে ফিরে'—
সেদিন তখন আস্‌ব দীঘির তীরে।

'চোখ-গেল' ঐ চেঁচিয়ে হ'ল সারা!
আচ্ছা দিদি, কি কর্‌বে ভাই তারা—
জন্ম লাগি' গিয়েছে যার চোখ!
কাঁদার সুখ যে বারণ তাহার, ছাই!
কাঁদ্‌তে পেলে বাঁচ্‌ত' সে যে ভাই,
কতক তবু কম্‌ ত' যে তার শোক!
'চোখ-গেল'—তার ভরসা তবু আছে,
চক্ষুহীনার কি কথা কার কাছে!
টানিস্‌ কেন? কিসের তাড়াতাড়ি?—
সেই ত' ফিরে' যাব আবার বাড়ী,
একলা-থাকা সেই ত' গৃহকোণ-
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে—
দরদ-ভরা দুখের আলাপন;
পরশ তাহার মায়ের স্নেহের মত'
ভুলায় খানিক মনের ব্যথা যত!
এবার এলে, হাতটি দিয়ে গায়ে,
অন্ধ আঁখি বুলিয়ে খানিক পায়ে—
বন্ধ চোখের অশ্রু রুধি' পাতায়,
জন্ম-দুখীর দীর্ঘ আয়ু দিয়ে
চিরবিদায় ভিক্ষা যাব নিয়ে,
সকল বালাই বহি' আপন মাথায়!—
দেখিস্‌ তখন, কাণার জন্য আর
কষ্ট কিছু হয় না যেন তাঁর।

তার পরে—এই শেওলা-দীঘির ধার—
সঙ্গে আস্‌তে বল্‌ব নাক' আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয়—
এই খানে এই বেতের বনের ধারে,
ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে—
সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়!
শেওলা-দীঘির শীতল অতল নীরে—
মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই, ফিরে'!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

শবরীর প্রতীক্ষা

পম্পাসরোবরতীরে সূর্য্যদেব অস্ত যান ধীরে,
বুলায়ে আরক্তকর ক্লান্ত তপ্ত ধরণীর শিরে
শান্তির আশিসে ভরা। ধূসর তরল অন্ধকারে
ছেয়ে আসে জল-স্থল-অন্তরীক্ষ অস্পষ্ট আকারে।
চাহিয়া ঈর্ষ্যার দৃষ্টি স্ফুটমান কুমুদের পানে
পরিপাণ্ডু পদ্মদল মুদে আঁখি রুদ্ধ অভিমানে।
তীরাবৃত শৈবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংস-কারণ্ডব-দলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে' আসে

আতৃপ্ত গদ্‌গদকণ্ঠে, বিধুনিত সিক্ত পক্ষপুটে ;
শষ্পগন্ধে ঝিল্লিচ্ছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।
মতঙ্গের তপোবনে সান্ধ্য হোম হয়ে এল শেষ
উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রে। ধীরে করি নয়ন-উন্মেষ
উঠিলা তপস্বিবর মন্দ পদে ছাড়ি দর্ভাসন,
যেথা দ্বার-প্রান্তদেশে নতজানু মুদ্রিত নয়ন
বসিয়া শ্রমণীবালা যুক্তকরে মৃত্তিকার 'পর ;
কহিলা উদার কণ্ঠে—'বৎসে, আজি লব অবসর
এ বারের জীবজন্মে, ত্যজি' দেহ সমাধি-আসনে।
ইহ জগতের চিন্তা কিছু আর নাহি আজি মনে
তোমার মঙ্গল ছাড়া ; অনাথিনী শবরকুমারী
আশ্রিত আশ্রমে মোর, জানি তুমি সত্যের ভিখারী।
(ঈষৎ থামিয়া) কি ভাবিছ মৌনমুখে ?'

শবরী। কি ভাবিব ? কিবা আছে আর ?
প্রভু, পিতা, এ জগতে কি আমার আছে বা চিন্তার !
সবই সুবিজ্ঞাত তব—চিন্তা, চেষ্টা, স্মরণ, মনন,—
যে দিন ও-পাদপদ্মে পতিতেরে দিয়াছ শরণ
আপনার কন্যা বলি', ইষ্টমন্ত্র সঁপি, তার কানে ;
আজন্ম দুর্ভাগা এই গৃহহীন অনার্য্য সন্তানে
পালিয়াছ শিষ্যারূপে পবিত্র এ তপোবনবাসে।
এক প্রশ্ন, তবু দেব, আজ্ঞা কর, মনে যাহা আসে,
কোন্ অপরাধে, প্রভু, অপরাধী আজি ও-চরণে,

হেন সুহৃঃসহবাসী যার লাগি' শুনিনু শ্রবণে—
মৃত্যুসম গণি যাহা ?

মতঙ্গ। অপরাধ ? নহে অপরাধ !
শান্ত হও, বৎসে, তুমি। অনর্থক না গণ প্রমাদ—.
যথার্থ এ উক্তি শুনি'। চিত্ত তব পবিত্র নির্ম্মল
সর্ব্বদোষলেশহীন। তথাপি এ সঙ্কল্প নিশ্চল—
ত্যজিব এ দেহবাস আপনারি অভিপ্রায়ক্রমে।
বারংবার বলিয়াছি,—মৃত্যুরে ভেব না শেষ ভ্রমে।
অনিত্য এ দেহমায়া। তোমারে জানাই আশীর্ব্বাদ—
পূর্ণ হোক্ ইষ্ট তব, সিদ্ধ হোক্ সাধনার সাধ।
সত্যের প্রতীক্ষা কর জীবনের অনুভূতিমাঝে
নিষ্ঠায় বাঁধিয়া বক্ষ।

শবরী। পিতা, পিতা, কিছু জানি না যে !
কে দিবে আমারে স্থান ? কোথা যাব ছাড়ি' তপোবন ?

মতঙ্গ। বৎসে, এ আশ্রমভূমি তোমারে করিনু সমর্পণ ;
আজি হ'তে সর্ব্বকার্য্যে তোমারে সঁপিনু অধিকার,
যোগ্যহস্তে শুদ্ধচিত্তে যদি তুমি পাল' এই ভার,
ধরি' তব সিদ্ধিরূপ মর্ত্ত্যে যিনি মূর্ত্ত নারায়ণ,
সেই রামচন্দ্র তব আশ্রমে দিবেন দরশন।
স্পর্শে যাঁর সঞ্জীবিত অভিশপ্ত অহল্যার প্রাণ,
অস্পৃশ্য নিষাদে যিনি সখ্যে বাঁধি' বক্ষে দেন স্থান,
অরণ্যের শাখামৃগ যাঁর প্রেমে বন্ধু প্রিয়তম,—
সেই রামচন্দ্র হেথা আসিবেন, শুন বাক্য মম ;

প্রতীক্ষা করহ তাঁর।...শিবমস্তু, আসন্ন সময়।

(ধীরপদে অন্তর্ধান)

শবরী। পিতা, পিতা!

(ভূমিতে অবলুণ্ঠিত প্রণাম ও উত্থান)

রামচন্দ্র, রামচন্দ্র! সেই দয়াময়

আসিবেন এ আশ্রমে? হেন ভাগ্য কবে হবে তার?

সাক্ষাৎ মিলিবে চক্ষে মর্ত্ত্যরূপে জগৎপিতার!

শান্ত হ' সন্দিগ্ধ মন! মিথ্যা নহে মতঙ্গের বাণী,

সত্যদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠ অসত্য না কহে কভু জানি।

—কি করিব? কোথা যাব? কি দিয়ে তুষিব দেবতারে?

কোন্ পথে, কোথা হ'তে, কেমনে সাক্ষাৎ পাব তাঁরে?

কি ফুলে গাঁথিব মালা? কোন্ বর্ণ মানাইবে ভালো

নবদুর্ব্বাদল দেহে? নিবে যদি দিবসের আলো,—

সন্ধ্যায় আসেন যদি? হেরিতে সে বরমূর্ত্তিখানি

কোন দীপ জ্বালি' লব? কালো হাতে কোন্ অর্ঘ্য আনি'

কোথায় বসাব তাঁরে? কি বলিয়া করিব আহ্বান?

পাদস্পর্শ করিব কি? অস্পৃশ্যা যে! তিনি ভগবান্!

কি ফল লাগিবে মিষ্ট ঐ মুখে? মহারাজ তিনি—

ধরণীর শ্রেষ্ঠ বংশে,—ভোগ্য তাঁর চক্ষে নাহি চিনি!

—পিতা, পিতা, এ কি ভার দিয়ে গেলে অক্ষমার হাতে?

আমি যে অযোগ্যা তার, কাঁপে চিত্ত সন্দেহ-দোলাতে!

দিনে-দিনে দিন যায়, দিন যায়,—রাত্রি যায় চলি';

মাসে-মাসে বর্ষ যায়,—বর্ষ যায়, আশার অঞ্জলি

শুকাইয়া উঠে হাতে—বেদনায়, ব্যর্থ প্রতীক্ষায় !
কৈশোর যৌবন ক্রমে, ভরে দেহ পূর্ণ সুষমায়
অজ্ঞাতে অনবধানে। দিন যায় ! রঘুপতি রাম—
কই তিনি ? কোথা তিনি ? হায় দরিদ্রের মনস্কাম !

লতায় ফুটিল ফুল—স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে ;
পরিপুষ্ট তনুবল্লী কমলে কাঞ্চনে কুরুবকে—
পূজার্থী প্রতিমা যেন। প্রতীক্ষায় কাটে দীর্ঘ দিন।
হৃদয়নয়নানন্দ কবে আসি' হবেন আসীন
অতর্কিত অবসরে ! অনাদরে যদি যান চলি'
মতঙ্গের তপোবনে অভ্যর্থনা মিলিল না বলি'—
অক্ষমার অপরাধে অবহেলা ভাবি' মনে মনে ;
ছি ছি ! মরি সে লজ্জায়, শিহরি সে ভ্রষ্ট আচরণে।

অপেক্ষার একাগ্রতা উগ্রতর করি' তাই চোখে
বনবীথি-তলেতলে ফিরে বালা মুগ্ধ দিবালোকে
উচ্চকিত অনুক্ষণ ; তপস্যার কাল বয়ে' যায় ;
আসিয়া থাকেন যদি অন্যপথে, ভাবিয়া ত্বরায়—
আবার আশ্রমে আসে ! শয্যা রচি' কুসুমে-পল্লবে
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী পথ চেয়ে বাঞ্ছিত বল্লভে !
কোথায় সে সীতাপতি, মূর্ত্তিমান্ অখিলের স্বামী !
অপেক্ষায় কাটে দিন ; অন্ধকার চক্ষে আসে নামি'।
রামচন্দ্রহীন রাত্রি ঘন হয়ে ঘিরে তপোবনে.
নিশি-জাগরণ-মসী আঁকি' শুধু কলঙ্কী নয়নে !

দিন যায়, রাত্রি যায় ; দিনে-রাতে মাস যায় ঘুরে',
মাসে-মাসে বর্ষ যায়, বর্ষে-বর্ষে যুগ আসে পূরে' ;—
রাঘবের নাহি দেখা, আশ্রমে সে পদ নাহি পড়ে ;
আবর্ত্তিত কালচক্র ! শিশিরে বসন্তকান্তি ঝরে !

পুষ্পহীন লতামঞ্চ, পক্কফলে আনত বিতান,
শিথিল বন্ধনমূল, শ্রীহীন মালঞ্চ ম্রিয়মাণ ;
খসে' পড়ে জীর্ণ পত্র, বিগলিত লোল গ্রন্থিজাল,
বার্দ্ধক্যের নামাবলী সর্ব্বাঙ্গে পরায় মহাকাল !
ব্যর্থতায় ভগ্নদেহ, দীপ্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন নয়নে,
আশ্রম-কুটীরপ্রান্তে শবরী তথাপি একমনে,—
দৃষ্টি মেলি' পথপানে,—কখন সে আসিবেন রাম
জরায় চরণ পঙ্গু,—মুখে শুধু জপে তাই নাম !
সুসজ্জিত পাদ্য-অর্ঘ্য, সুবিন্যস্ত ফলমূল-থারি,
নারিকেলপাত্রপূর্ণ সমাহৃত সরোবর-বারি !

দিন রাত্রি, রাত্রি দিন—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়—
কোনো মুগ্ধক্ষণে যদি রামভদ্র এসে ফিরে' যায়
মন্দ পদে ! মন্ত্রদ্রষ্টা মতঙ্গের বাণী অতর্কিত,
শুভ আগমন তাঁর ঘটিবেই, জানি যে নিশ্চিত ;—
কিন্তু যদি প্রাণ যায় ! 'রাম, রাম, কৌশল্যানন্দন !'
দ্রুততর চলে জপ—এস এস থাকিতে জীবন।
অবসন্ন দীর্ণ দেহ, অবশ অঙ্গুলি নাহি চলে,
রাত্রি ভোর হ'য়ে আসে, হাসে ঊষা উদয়-অচলে।

'সূর্য্যবংশ-অবতংশ' এস এস সর্ব্বগুণাধার,
এস হে করুণ-কান্ত—এ পতিতে করহ উদ্ধার।'
পম্পাসরোবরতীরে হাসে রবি কমললোচনে,
আপনারি গোত্রমাঝে প্রমূর্ত্ত হেরিয়া নারায়ণে।—
কার ঐ পদধ্বনি? কে আসে রে? আসে নাকি রাম?
চরণ চলিতে নারে,—ঘন ঘন জপে আয়ো নাম।
নাসায় পশিছে গন্ধ—পদ্ম কি ফুটিল দূর্ব্বাদলে?
—কই, কোথা প্রাণারাম? রুদ্ধ দৃষ্টি নয়নের জলে!

রামচন্দ্র। (মন্দ পদে সম্মুখে আসিয়া)
এই তো এসেছি আমি; কোথা তুমি শবরী সুন্দরি,—
কে বলে পতিতা তুমি? তুমি মোর মর্ম্ম-সহচরী!
কৃতার্থ আজিকে আমি তোমার বাঞ্ছিত দরশনে;
দৃষ্টি যার সত্যসন্ধী, তারেই তো খুঁজি ত্রিভুবনে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।



লালাবাবুর দীক্ষা

সিত মর্ম্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা, সার করি ঝোলামালা,
ভক্তগণের নামে লিখি' দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,— গুরু-করণের লাগি,
সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
একদা এলেন সেই নিভৃত নিকুঞ্জে।

সাধুমুখে নাম-গান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদয়ের যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"

সাধু কন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবো নাক' উদাসীন।"
এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন।

লালাবাবু যান ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট-দক্ষিণা সাথে থিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায় রে ভবে যশই কিনেছি জবে,
পায়ের কড়ির থলি একেবারে শূন্য ?
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া
বাহিরে তাহার রূপ-মঠ বেদী স্তম্ভ।
যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"
এই ভাবি সব ছাড়ি' মন্দির মঠ বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যামরাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে অপরূপ দৃশ্য,
সারা ব্রজমণ্ডলে রস-আলোড়ন চলে,
সাথে সাথে ভিড় করে যত দীন নিঃস্ব।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালী ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—গৃহিগণ ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু বদন করিয়া নীচু,—
মুষ্টি-ভিক্ষা তরে পাতে শুধু হস্ত।

মাস-ছয় গেল চ'লে গুরুর চরণতলে
জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন, "দেরী নাই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"
লালাবাবু ফিরে যান, ভেবে খুঁজে নাহি পান,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া,
কোন্ গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গো-মূত্র ?
সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচে নাক' অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি, "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী ! রেশা-রেশি আড়া-আড়ি
চলিয়াছে কত দিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য ভরে দর-ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহরমাঝে আজো অভিমান রাজে ?
হায়, হায়, অধমের হ'ল নাক' শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিবারে ভিক্ষা।"

এত ভাবি একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু "রাধে গোবিন্দ!"
শেঠেদের ঘরে-ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী,
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলি-পঙ্ক,
শেঠ্‌জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খ!
ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি' পাণি "আজি পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয়-সংবাদে,
সোণা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"
শেঠ হাঁকে বারবার, "সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা,— ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে।
সবে হরি হরি বলি', করতাল-কুতূহলী,
শেঠকুল-মহিলারা ফুল-লাজবর্ষে।

ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে
কহিলেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

শ্রীকালিদাস রায়

সিন্ধু-বিদায়

বিদায়, সিন্ধু ! আসি,
প্রবাস-বন্ধু, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা
সন্ধ্যাপ্রভাতে তোমার নান্দী বন্দনা-গান শোনা।
তোমার কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলে-খেলা,
ফুরালো বালুকা-মন্দির-গড়া আনমনে সারা বেলা।
হেরিব না হায় তোমার ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি,
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।
হেরিব না আর পুলিন-মাতার স্নেহের অঙ্ক'পরে,
ঊর্ম্মিমালার ফেনিল মূর্চ্ছা শ্রান্তি-হরণ তরে।

লভিব না আর প্রীতির শঙ্খ শুক্তির উপহার,
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার।

ছেড়ে যেতে তাই পিছু পানে চাই আর এক বার হেরি,
আগাতে পারি না, পদে পদে বাধা দেয় বালুকার বেড়ী।
ফিরে ফিরে আসি আর এক বার শেষ দেখে যাবো বলে'
এই ছুতা ধরে' আসা যাওয়া করে' সারাদিন গেল চলে'।
বালুতল হ'তে গুল্‌ফ ধরিয়া প্রীতির ফন্দ টানে
বঞ্চিত হয় যাত্রা আমার চাহিতে তোমার পানে।

ক'দিনের তরে শিশু-প্রাণটিরে আবার ফিরায়ে দিলে
ত্রিশ বছরের গুরুভার বোঝা, বন্ধু, নামায়ে নিলে।
দৃষ্টি ছুটিল দিগ্‌দিগন্তে লহরে লহরে নাচি'
তব তরঙ্গ নিয়ে গেল মোরে শ্রী-লোকের কাছাকাছি।
লভেছি চকিতে ভূমার আভাস—অশেষের সন্ধান,
ইন্দ্রনীলের কুম্ভে করেছি অমৃতানন্দ পান।
রণাবসন্ন সন্তান মার অঙ্কে আসিনু ফিরে
আত্মা আমার ফিরে এলো তার যেন সে আদিম নীড়ে।
সৃষ্টির সেই নব প্রভাতের,—শত জনমের আগে—
প্রাকৃত জীবন মাধুরীর স্মৃতি ভীড় ঠেলে ঠেলে জাগে।
ক্ষার-সমুদ্র নহ কভু মোর ক্ষীর-সমুদ্র তুমি,
রমাপদপূত শুভ্র কমলে ভরা তব তীরভূমি।

লীলা ফেলি' পুন ফিরিতে হইবে শিলা ঠেলিবার কাজে,
স্বেদপঙ্কিল সেই অজগর-বিবর নগরমাঝে।

আত্মার যেন পুনর্জন্ম পুন ভ্রূণপুটতলে,
কুলীরক যেন দংষ্ট্রায় ধরি' কবলে টানিছে বলে।
ফিরে যেতে হবে দৃষ্টি যথায় যখন যে দিকে ধায়,
প্রাচীরে ব্যাহত হইয়া জানায় ব্যাঘাতের বেদনায়।
ফিরে যেতে হবে সৃষ্টি যথায় মানুষেরই চারিদিকে,
ঢেকেছে পাথরে লোহালক্কড়ে স্রষ্টার সৃষ্টিকে।
ফিরে যেতে হবে জীবন যথায় বাতাসের ভিক্ষুক,
উন্নাস হয়ে টেনে নিতে হয় আকাশের বায়ুটুক।

ফিরে যেতে হবে পিষ্ট হইতে শাসন-যাঁতার চাপে,
ফিরে যেতে হবে টানিবারে ঘানি নাহি জানি কোন্ শাপে।
ঠাঁই নাই মোর হে বিরাট্, তব সুবিশাল পরিষদে,
তোমারে ছাড়িয়া, সিন্ধু, ফিরিয়া যেতে হবে গোষ্পদে।
এমন স্বর্গ অনুপভুক্ত এ ধরায় র'বে পড়ি
বাঁচিতে হইবে অন্ধকূপের ভেকের জীবন ধরি'।

যাই তবে যাই মিছে শুধু এই বাতুলের মত বকা,
যাই তবে যাই জীবন-জুড়ানো ভুবন-ভুলানো সখা;
যাই তবে যাই হৃদিতর্পণ ক্ষুধাতৃষাতাপহারী,
কাব্যের গুরু, মুক্তিসহায়, ভক্তির ভাণ্ডারী।
তবে যাই ভূমা! অন্নের লোভে, মিছে আর মায়াডোর,
ব্যথার সিন্ধু বক্ষে বহিয়া, পাথার বন্ধু মোর।

লোণা জল তার আজি অনিবার ঝরনার মত ঝরে,
প্রেমতৃষা-খর সৈকতে ভব আত্মবিলোপ করে।
সংসার ডাকে, বিদায়, বিদায়—তরল বৃন্দাবন,
বিগলিত প্রেম কল্পস্বপন, আনন্দ রসায়ন।

শ্রীকালিদাস রায়।

সাথী

ওগো সাথী! মম সাথী!—আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে-পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে।

যে-পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে!
(আমি সেই পথে যাবো সাথে!)

যে-পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে;
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে!
(আমি সেই পথে যাবো সাথে!)

যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়,
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে-পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন



মেঘের দল

মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
—ও আকাশ বল্ আমারে।
কেউ বা রঙীন ওড়্না গায়ে, কেউ সাদা, কেউ নীল বেশে।

তারা কোন্ যমুনার নীরে ভর্‌বে গাগরী,
কার বাঁশরী শুন্‌ল এরা সাগর-নাগরী, মরি মরি!
তারা বাজিয়ে নূপুর ঝুমুর ঝুমুর, যায় চ'লে কার উদ্দেশে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

কভু বাজিয়ে ডমরু তারা উল্লাসে নাচে,
কভু ভানুর সনে খেলে হোলি, প্রভাতে সাঁঝে, মরি মরি!
তারা বিধুর সনে কি কথা কয় উজ্জল মধুর হেসে!
—ও আকাশ বল্ আমারে।

আকাশ বল্‌রে আমায় বল্, আমার আঁখি-জল
তাদের মত জীবনখানি কর্‌বে কি শ্যামল—আমায় বল্ রে।
(আমি তাদের মত) আমার বঁধুর সনে মধুর খেলা,
খেল্‌ব কি দিনের শেষে?
—ও আকাশ বল্ আমারে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

হৃদ্-যমুনা

যদি তোর হৃদ্-যমুনা হ'ল রে উছল, রে ভোলা!
তবে তুই এ-কূল ও-কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা!

আজি তুই ভরা প্রাণে, ছুটে যা নৃত্যে গানে;
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা!

যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক্‌না চোখে জল, রে ভোলা।

দু'ধারে ফুল কুড়িয়ে, চ'লে যা মন জুড়িয়ে;
মালা তোর হ'লে বিফল, কর্‌বি কি তুই বল্, রে ভোলা!

মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি;
দু'দিনের কান্না-হাসি, ছল, ছল, ছল, রে ভোলা!

জীবনের হাটে আসি', বাজা তুই, বাজা বাঁশী,
থাক্‌না সেথা বেচা-কেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা!

অরূপের রূপের খেলা, চুপ ক'রে তুই দেখ্ দু'বেলা;
কাছে তোর এলে কুরূপ,—তুই মুখ ফিরিয়ে চল্, রে ভোলা!

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

বর্ষা-সুন্দরী

১

রাত দিন ঝম্-ঝম্
ঝাত্ত দিন টুপ্-টুপ
কি সাজে সেজেছ, রাণি
এ কি আজ অপরূপ !

২

আননে বিজলী-হাসি,
গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—
এ আবার কি বাহার !

৩

শিখী নাচে, ভেকে গায়,
মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে
কত করে আয়োজন !

৪

ডুবেছে রবির ছবি,
ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে
তরল রজত-ধারা।

৫

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা,
পরাণে ধরে না সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে
তোমারি স্নেহের মুখ !

৬

রাত দিন ঝম্-ঝম্
রাত দিন টুপ্-টুপ্,
দেখেছি অনেকতর
দেখিনি তো এত রূপ !

৭

জলদ-বিজলী তা'রা
এ উহার কর ধরে'
চলেছে পিছল পথে,
পা যেন পড়ে না সরে'।

৮

ভিজে গেল—ভেসে গেল—
ডুবে গেল ধরাখান,
গ'লে গেল, মেতে গেল
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ।

৯

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ
শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে
কত-কি-যে মনে আসে!

১০

জোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
আমি নিতি জেগে থাকি
বরিষার নীলিমায়!

১১

প্রাণ গলে—মন গলে—
দিগন্ত অনন্ত গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন
প্রেমের তুফান চলে।

১২

কে যেন লুকিয়ে আছে,
সে যেন সুমুখে নাই;
কারে যেন ডাকি নিতি
শত প্রাণ দিয়ে তাই!

১৩

সসীমে অসীমে আজ
হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন-পর
চিনিনে সে দিবানিশি !

১৪

শরৎ বসন্ত শীত
জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা ! তোমারি বুকে
অনন্ত প্রেমের রাশি !

১৫

সাধে কি বেসেছি ভাল,
সাধে কি আপনা-ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি
তোমারি চরণ-মূলে !

১৬

জোছনার ফুল যারা
ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
ঢালিব আমারি প্রাণ
বরিষার নীলিমায় ।

১৭

সবি তো ডুবিছে, রাণি !
আমিও ডুবিয়া যাব,
চির-সাধনার ফল
তোমাতে ডুবিলে পাব ॥

শ্রীমানকুমারী বসু ।

———

দারিদ্র্য

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান্ !
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা।—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার ;
বীণা মোর শাপে তব হ'ল তরবার !

দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস,
অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস,
অকালে শুকালে মোর রূপ রস প্রাণ !
শীর্ণ করপুট ভরি' সুন্দরের দান
যত বার নিতে যাই—হে বুভুক্ষু তুমি
অগ্রে আসি কর পান! শূন্য মরুভূমি
হেরি মম কল্পলোক। আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ !

বেদনাহলুদ-বৃন্ত কামনা আমার—
শেফালির মত শুভ্র সুরভি-বিথার
বিকশি' উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্ম্মম
দল বৃন্ত ভাঙ শাখা কাঠুরিয়া সম !
আশ্বিনের প্রভাতের মত ছলছল
ক'রে ওঠে সারা হিয়া, শিশির-সজল

টলটল ধরণীর মত করুণায়!
তুমি রবি তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কি ফল?
জ্বালা নাই, নেশা নাই, নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্ব্বল, অমরার অমৃত-সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটা-কুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা!'
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্ব্বাঙ্গে মোর নাগ নাগ-বালা!

ভিক্ষা-ঝুলি নিয়া ফেরো দ্বারে দ্বারে ঋষি
ক্ষমাহীন হে দুর্ব্বাসা! যাপিতেছে নিশি
সুখে বর-বধূ যথা—সেখানে কখন্
হে কঠোর-কণ্ঠ, গিয়া ডাক,—'মূঢ়, শোন্,
ধরণী বিলাস-কুঞ্জ নহে নহে কারো,
অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ, আরো
আছে কাঁটা শয্যাতলে, বাহুতে প্রিয়ার,
তাই এবে কর্ ভোগ!'—পড়ে হাহাকার
নিমেষে সে সুখ-স্বর্গে, নিবে যায় বাতি,
কাটিতে চাহে না যেন আর কাল-রাতি!

চল পথে অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণ তনু,
কি দেখি বাঁকিয়া ওঠে সহসা ভ্রূ-ধনু,
দু'নয়ন ভরি' রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ-তুফান,
প্রমোদ-কানন পুড়ে, পুড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা!

বিনয়ের ব্যভিচার নাহি তব পাশ,
তুমি চাহ নগ্নতার উলঙ্গ প্রকাশ।
সঙ্কোচ সরম বলি জান নাক' কিছু,
উন্নত করিছ শির যার মাথা নীচু।
মৃত্যু-পথযাত্রিদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে!
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছ মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে!

লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছ টানি
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি
সারদার, কি সুর বাজাতে চাহ, গুণী?
যত সুর আর্তনাদ হয়ে ওঠে শুনি!

প্রভাতে উঠিয়া কালি শুনিনু, সানাই
বাজিছে করুণ সুরে! যেন আসে নাই
আজো কা'রা ঘরে ফিরে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ডাকিছে তাদেরে যেন ঘরে 'সানাইয়া'!
বধূদের প্রাণ আজ সানা'য়ের সুরে
ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে

আসি আসি করিতেছে! সখি বলে, বল্‌
মুছিলি কেন লা আঁখি মুছিলি কাজল ?...
শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই
'আয় আয়' কাঁদিতেছে তেমনি সানাই!
ম্লানমুখী শেফালিকা পড়িতেছে ঝরি
বিধবার হাসি সম—স্নিগ্ধ গন্ধে ভরি'!
নেচে ফেরে প্রজাপতি চঞ্চল পাখায়
দুরন্ত নেশায় আজি, পুষ্প-প্রগল্‌ভায়
চুম্বনে বিবশ করি'! ভোমরার পাখা
পরাগে হলুদ আজি, অঙ্গে মধু মাখা!
উছলি' উঠিছে যেন দিকে দিকে প্রাণ!
আপনার অগোচরে গেয়ে উঠি গান
আগমনী আনন্দের! অকারণে আঁখি
পু'রে আসে অশ্রু-জলে! মিলনের রাখী
কে যেন বাঁধিয়া দেয় ধরণীর সাথে,
পুষ্পাঞ্জলি ভরি' দুটি মাটী-মাখা হাতে
ধরণী এগিয়ে আসে দেয় উপহার।
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার!—
সহসা চমকি উঠি! হয়ে মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে, খাও নিক' কিছু
কালি হ'তে সারাদিন তাপস নিষ্ঠুর,
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর!
পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!—মোর অধিকার

আনন্দের নাহি নাহি ! দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হ'য়ে জায়া হ'য়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি ! কে বাজাবে বাঁশী ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরা-গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন-নির্য্যাস !
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—'নাই, কিছু নাই !'

নজরুল ইস্‌লাম ।

সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
হে ধরিত্রি, জীব-ধাত্রি ! নিত্য দিনযামি
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহা শব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে ; শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটী সন্তানের, প্রশান্তবদন !
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রি দিন দ্যুলোক ভূলোক ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী ।



গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ি গঙ্গে !

কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল

দেব-মানবের একসঙ্গে !

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ,

আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—

গোলোকে হ'ল না ঠাঁই, শিবজটা বাহি তাই

শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—

মিথ্যা, মা ! মিথ্যা এ কাহিনী ;

যুগে যুগে নরনারী- অফুরান-আঁখিবারি

পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,

কত আলো স্রোতোজলে মিলালো !

ভরি' তব ভাঙ্গা পাড় কত কোটী হাহাকার

ভাঙ্গা বুক রাঙ্গা আঁখি ঘুমালো।

ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি

যুগে যুগে মা গো ! তোরি অঙ্কে,—

কত না বালুর চর সে ব্যথায় উর্ব্বর

বলি-অঙ্কিত তট-পঙ্কে !

অশ্রুপূত ও-জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্ত্তি ;
কত না চিতার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মূর্ত্তি।
তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি—
তোমারি সলিলে যবে পূজি, মা !
যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।
তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে, মা !
কল কল্ কুল্ কুল্ এ ধারার কোথা মূল,
কোথা কূল দিস্ যদি ব'লে, মা !
বন্দি ত্রিকালজয়ী গঙ্গে মূর্ত্তিময়ি—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ !
অনাদি ও-ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে, মা ! এ প্রাণের কি দাহ !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ।

প্রিয়া

তোমারে পাই জ্যোৎস্না রাতের
অলস ঘুম মাঝে,
আমার বাঁশী তোমার হাতে
গভীর সুরে বাজে।
নিখিল ব্যাপি' চাহিয়া থাকে
কাজল তব আঁখি,
নিজেরে খুঁজি' হারাই দিশা
মনেরে হানি ফাকি ;
উষসী তব সিঁদুর 'পরে
বলাকা-সারি মালিকা গড়ে,
তোমারে যাই ধরিতে চাই—
অমনি পাই না যে।

তোমারে পাই শরৎ-প্রাতে
শিশির-ছেঁচা ফুলে,
নৃত্য তব উছলি উঠে
নদীর কূলে কূলে।
কখনো দেখি বাহিয়া যাও
মেঘের তরীখানি,
পাতায় ফুলে দেখেছি কভু
লিখিতে তব বাণী,

সাগর-তালে বাজাও বীণা
মনেতে জানি এ-সুর চিনা,
কখনো তাহা গুঞ্জরেছি —
কখনো গেছি ভুলে।

ফাগুন দিনে মাধবী রাতে
যে-ছবি তব জাগে,
চমকি দেখে—শিহরি উঠি
পুলক বুকে লাগে;
অশোক-শাখে মুছেছে তব
চরণ রাঙা লেখা,
আমের নব মঞ্জরীতে
কখনো দেছ দেখা।
শিমুল-শাখে আবির খেলি'
অঙ্গে ধরি' পলাশ-চেলী
বধূর বেশে কভুবা এলে
জীবন-পুরোভাগে।

নয়নে তব যে-ভাষা ফোটে—
বুঝিতে পারি তায়,
সঁপিয়া দাও রিক্ত করি'
সকল আপনায়।

প্রিয়া

কাঁপিছে ! প্রিয়া, যে-গানখানি
তরুণ তব মনে,
আমার বুকে তাহার রঙ
লেগেছে অকারণে।
তোমারে পাই সুদূর হ'তে
আগুন-ভরা যে-সুর পথে,
সেথায় মোরা রচেছি গেহ
গোপন নিরালায়।

ঝড়ের সাথে এলায়ে কেশ
এসেছ, বিরহিণী !
তোমারে দেখে জেগেছে মনে
চিনি গো যেন চিনি ;
বরষা-রাতে চোখের জলে
হেসেছ পলাতকা,
চখীরে দেখে যেমন করি
হেসেছে ভীরু চখা।
পেয়েছি তোমা জীবন ভরে,
নানান্ রূপে পলক তরে,
কখনো হারি খেলার ছলে
কখনো যেন জিনি।

বন্দে আলী মিয়া।

পথিক

সংসার-পথে পথিক চলেছি একা
দিগন্ত পানে প্রসারিত পথ রেখা।
পশ্চাতে চাহি' দেখি দূর হ'তে দূরে
গেছে কত দেশ নদী পর্ব্বত ঘুরে,
অতীতের স্মৃতি উদাস বিষাদ সুরে
ভরিয়া রেখেছে বন্ধুর পথখানি,—
সম্মুখে কোথা শেষ তার নাহি জানি।
স্বদেশে বিদেশে ভুবন ভরিয়া মোর
সে পথের মায়া হৃদয়ে জাগায় ঘোর

পরিচিত যেথা বাসগৃহে দীপ জ্বলে।
কানন ভরিছে বসন্তে ফুল-ফলে,
শেফালি ফুটিছে নিশির আঁচল-তলে,
মুগ্ধ নয়ন মেলিয়া তাহারে হেরি,—
অন্তরে তবু ডাকে দূরে কার ভেরী।

কাহারো নয়নে দেখেছি নবীন মায়া
প্রাণের স্বপন লভিল শ্যামল কায়া।

অধরের কোণে ঝলিয়াছে হাসিখানি,—
কি কহিতে গিয়া সহসা ফুরায় বাণী,
অশ্রুতে হাসি নিভে যায়, কল্যাণি!
দীপ্তনয়নে গভীর ব্যাথার রেখা।
—উন্মনা হিয়া তবু পথে চলি একা।

অজানা ভুবনে অজানা লোকের মাঝে
সে পথ বহিয়া এসেছি প্রভাত সাঁঝে।
বিদেশী ফুলের অচেনা করুণ-বাস
সহসা জাগায় কায়াহীন অভিলাষ,
হৃদয় ভরিয়া স্বপনিত অবকাশ।
চল জলে তরী ভাসায়ে আকাশে চাহি,
-মনে পড়ে' যায় আর বেশী বেলা নাহি।

উদয়-তপন লুকায় অস্তাচলে
আকাশ তখন তরল সোণায় ঝলে।
পূরবে তুষার-শিখরে দিবস-শেষে
দাঁড়াল রজনী লাজারুণ বধূবেশে,
শেষ আলোখানি রবি তারে ভালবেসে
বিদায়ের খনে পরালো মুকুট সম,
—জাগে মনে পথ শেষ হয় নাই মম।

সে পথের কভু শেষ যেন নাহি হয়।
—না মিলিলে ঘর তবু মনে নাহি ভয়।
বন্ধুর কত গিরি হ'য়ে এনু পার,
কত নদী হ্রদ দেশ বন কান্তার,
হাসি-কান্নার আলোক অন্ধকার,—
তবু আজো পথ সমুখে রয়েছে পড়ি'
তাই চলা শুধু দিবস-রজনী ভরি'॥

হুমায়ুন কবির।

